১৪৮৮

কবিতা

চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] আশ্বিন ১৩৫৫ [ক্রমিক সংখ্যা ৫৯

স্ফুলিঙ্গ

পল ভালেরি

চিত্রকলা

চিত্রকলার লক্ষ্য অনিশ্চিত।

যদি নিশ্চিত হ'তো—দৃষ্ট বস্তুর প্রতিভাস রচনা, কিংবা বর্ণের আর আকৃতির কোনো-এক সাংগীতিক বিতরণের ফলে চক্ষুর আমোদন—এই যদি লক্ষ্য হ'তো, তাহ'লে-তো আরো সরল হ'তো সমস্যা; তাহ'লে, নিঃসন্দেহে, আরো অনেক ছবি জন্মাতো, যা সুন্দর (অর্থাৎ, এই-সব নির্দিষ্ট প্রয়োজনের শর্তপূরক), কিন্তু এমন ছবি জন্মাতো না, যা অবোধ্যরূপে সুন্দর।

অক্ষয্য ছবি একটিও হ'তো না তাহ'লে।

'অর্ধশায়িতা ভিনাস'-এর এই ছবিটির সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি, একটু দূর থেকেই দেখছি প্রথমে।

প্রথম দৃষ্টিপাতে আমার মনে পড়লো যে-কথা দেগাসকে প্রায়ই বলতে শুনেছি: 'কী সমতল, সুন্দর চিত্রণের মতো সমতল।'

দুর্বোধ্য উক্তি। রাফাএল-এর এমনি একটি সুন্দর প্রতিকৃতির সামনে প্রাঞ্জল। স্বর্গীয় সমতলতা: বর্ণের ঘনলেপন নেই, পিণ্ড নেই, আলোকের অতিগ্রন্থন নেই, সুতীক্ষ্ণ প্রতিতুলনা নেই। মনে-মনে বলি যে আমরা পরোৎকর্ষে পৌঁছতে পারি

শুধু সেই-সব পদ্ধতি উপেক্ষা ক'রেই, যারা 'টেক্কা দেবার' প্রশ্রয়ী।

আমার দৃষ্টি ছবিতে ফিরে গেছে, আমার চোখে 'অর্ধ-শায়িতা ভিনাস' পুনরাবিষ্কৃত। শুভ্র, সম্পূর্ণ একটি মূর্তি। আলো-ছায়ার সুনন্দ বিতরণ। সুন্দর অংশের, অভিরাম অঙ্গের সমাবেশ : বিশুদ্ধ একটি উদর, কাঁধের সঙ্গে বাহুর একটি সম্পূর্ণ শিল্পচতুর চিত্তহারী সংযোজন, সোনালি-নীল ভূদৃশ্যের কেমন-একটি গভীরতা। সেই সঙ্গে মূল্যের একটি তন্ত্র, বর্ণের, বঙ্কিমার, প্রদেশের : স্পর্শনের প্রতিরূপ, দেবীর উপস্থিতি, শিল্পের স্বকর্ম। ...যদি একই সঙ্গে এত রকম না-হ'তো, তাহ'লে কবিতা হ'তো না।

এই বহুলতা সারাৎসারিক। এর বৈপরীত্যে প্রবাহিত সেই সম্পূর্ণ বিমূর্ত চিন্তা, যা নিজেরই সূত্রের অনুধাবন করে, যেখানে অনুসৃত আর অনুসারী অভিন্ন। সেই সূত্র কোনো কারণেই হারালে চলবে না : আর ফিরে পাওয়া যাবে না তাহ'লে।

কিন্তু শিল্পী মেলান, জমান, রচনা করেন বস্তুর উপকরণে তাঁর মনের, সত্তার সকল দিকের আহরণ, কিছু ইচ্ছা, শর্ত, অভিপ্রায়। কখনো তাঁর মডেল তাঁকে ভাবিয়েছে, কখনো রঙের মিশ্রণ, রঙের শ্রুতি, কখনো তনুমাংস, আর কখনো তাঁর সর্বপায়ী ক্যানভাস। কিন্তু এই সব অভিনিবেশ, যদিও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এক হ'য়ে মিলেছিলো চিত্ররচনার প্রক্রিয়ায় ; আর এই-সব মুহূর্ত, বিভিন্ন, বহুবিচ্ছিন্ন, অনুসৃত, অবধৃত, স্তম্ভিত, স্খলিত, তাঁর চোখের সামনে হ'য়ে উঠেছিলো —এই ছবি।

শিল্প, অতএব, একটি জীবন্ত, সক্রিয় বৈচিত্র্যের বাহ্যিক সংযোজনা, যে-বৈচিত্র্যের ক্রিয়াকর্ম মিলিত, ঘনীভূত হয় এমন-একটি উপাদানে, যা একই সঙ্গে সমস্ত ভিন্নতার ঘটনাস্থল—যা তাদের ঠেকায়, উশকে দেয়, রূপান্তর ঘটায়, আর শিল্পীকে ঠকায়, চটায়, আর কখনো-কখনো অভিভূত করে।

এই উপাদানের প্রত্যেক সঞ্চলনের একটি সরল, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, প্রত্যেকটি সংজ্ঞেয়, কোনো-এক বিমূর্তনের প্রাতিষঙ্গিক। তবু, একসঙ্গে সমস্তটার উন্মুখতা এই অদ্ভুত ফলের দিকে যে মূর্ত আবিষ্কৃত হয় নতুন ক'রে, আর শিল্পী, প্রথম দর্শক, ফিরে পান প্রত্যেকটি বস্তুর প্রাচুর্য আর বহুল ক্ষমতা, প্রত্যেকটি জিনিশের বৈচিত্র্য, এমনকি তাদের যুগপৎ সীমাহীনতা। কী ক'রে পান? দৃশ্যমান বর্ণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর প্রতীকী গুণাবলীর কৌশলে।

শিল্পকর্ম দেখে শিল্পীকে মনে হয় দর্শকের তুলনায় আরো যথার্থ মানুষ, আরো বেশি নিজের কর্তা, নিজের চোখের, হাতের ; আরো বিচারী, আরো সোচ্চার। সুসমাপ্ত ছবিটি যারা দেখতে যায়, তারা-তো দেখতে পায় না তাঁর হতাশা, মনস্তাপ, ত্যাগ, তাঁর ঋণরাশি, লুকোচুরি, বছরের পর বছরের শ্রম, আর তাঁর অনুকূল শতসংকট ;—দেখতে পায় না তার কিছুই, যা অপসৃত, আচ্ছাদিত, উচ্ছিন্ন, পুনঃশোষিত, স্তব্ধীভূত, অস্বীকৃত, যা-কিছু মানবপ্রকৃতির অনুচারী আর অলৌকিকের তৃষ্ণার বিরোধী। কিন্তু এই অলৌকিকের তৃষ্ণা শিল্পীস্বভাবের সহজ প্রবৃত্তি।

সংগীত

সংগীত অচিরেই আমাকে ক্লান্ত করে, যত আমাকে বিচলিত করেছে ততই অচিরে। তার কারণ, সংগীত তাকেই বিপর্যস্ত ক'রে দেয়, যার জন্ম সে এইমাত্র দিলো আমার মধ্যে—যত চিন্তা, রশ্মি, প্রতীক আর প্রতিপাদ।

বিরল সেই সংগীত, যা প্রথমে যা ছিলো শেষেও তা-ই থাকে ; যা নিজের সৃষ্টিকে খর্ব করে না, বরং লালন করে তাকে, যাকে সে এইমাত্র পৃথিবীতে আনলো—আমার মধ্যে।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে তিনিই প্রকৃত গীতরসজ্ঞ, যাঁর কাছে সংগীতের কোনো ইঙ্গিত নেই।

শিল্প ও গণ

রম্যতম শিল্পকর্ম, প্রতিমানের সূক্ষ্মতা, সংস্কৃতির আস্বাদন, পরোৎকৃষ্ট ভাষার স্বরসংগতি, কোনো-কোনো গাণিতিক দ্ব্যর্থতার অতিসূক্ষ্মতা, আত্মাকে পরীক্ষা ক'রে যে-সব যাথার্থ্য আমরা পাই—এ-সবই মাত্র ক-জন মানুষের একটা ঘরোয়া ব্যপার। ফেলে দাও সব—এ-ক্ষতি এতই বড়ো যে তা লক্ষ্য করবে কে?

কোনো-কোনো শিল্পকর্ম গণের সৃষ্টি। অন্য কোনো-কোনো শিল্পকর্ম নিজস্ব গণ সৃষ্টি ক'রে নেয়।

প্রথমটি স্বাভাবিক গণ-বোধের দাবি মেটায়। দ্বিতীয়টি কৃত্রিম প্রয়োজন সৃষ্টি করে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই তৃপ্ত করে সেই প্রয়োজন।

সাহিত্য

একটি বই তার লেখকের স্বগতোক্তির অংশ মাত্র। ব্যক্তি, কিংবা আত্মা, মনে-মনে কথা ব'লে যায়: সেই কথন থেকে বাছাই করেন লেখক। কোনটা বাছেন, তা নির্ভর করে তাঁর আত্মপ্রীতির উপর। কোনো চিন্তায় নিজেকে তিনি ভালোবাসেন, কোনো চিন্তায় নিজেকে তাঁর বিশ্রী লাগে; মনে তাঁর যে-কথা আসে, তাকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করে তাঁর স্বার্থ আর গর্ব; তিনি যা, তা-ই থেকে সংকলন করে যা হ'তে তাঁর ইচ্ছা করে। অমোঘ এই বিধান।

ফলত, যদি আমরা সমস্তটা স্বগতোক্তি পেতাম, তাহ'লে প্রায় যথাযথ উত্তর জানতাম সেই যথার্থতম প্রশ্নের, বৈধ সমালোচনা কোনো শিল্পকর্মের সামনে যা প্রস্তাব করতে পারে।

সমালোচনা যদি মেজাজমাফিক আর মরজিমতো মতামত দিয়েই ছুটি না-নেয়, অর্থাৎ, শিল্পকর্মের আলোচনা করতে গিয়ে নিজের বিষয়েই শুধু কথা না-বলে; সমালোচনা যদি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহ'লে তার অন্তঃসার হবে লেখক যা করতে চেয়েছিলেন আর যা ফলদরূপে করতে পেরেছেন, এ-দুয়ের তুলনা। কেননা, কোনো-একটি কর্মের কৃতিত্ব যদিও কোনো-এক পাঠকের সঙ্গে একটি অদ্ভুত, অস্থির সম্বন্ধস্থাপন, লেখকের যথার্থ, স্বকীয় মূল্য তাঁর প্রতিমানের সঙ্গে তাঁর নিজের সম্বন্ধ: আর এই মূল্য উভয়ের অন্তর্বর্তী দূরত্বসাপেক্ষ; অর্থাৎ প্রচেষ্টার প্রণয়নে বাধা-বিপত্তির মাত্রাই এই মূল্যের পরিমাপ।

কিন্তু এই বাধাবিপত্তিও লেখকের কর্মভূমিকা মাত্র: এগুলি তাঁর 'আদর্শে'র রচনা। এই আন্তরিক কর্ম প্রত্যক্ষ কর্মের—সৃষ্টিকার্যের—পুরোগামী; প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে ব্যাহত, বিপর্যস্ত, পরাস্ত করে; আর এইখানেই কখনো-কখনো, ঘোড়াকে যেমন পিটিয়ে শেখায়, চারিত্র আর বুদ্ধি শাসন করে স্বভাবকে, স্বভাবের শক্তিকে।

সমালোচনা নিজে যদি নিজের আদর্শ মেনে চলে, তাহ'লে সে রায় দেবে শুধু এই গুণটির উপর: কেননা কোনো-একজনের কাছে শুধু এটুকু আমাদের দাবি হ'তে পারে যে সে যা করতে চেয়েছে তা সে ক'রে উঠুক। কোনো-একটি মনের আমরা বিচার করতে পারি শুধু তার নিজস্ব বিধান অনুসারেই, ব্যক্তিগতভাবে প্রায় অনুপস্থিত থেকে, উপচারীহীন অস্ত্রোপচারের মতো, কেননা কথাটা-তো শুধু উদ্দেশ্যের সঙ্গে কর্মের তুলনা।

আপনি একটি বই লিখতে চেয়েছিলেন?

'লিখেছিলেন কি? কী আপনার প্রতিমান ছিলো? কোনো উচ্চ চিন্তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, না কোনো লক্ষণীয় সুবিধে নিতে: গণ-মতের উপর জয়ী হ'তে, মোটা মুনফার

আশায় ? হয়তো পরোক্ষ লক্ষ্য ; হয়তো আপনি তাক করেছিলেন আপনার পরিচিত ক-জন মাত্র মানুষকে, না কি—এমনকি—শুধু একজনকে, সাধারণের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থের ঘুর-রাস্তায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন শুধু একজনকেই ?

'কাকে খুশি করতে চেয়েছিলেন ?—কার প্রণয় কাড়তে, কার সমকক্ষ হ'তে, কাকে ঈর্ষায় পাগল ক'রে দিতে, কোন মাথা চিন্তায় নোওয়াতে, কোন রাত্রিতে হানা দিতে ? বলুন, লেখক-মশাই, কবুল করুন, সে কি কুবের, সে কি গণেশ, না দিল্লীশ্বর, না কি আপনি ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন ? হয়তো রতির, হয়তো একটু-একটু অন্য সকলের ?

'কিন্তু দেখা যাক আপনার পদ্ধতি—ইত্যাদি।'

যে-সব বই আমি শ্রদ্ধা করি তার প্রায় সমস্তই, আর যে-সব বই আমার কখনো কোনো কাজে লেগেছে তার একেবারেই প্রত্যেকটি, রীতিমতো দুষ্পাঠ্য।

মন স'রে যেতে পারে এ-সব বই থেকে, এদের ভিতর দিয়ে দৌড়ে যেতে পারে না।

কোনো-কোনো বই কাজে লেগেছে দুরূহতা সত্ত্বেও ; কোনো-কোনো বই, দুরূহ ব'লেই।

কবিতা

প্রত্যেক কবির মূল্য, শেষ পর্যন্ত, ততটাই দাঁড়াবে, যতটা তাঁর মূল্য ছিলো (নিজের) সমালোচকরূপে।

কবিদের মহত্ত্ব : মনের মধ্যে যার একটুমাত্র উঁকিঝুঁকি দেখেছেন, তাকে বাক্য দিয়ে প্রবলভাবে পাকড়ানো।

কবিতার বিষয় সেইটেই যেটা গদ্যে বলা হবার পরেও পদ্যকে চায়।

পাখির মতো হালকা হবো, পালকের মতো না।

যে-মানুষ পরিশ্রমী, সে মনে-মনে বলে : আমি আরো সুখ, আরো শক্তি, আরো বুদ্ধি চাই—আমার চেয়ে আরো।

কিছুদিন আগে, লণ্ডন ব্রিজ পার হ'তে-হ'তে আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমার প্রিয় দৃশ্য দেখতে : জলের দৃশ্য, ঘন, জটিল, সমৃদ্ধ, ঝিনুক-জ্বলা, কাদায় ঘোলা, কুয়াশায় ঝাপসা আর জাহাজগুলির শাদা ধোঁয়ায় আর ব্যস্ত বাহুতে (গা-ছমছমে কাণ্ড ঐ শূন্যে ঝোলানো বস্তা আর প্যাকিংকেস !) বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত, জীবন্ত।

দৃশ্যটি বন্দী করলো আমাকে ; রেলিঙে ভর দিয়ে আমি দাঁড়ালাম, যেন জাঁতিকলে আঁকড়ে-ধরা। চোখে দেখার ইন্দ্রিয়সম্ভোগ তৃষ্ণার সমস্ত প্রবলতা নিয়ে আমাকে দখল করলো, আমি স্তব্ধ হলাম সেই লোভনরচন আলোকের মধ্যে, যার ঐশ্বর্যের আমার কাছে শেষ ছিলো না। কিন্তু আমার পিছনে—আমি অনুভব করলাম—দৌড়ে চলেছে, গড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধের একটি আস্ত মিছিল, অন্তহীন, জীবনের অব্যবহিত লক্ষ্যের দিকে চিরন্তনরূপে ধাবিত।

আমার মনে হ'লো না—একেবারেই না—যে এই জনতার উপাদান ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি, যাদের প্রত্যেকের আছে স্বতন্ত্র ইতিহাস, একান্ত ঈশ্বর, আছে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সম্পদ, স্বগতোক্তি, নিয়তি ; কিন্তু, নিজেরই অগোচরে, আমার শরীরের ছায়ায়, আমার দৃষ্টির আশ্রয়ে, আমি তাদের ক'রে তুললাম কণিকার স্রোত, প্রত্যেকে অভেদ, অভেদ্যরূপে ঈপ্সিত আমি জানি না কোন শূন্যতার দ্বারা, আর যার আচ্ছন্ন, উন্মুখ প্রবাহের সমস্বর আমি শুনলাম লণ্ডন ব্রিজ পার হ'য়ে চলেছে। নিঃসঙ্গতার এমন প্রবল অনুভূতি কখনো হয়নি আমার—শুধু নিঃসঙ্গতা নয়, সেই সঙ্গে মেশানো

যন্ত্রণা আর গর্ববোধ : একদিকে ভিড় আর-একদিকে জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখার বিপদের ক্ষীণ, অদ্ভুত চেতনা।

লণ্ডন ব্রিজে দাঁড়ানো নিজেকে আমি দেখলাম কবিতার দুষ্ক্রিয়ায় অপরাধী।

এই পরোক্ষ ব্যাধি অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হ'লো। অনির্ণীত অপরাধের তিক্ত ঘ্রাণ আমি চিনলাম, যেন কোনো গোপন বিধানের গুরুতর লঙ্ঘন করেছি, যদিও জানি না আমার দোষ কোথায় কিংবা বিধানটা কী। আমি কি অকস্মাৎ জীবিতের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়িনি—আবার আমিই কি হরণ করিনি তাদের জীবন?

(এই শেষের কথা ক-টি, কোনো কাল্পনিক অপেরাসুরের মতো, নিজে-নিজেই গুঞ্জিত হ'তে লাগলো আমার মনের মধ্যে।···)

যারা স'রে দাঁড়ায়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অপরাধীর অংশ থাকে। যে-মানুষ চিন্তা করে, তাকে সব সময় চিন্তা করতে হয় বাসযোগ্য পৃথিবীর বিরুদ্ধেই। তার কাছে পৃথিবীর যা প্রাপ্য তা সে দেয় না; নিকটবর্তীকে সে নিয়ে যায় অসীমের প্রান্তে।

ঐ ধূমাচ্ছন্ন বন্দর, ঐ আবিল, উজ্জ্বল জল, ঐ ম্লান, স্বর্ণাভ আকাশ, বিষণ্ণ, কলঙ্কিত, ঐশ্বর্যময়, আমার জীবনের উপর এমন একটি শক্তি প্রয়োগ করলো, এমন একটি সম্মোহনের গুণ, যে দৃষ্টির রত্নরাজির মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, লক্ষ্যসম্পন্ন জনতার ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে, আমি হ'য়ে উঠলাম সারত বিসদৃশ।

এটা কী ক'রে সম্ভব হয় যে একজন মানুষ হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা অনুপস্থিতির অনুভূতিতে বন্দী হ'য়ে পড়ে, আর তার ভিতরে এমন গূঢ় একটি পরিবর্তন ঘটে যে সে তৎক্ষণাৎ চিহ্নময় জগৎ থেকে অর্থময় জগতে চ'লে পড়ে? কোনো বস্তুর অভ্যস্ত

রূপ তার কাছে আর থাকে না, যে-সব লক্ষণ দিয়ে বস্তুর মধ্যে সে নিজেকে চেনে, সব লুপ্ত হয়। কোনো সংক্ষেপীকরণ আর নেই, কোনো বস্তুর নামও প্রায় নেই; কিন্তু অভ্যস্ততম অবস্থায় আমাদের চারদিককার পৃথিবী যদি শুধু প্রতীক আর লিপিচিহ্নের পৃথিবী হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তার ব্যবহার্যতা ক্ষুণ্ণ হয় না। তীর-আঁকা, অক্ষর-লেখা এই পৃথিবী তুমি দেখতে পাচ্ছো?···

কখনো-কখনো এমন হয়, এমন-এক অসংজ্ঞেয় স্থানান্তর ঘটে, যে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জ্ঞানের উপর জয়ী হয়। স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় জ্ঞান,—আর এই-তো আমরা, যেন এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে, বিশুদ্ধ বাস্তবের একেবারে বুকের মধ্যে। যেমন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো দেশে, অজ্ঞাত ভাষা যেখানে কথিত, সেই ভাষা আমাদের কাছে শুধু নিনাদ, স্বরাঘাত, স্বরবৈশিষ্ট্য, শুধু শ্রুতিবিস্ময়, তেমনি, অনুরূপ উপায়ে, তেমনি ঘটে যখন বস্তুর অভ্যস্ত মানবিক মূল্য হারিয়ে যায় হঠাৎ, আর আত্মাকে অধিকার করে শুধু দৃশ্যমান পৃথিবী। তখন, কিছুক্ষণের জন্য, যে-কিছুক্ষণের সীমা আছে, কিন্তু পরিমাপ নেই, পরিমাণ নেই (কেননা, যা ছিলো, যা হবে, যা হওয়া উচিত, সবই অনর্থক চিহ্নমাত্র)—আমি যা আমি তা-ই, আমি যা দেখছি আমি তা-ই, লণ্ডন ব্রিজের উপর উপস্থিত এবং অনুপস্থিত।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

ডায়েরি

অমিয় চক্রবর্তী

তেরো

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভ'রে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধূলোর রেণু মাখুক ॥
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।
কে জানে প্রাণ আনল কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নীচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দুদিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে ॥

চোদ্দ

হঠাৎ থেমে গেল দিন
(পাতা পড়ে, পাতা পড়ে)
পৃথিবীর ধুকধুক বুকে।
(ঝরে, পাতা ঝরে)
তোমার যাওয়ার ছায়া দূরের বিলীন ॥
তবু চলে যায় দিন
(উড়ে যায়, উড়ে যায়)
হয়তো একটু দূরে ভিন্ন।
(ঝ'রে যায়, উড়ে দূরে যায়)
সমস্তের প্রাণে সে অভিন্ন ॥

অগণ্য গাছের সারি চলেছে অতীত,
সামনেও তাই।
(পাতা ঝরে, পাতা ঝরে)
এই পথে গিয়েছ সেদিন ॥

পনেরো

দুটো চারটে গাছে ঘনতায়
তারি অবসরে
ঘিরে দাও মন।
দাও স্নিগ্ধবহ শান্ত বায়ু
ঝিরিঝিরি ধ্বনি,
মনের ভিতরে ;
আপনি আপন ছন্দ পাবে মন তার।
চূর্ণ হ'য়ে প্রত্যক্ষের স্রোতোবেগে একান্ত ভাবনা
হারায় আপনতম তাকে ;
শূন্যতা অনন্ত হ'য়ে ফিরুক আবার
প্রসাধিত মনের পূর্ণতায়।
দাও কিছু নদী-দৃষ্টি, সমতা সংসারে, ফুল ফল
প্রতিচ্ছবিময় পরিবেশ,
প্রবাহিত মেঘচ্ছায়া ;
পরে পরে নিরঞ্জন নানা রঙে
আলোর আকাশে দিব্য চোখে
দেখা দিক ধূলির শ্রীভূমি
এই প্রাণলোকালয়ে।
যেখানেই যাই পাব চরণচিহ্ন তার বুকে,
জীবনী ও মৃত্তিকায় লাগা
অদৃশ্যের স্পর্শময়

মিশ্রিত রসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে—
সেই ছন্দ বহে ধমনীতে।
বাঁকাছায়া, শঙ্খসুর, পাখীর কূজন এনে দাও,
মনে মনে ছেয়ে আসা সজল কাজল ভাব,
হয়তো বা তবে
যতদিন বাঁচি
তারি ছোঁওয়া এই ধূলিপথ দিয়ে যেতে
পাবে মন বিরহের সুরে
ভরভর পূর্ণ পরিচয়ে;
এই শেষ ধরণীতে॥

নিমেষ-ছোঁয়া

সুনীলচন্দ্র সরকার

চৈত্রশেষের হাওয়াঝাপসা রাত
শীতল বাষ্পে ভেজা
তীক্ষ্ণফুলের গন্ধমাখা,
এল যেন দমকে দমকে
আকাশপারের ঢেউ
শিয়র-তারা-আঁকা।

ফিরে গেছে ডেকে-ডেকে পাড়ার উদাসীরা
'—মণি মহাদেব!'
থামেনি এই মনের চৈতিসং…
এখন-আমি, আগের আমি,
বাহির-আমি, ভিতর-আমি,
আমার চেয়ে আরো আসল আমি:
চলেছি সেই আমি-গুলির শোভাযাত্রা।
মনে শান্তি নেই,
ঘুমের পাপড়ি শুকোয় চোখে
অনেকদিনের বাকি পিপাসায়।
হায়রে, ওরে হায়, এ কোন
ব্যর্থযুগের ফসল আমি?
সেই প্রথম আশার শিসমেলা আজ
কোথায় গেল।
কেমন ক'রে হারিয়ে এলুম
বাঁচার সে-লাবণ্য,
শুকিয়ে গেল জীবনমঞ্জরী
কোন অভিশাপ আগুনঝড়ে ঝলসে?

হঠাৎ বা এই চৈত্রশেষের রাত
কোথা থেকে এল রে তার গভীর আত্মা নিয়ে,
নিমেষছোঁয়ায় চিনল আমায় :
অচল, পঙ্গু আমি।
ওরে আমার অভিশপ্ত প্রাণ
অনেক জনার দর্পিত আলস্যে
পাঁচিলঘেরা রইলি অন্তরীন ;
সাধারণের নজর থেকে আড়ালকরা
সময়কিন্নরী ;
অমোঘ তার স্ত্রী-আবেদন :
রইলি তারি মোহে—
কেটে গেলে নবীন কত দিন
গভীর কত রাত,
অনেক হাওয়া ব্যর্থ হ'ল সদরপথে।
নীরব হ'ল উদাসীরা।

ওরে বর্ষশেষের মন-না-মানা রাত
আয় রে তুলে ঢেউয়ের পর ঢেউ
কালো বিস্মরণের উপর স্মৃতির চিকিমিকি।
পৃথিবীর এই বাসিন্দাদের আরামকারুকাজ
লেহন করো বারে বারে।
…কে আমরা দরবাঁধা এই ডাঙায়
ঘর বেঁধেছি তৈরি জীবন কিনে ?
কী ভূমিকায় এলুম পৃথিবীতে ?
কোথায় যেন যাবার কথা ভুলে
ওড়ার পাখায় ঘুমের হাওয়া খাই ?…

কুলুকুলু জোয়ার ঢুকুক মনে,
স্রোতের অনুরোধে
দীর্ঘকালের মৌন ভেঙে শূন্যগুহা যত
উঠুক ক'য়ে কথা।

ওরে হাওয়া, নতুন হাওয়া,
অনেকদিনের গুমোট থেকে হঠাৎ ছাড়া-পাওয়া,
এড়িয়ে ফেলে যাসনে আমায়।
আজো আমার চোখের কাছে
বেঁচে আছে
কিছুটা উৎকণ্ঠা,
বিফল কাঁপন মাঝে-মাঝে বুককে কাঁপায়
হয়তো আবার পারবো উঠে যেতে,
আমার মধ্যে উৎস-স্নায়ু চেতিয়ে জেগে
বইয়ে দেবে অকলঙ্ক প্রাণ
নিমেষ-দমক-লাগা।
নে রে আমায় নে রে
দে রে আমার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
ঝড়ের টান,
আমার মধ্যে জায়গা খুঁজে-খুঁজে
ছোঁয়া আঙুল বৈদ্যুতিক :
আবার আমি বাঁচি
চোখের সামনে খোলা রেখে
আ-তারা এই রাত,
পা মেলে সেই জীবনচলার সদর পথে
দু'ধারে যার রাতের ঝোপে-ঝাপে
ঝাপসা পাখি অনির্দিষ্ট নড়ে
হাওয়ায় বুকের পালককাঁপা।

জামতলা

সুনীলচন্দ্র সরকার

আয় চ'লে এই জামতলায়
দূর থেকে ছাখ বাড়িটা তোর
এদিকে জানলা ওদিকে দোর
চলন্ত ছবি ঝলমলায়।
ওদিকে বেরোয় ধোঁয়া আঁকাবাঁকা
আকাশের রোদে ফণা-তুলে-রাখা ;
মেঝে ঘসটানি, জলের আওয়াজ,
ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ফেরে কাজ ;
বিছানা বসন বাসন বাধ্য,
তাড়ার ধমকে এগোয় খাদ্য ;
পতপত ভিজে কাপড় উড়ছে
জানলার নীচে বেরাল ঘুরছে ;
'গামছা কোথায়, ঘটিটা মাজ না'—
বাজে বিচিত্র সুরের বাজনা।
ছাখ ব'সে এই জামতলায়
কেমন খেলনা বাড়িটা তোর,
দপদপ করে জানালাদোর
মানুষবাঁচার ঢেউচলায়।

ছবির মতন লাগে মধুর
বাইরে এখানে জামতলায়
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়
শীতল হাওয়ায় উদাস সুর।

বাড়িতে ফিরলে এলাকা ঘড়ির,
খুচরো চলন পয়সাকড়ির,
খুঁটিনাটি আর এটাতে ওটাতে
পুরোনো অভাব নতুন মেটাতে,
কখনো রঙ্গে দমকা মেজাজে
কখনো কথায় এ-কাজে সে-কাজে
জুতোয় জামায় সেঁধিয়ে বেরিয়ে
সময়ের গাঁট অনেক পেরিয়ে
ফের মশারিতে যবনিকাপাত
চোখে জল দিয়ে আবার প্রভাত।
বাইরে এখানে জামছায়ায়
ঘটে না কিছুই সারাদুপুর।
এ শুধু সময়বহার সুর।
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়।

ছোটো কবিতা

মৃণালকান্তি দাশ

নিঃসঙ্গ

যেখানে তারার চোখ জেগে রয়
তোমার আকাশ,
সেইদিকে আমি রই চেয়ে
প্রেমের পায়ের শব্দ শুনি,
আমি চলি নিঃসঙ্গ সুদূর
সেই পথে বেয়ে।

ফেলিলাম কত অশ্রুজল
সে কহিল : 'বেদনা বিফল।'

'যেখানে হারায়ে যায় সব দুঃখ সব দ্বন্দ্ব
সেখানে মিলন ?'
সে রহিল নিরুত্তর
ছবির মতন।

'ছোটো সুখ, ছোটো আশা', আমি শুধালেম :
একখানি নীড়ের নির্জন ?'
সে কহিল : 'স্বপ্নের জীবন।'

এ জীবন

এ জীবন
নহে স্বপ্ন,
নহে গান,
বর্ণময় বসন্তের দান।

অমাক্রান্ত এ আকাশ।
এ জীবন
অগণন ব্যথার বয়ন।

বিস্মৃতি

একটি মুহূর্ত ব্যথাময়,
এক ফোঁটা অশ্রুজল
—জানি সেও নয়।
এ নির্জন তারা,
এই স্বপ্ন গান হবে হারা
অন্য এক নিখিলের নীলিমার দিকে চেয়ে চেয়ে
রৌদ্র, রাত্রি, দিন যাবে বয়ে।

খেয়া

এপারে মৃত্যু ওপারে অন্ধকার।
দিবারাত্রির সেতুবন্ধনে, হে সুদূর, অজানার
খেয়া করো পারাপার।

নিরালোক

গোপন হিংসার ছুরি হেনেছে ঘাতক,
চোখের আকাশ থেকে নিয়েছে আলোক—
নিঃশব্দ রাত্রির পথে পাপবিদ্ধ মন,
জীবনের শেষ আলো করেছে হরণ।
হে পৃথিবী, বিষণ্ণ প্রাণের নীলে তবু বারবার,
কী গভীর আলোর পাখির হাহাকার।

বিনিময়

জ্যোতির্মালা দেবী

প্রতি ফুল তারা
রয়েছে অসীমে
চলে সে অসীমে,
ঝ'রে যদি যায়
নিশীথের অকরুণ হিমে—
তবু এসো, হে সুন্দর মন,
তবু এসো, হে সুন্দর মন,
নীরবে আড়ালে বসি'
ভালোবেসো,
তবু ভালোবেসো।
আঁখিজল
দিও বিনিময়,
সে যাবে অসীমে ;—
সেথা
নিও পরিচয়।

আয়না

নরেশ গুহ

আবার আষাঢ়, অরুণা, তোমার জন্মদিনের মাসে
তোমার কথাই ঘুরে ঘুরে মনে আসে।
এখনো আশার অলীক লাটাই
থেকে সুতো ছেড়ে শূন্যে পাঠাই
সাততালিমারা, তবু দিশেহারা ঘুড়ি।
হাসিকান্নার রোদে বন্যায় আকাশে উড়ি।
অর্বাচীন আর অবোধরা ছাড়া কখনো যাকে
কেউ দেখলো না—অরুণা, জানো ?—
সে-চাঁদের বুড়ি এখনো আমাকে ডাকে।
কথার জোনাকি খুঁজে কাটে কাল হেলায়,
চক্‌চকে চোখে রাত্রি কাটাই অগণ্যনীল সুখী তারাদের মেলায়।
হইনি চতুর, তোমারি সে শাপ। তবু যে কী ক'রে কুড়ি
কাটিয়ে দিলাম।
তুমি ভাবো—আজো কাব্যি ?
—হায়রে, আজো কি রাবিশ চাঁদের বুড়ি ?

ঠাণ্ডা চা হাতে করুণায় বুঝি ভাবছো—ওহো,
কিছুতেই আর কাটলো না ওর মিথ্যে মোহ।
লোকে ব'য়ে যায় জুয়োয়, মদে কি রেসের ঘোড়ায়,
সাতপুরুষের ছাতাপড়া টাকা দুহাতে ওড়ায় ;
কিংবা লুটোয় রূপসী মেয়ের পায়ে।
তাও যদি হোতো, তাও যদি হোতো হায়রে।
যদি সম্বিৎ ফেরে, কতো তাই চেষ্টা।

দিইনি আমল, তবু যদি বোঝে। শেষটা
তবু তো রক্ষা হোলো না। অথচ ইচ্ছে হ'লেই পারতো।
নিজের হাতেই কবরে শোয়ায় কেউ কি নিজের স্বার্থ!
বীরের মতন সোনার ষাঁড়ের লেজ ধ'রে ঝুলে,
তাও পড়লো না, এ বেচারা।—ব'লে হাত দিলে চুলে।

পৃথিবী তোমারই, এই উদ্দাম বিশের প্রান্তে,
সাত সাগরের আষাঢ় এসেছে তোমাকে জানতে।
তুমিও কি জানো, অরুণা, তুমি কি জানো,
ঘুমের পাপড়ি খুলে
কার স্বপ্নের ফুলেরা গন্ধ ঢালে
তোমার শরীরে, তোমার মাথার চুলে?
অবহেলাভরে ছুঁড়ে-দেওয়া কথা, তাও যে কখন সুরে
উঠে আসে আজ প্রাণের সিঁড়ির গোল ধাপ ঘুরে ঘুরে!

পাখা নেড়ে-নেড়ে উড়ে যাবে দিন, ঝরবে বৃষ্টি।
কোন অলক্ষ্যে ঘুম-ঘুম হবে চোখের দৃষ্টি।
আয়নাকে যদি শুধাও সেদিন—'এখনো বল।
থাকগে ছল।
নিজের কানেই কেন লাগে আজ বেমানান
নিজেরি গলায় শহুরে সমাজে তুফান-তোলানো হৃদয়-দোলানো
সেই গান।
এখনো অনেক যুবক গড়ায় পায়ের কাছে;—
আঙুল তুললে সেও মনে করে ভাগ্য,
হাসি ছুঁড়ে দিলে কৃতার্থ হয়,
ইসারা করলে পুতুলের মতো নাচে।

তবু অদৃশ্য মেঘ উঠে আসে, ছলনা রাখ।
মনে কেন আজ থেকে থেকে ডাকে ভয়ের বাঘ।
এ কী জ্বালা আজ, কী হোলো আমার, বল্ তো আয়না?
কেন ত্রিভুবন তুচ্ছ করতে সাহস পাই না?'

আয়না কিছুই কয় না, উদাস চোখে চেয়ে রয়।
শাদা একগাছা চুলে বিলি দেয় চতুর সময়।

উৎসর্জন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-জীবনে কতো প্রাণ দূর হ'য়ে গেলো—
কতো গান।—তারে মান দিক এ-কবিতা!
ঊর্মিল সমুদ্র কতো উচ্ছ্বাস হারালো
কতো মুখ,—দ্রব হ'ল মুখের মুকুতা—
ঝ'রে গেলো, হারালো কোথায়
ঘটনার মহাঘটে সময়ের অমোঘ প্রথায়
ছেড়ে-যাওয়া কাছে-পাওয়া মিতা!
এইখানে রাখলাম
যে-সব আবছা নাম,
তারে মান দিক এ-কবিতা।

মুহূর্তের মুখোমুখি;
তারপর নিষ্ক্রমণ।—কিংবা টানা আরো কিছু জের
শেষাবধি মিশে-যাওয়া জনতার ভিড়ে;
—চিহ্নলেশহীন।
দুই হাতে মুখ ঢেকে দোলা দিয়ে চ'লে-যাওয়া যবনিকাটিরে
চিরান্তে বিলীন।
গ্রহণ করেনি মন যে-সবের অস্পষ্ট স্বাক্ষর
সেই সব ছায়া-ছায়া ঘোলা ঘৃণাক্ষর
দিয়ে-দিয়ে করেছি প্রস্তুত—
এক মুঠো পংক্তির স্মারক অদ্ভুত।

যে-সব ছবির পাতা হাতে-হাতে হ'য়ে গেলো ম্লান
হেলাভরে রূঢ় হাতে যাকে সরালাম।

যে-সব পুঁথির পাতা ছিন্ন হ'লো
হ'য়ে গেলো পড়া,
আজকে মর্যাদা পাক
উপেক্ষিত তাদের পশরা।
আজিও ধূসর যারা
স্মৃতির আলোয় নেয়ে
হোক প্রদীপিতা।
এ কয় লাইনে পাক
ওরা সম্মান; থাক
অনচ্ছ স্মৃতি ভ'রে
বাণী বিনমিতা॥

দুটি মৃত চোখ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমার চোখের স্বপ্ন দেখেছি তো প্রথম যৌবনে।
বহু তন্দ্রাবিজড়িত তারাভরা রাতে
যখন রেখেছি হাত ভাবনার পরীদের হাতে,
আয়ত চোখের নীল দোলা দিয়ে যেতো ক্ষণে-ক্ষণে।

তারপর সংসারের খর রৌদ্রে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষণে
বহু ধূলো উড়ে-উড়ে স্তূপীকৃত মনে,
রাত হ'লে মরুচারী হাওয়ার আঘাতে
নিভে গেছে কতো না প্রদীপ,
হৃদয়ের সদ্যোজাত নানারঙা আশার প্রদীপ।

আজ রাতে তারপর বহুকাল পরে
কণ্টকিত মরুযাত্রা শেষে
নীড়মুখী রিক্তমন পথিকের বেশে
আবার কি ফিরে আসি ঘরে?
পথের রৌদ্রের দাহ মনে প্রাণে বিশুষ্ক অধরে।

আজো তন্দ্রাবিজড়িত রাতে
দূর থেকে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া;
ঘুম নামে শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত দুটি চোখের পাতায়,
তারপর অন্ধকারে হঠাৎ কি দূরে দেখা যায়।
স্মৃতির পাষাণভারে সহসা কি কাঁপে বিশ্বলোক?
অনুভব করি বারে-বারে
আয়ত ও-নীল নয়, অন্ধ হিম মৃত দুটি চোখ॥

কোনো পরিণয়ে

বাণী রায়

আজ তুমি নিয়েছ বিদায়।
এ বিদায়সুর
বহুদিন আগে, বন্ধু, বেজেছে জীবনে।
এই দৃশ্য করি অভিনয়
যবনিকা দিয়ে ঢেকে রেখেছি সরায়ে।
দৃশ্যপট তুলি
আজি দেখালাম খুলি
পুরোনো এ নাট্যলীলা ছিল, ছিল জানা।
উপন্যাস বিয়োগান্ত পেয়েছি নিশানা।

পথহারা তরীখানি যেন তমসায়
এল নাকি তীরের সীমায়?
তোমার ঝড়ের দিন হয়ে গেল শেষ?
পূরবীতে লাগিল কি ভৈরবী আবেশ?

আমার কৈশোর সাথে আছে যে জড়ায়ে,
—আজও তুমি, প্রিয় বন্ধু;
সে কৈশোরদিন, অনাবিল, মুক্তাশুভ্র,
তোমারি স্মরণে
মিলন-উৎসব-রাতে লহ উপহার;
আমার কৈশোর থাক একান্ত তোমার।

একলা দিনে

বাণী রায়

হয়তো এমনি দিন কাটিবে কতই !
তোমার প্রতীক্ষাম্লান বসি বাতায়নে
মিলিবে নিশ্বাস মম দক্ষিণার সনে।
তোমারে পাব না তবু পাশে।

বর্ষা যবে আমার এ জগতের প'রে
টেনে দেবে যবনিকা বৃষ্টির অক্ষরে ;
রাত্রি জাগে মোহময় চাঁদের আভায়,
তারায় তারায় যবে স্বপন ঘুমায় ;
সঙ্গীহীন দিবারাত্রি ঝরাবে নয়ন।
তোমারে পাব না তবু পাশে।

অনাগত যত দিন আছে—
তাহারা কখনো কেউ পাবে কি তোমায় ?
শরতের আগমনী, বসন্তের হোলি,
হৈম কোজাগরী আর প্রথম বৈশাখ ;
—সব দিন ছন্দহীন আসিবে বৃথায়।
তোমারে পাব না কভু পাশে।

পূর্বরাগ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিকেলে দিঘির জল তুলে নিয়ে গিয়ে
দেখেছি মিলিয়ে,
তার সাথে কথা বলা দু'দণ্ডের উপ্‌চানো সময়
তত ঠাণ্ডা কোনো জল নয়।

তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
ঝরে যা দু'চোখে তার চোখ রাখলেই ;
কিংবা তার শরীরের আলগোছে এতটুকু ছোঁয়া
জানায় হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—
তখন অন্ধকার দেখে মেঘ গ'লে যেতে করে না পরোয়া।

ওই তো সে এতটুকু মেয়ে···হাসে, খেলে,
পৃথিবী বদ্‌লে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।

সমালোচনা

রুচি ও প্রগতি
সন্দীপের চর } **বিষ্ণু দে।** ঈগল পাবলিশার্স, দি বুকম্যান ১৸০, ২৲

কাব্যকৌশলে বিদ্ধহস্ত অথচ গদ্যরচনায় গলদঘর্ম এমনতর শিল্পীকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রমের পর্যায়ে ফেলা উচিত। বস্তুত, বাংলাসাহিত্যে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যাঁরা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকেই তো নীলাকাশের প্রাক্তন বাসিন্দা, অনেকেই উভচারিতায় পারদর্শী। বিমান-বিহারীর সদাসতর্কতা সমতলের স্বাধীনতায় উদ্‌ভ্রান্ত হয় না, বরং পদাতিক আত্মপ্রত্যয়ে সদ্‌ব্যবহৃত হবার অবকাশ পায়, এই কারণেই হয়ত কবিমাত্রেরই সার্থক গদ্যলিখিয়ে হবার সম্ভাবনা। সুতরাং শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, নিছক এ-সংবাদই রসিকচিত্তকে প্রতীক্ষায় রোমাঞ্চিত করবে তা আর আশ্চর্য কী?

দুর্ভাগ্যত, 'রুচি ও প্রগতি'র প্রারম্ভিক পদসমষ্টিতেই পদস্খলন হয় এবং একাধিক উপবেশনের পরিশ্রমান্তে কিঞ্চিদধিক একশো পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি পরিক্রমণ ক'রে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে: পাঠকের কাছে এতটা তিতিক্ষা কি প্রত্যাশা করা উচিত? অথচ বিষ্ণু দে'র রচনা আক্ষরিক অর্থে দুর্বোধ্য নয়, তাঁর শব্দলক্ষণা তো অধিকাংশক্ষেত্রেই যথোপযুক্ততায় বিস্ময়কর এবং মাঝে-মাঝে ইতর-প্রচলিত ভাষণের আকস্মিক প্রক্ষিপ্তি অথবা পরিভাষার আয়ত্তাধীন বিদেশী শব্দের উদ্ধত অনধিকারপ্রবেশ কিংবা ইংরেজি উদ্ধৃতির অসহনীয় ঘনঘটা অপরিসীম পীড়াদায়ক হলেও তাঁর গদ্য কোনো সময়েই সাংবাদিক প্রগল্‌ভতায় চটুল হয়ে পড়ে না, বরং আবেগ উত্তাপের বাহুল্য না থাকায় ঋজু সন্নিবেশের পৌরুষে বিষয়োচিত গুরুত্বলাভ করে। এতৎসত্ত্বেও 'রুচি ও প্রগতি' সাহিত্যার্থে আমাকে আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারল না তার কারণ কি এই যে লেখকের গদ্যরচনায় কোনো ধারাবাহিক প্রবাহ নেই এবং তাঁর বাক্যগঠন-প্রণালী বিশৃঙ্খল শব্দযোজনায় শ্রুতিকটু? মনে হয় আমার অর্থচেতনে 'স্বগত' এবং 'কালের পুতুলে'র শিল্পরূপ জাগরূক থাকায় নিশ্চয়ই কিছুটা বিপ্রকর্ষী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার পক্ষে তাই এ-গ্রন্থবিহারে তথ্যান্বেষীর বিনীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই অগ্রসর হওয়া সম্ভব, আর এদিক থেকে বিষ্ণু দে'র শিক্ষকতায় পাঠকমাত্রেরই যে উপকৃত হবার সম্ভাবনা তা কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এ-পথও, দুঃখের বিষয়, বিশেষ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। প্রথমত প্রবন্ধগুলির স্বল্পায়তন অনেক সময়েই আক্ষেপের কারণ হ'য়ে ওঠে; দ্বিতীয়ত, ধূর্জটিপ্রসাদের বদভ্যাস তাঁর রচনায় সুস্পষ্টভাবে সংক্রমিত না হলেও, বিষ্ণু দে'র প্রবণতা বিশ্লেষণের চাইতে মন্তব্যপ্রয়োগের দিকেই; সর্বোপরি, মনের মধ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত স্থিরসিদ্ধান্ত বদ্ধমূল থাকায় বিতর্কের যুক্তিসিদ্ধ পথকে লেখক সুচতুরভাবেই বর্জন করেছেন। এর ফলে যদি প্রাকৃতজন অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায় আর ভিন্নমতাবলম্বীর কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তবে তার অনিবার্যতাকে স্বীকারই ক'রে নিতে হয়: আশ্চর্য এই যে ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় অথবা গদ্যকবিতার মূল্যবিচারে কিম্বা সাহিত্যের প্রগতি ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে যে লেখক আমাদের সদর্থে সহায়তা করেন তিনি শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি রসিকচিত্ত সমালোচক নন, বাচন-ভঙ্গির আপেক্ষিক স্পষ্টতায় পাঠকের ঘনিষ্ঠতর বন্ধু। আর অভিন্ন গ্রন্থকারই যে-কালে পরিবর্তমান বিশ্বের পরিচয় প্রদান করেন অথবা প্রবৃত্ত হন সংখ্যা-তত্ত্বের আলোচনায় কিম্বা রিচার্ডসের মধ্যবর্তিতায় কোলরিজের সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ করিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন, তখন পাঠক কিছুদূর অগ্রসর হয়েই অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজের স্বল্পজ্ঞানকে ধিক্কার দেন আর ওয়াকিবহাল এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারেন না যে বাংলাভাষায় পরিচ্ছন্নভাবে তত্ত্বালোচনা অসম্ভব। স্বভাবতই লেখকের এই বিড়ম্বিত উক্তিটি বারংবার মনে পড়ে: 'সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য।'

অভিযোগগুলি অবশ্য 'রুচি ও প্রগতি'র বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, এবং সেগুলি যদি যথেষ্টসংখ্যক সংবেদী শ্রোতার সাক্ষাৎ না পায়, তবে তার জন্য লেখকের অনবধান যতটা দায়ী, পাঠকসাধারণের অপ্রতুল-অধ্যয়নজনিত অপ্রস্তুতিও ততটা। ছুৎমার্গ-যে পাণ্ডিত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক নয় এমন উদাহরণ ভূরি-ভূরি বলেই এ-ক্ষেত্রে আমাদের আক্ষেপ। বাস্তবিক সমস্ত বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে হয়, আর সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে সহনীয়, যখন দেখি এক প্রজ্ঞাশুদ্ধ শিল্পানুগমন বিরাট পৃথিবী-আকাশ-জোড়া স্থানকালে অনুসন্ধিৎসুর অপরাজিত আনন্দকে সম্বল ক'রে প্রুতগতিতে

ছুটে চলেছে। আর পাঠান্তিক মন অজ্ঞতার মুগ্ধতাতেই পরিসমাপ্ত হয় না, আপ্লুত হয় সেতুবন্ধের অন্তরঙ্গতায়, বিদ্যাৎধর্মী হলেও এমন উজ্জ্বল মুহূর্ত এ-গ্রন্থে একাধিক।

প্রথমেই মনে আসে এলিয়টের উপর সহৃদয় আলোচনাটি। আমি অন্তত এ-ভূমিকা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এবং আশা রাখি আর পাঁচজন সম্বন্ধে। মহৎ কাব্যের সংস্পর্শে এলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আমাদের সযত্নলালিত মতবাদ, শ্রদ্ধায় সংবেদনায় প্রণত হয় মন। এলিয়টের বিজ্ঞানবিরোধ, মানবচৈতন্যের সমগ্রতায় আস্থাহীনতা, দ্বন্দ্ববাদের প্রতি প্রবল অনীহা—কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায় না, রসগ্রহীতার যদি বিষ্ণু দে'র মতো ঔদার্য থাকে, থাকে কাব্যবোধ। তারপর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য: 'যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্য্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ত-তন্ত্রসমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথায় তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র।' 'কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কুষ্ঠীরক বৃত্তিতে যে মুক্তি নেই' এ-কথা স্বীকার করেও গ্রন্থকার যখন 'লেখকধর্মী প্রস্তুতি'র কথা তুলে বাংলরাব আমাদের রাশিয়ায় দৌড় করান, অথবা শুরু করেন মার্কসীয় 'চিরদ্বৈতাদ্বৈতে'র গুণকীর্তন, তখন, সত্যি বলতে, আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করি না। কেননা, 'সোভিয়েট শিল্প সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি যে তরুণ আদর্শবাদী কবিদের লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন তাঁদের একজনও কি রবীন্দ্রনাথ অথবা এলিয়টের পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত?

'রুচি ও প্রগতি'র উপলক্ষ্য সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্য হলেও তার প্রদীপ্ত ইশারা প্রকৃতপক্ষে মানবধর্মী প্রস্তুতির দিকেই। তাই নিম্নোদ্ধৃত অংশটি যখন আমাদের মনে সার্বিক সমর্থনের আলোড়ন আনে তখন আমরা লেখক বা পাঠক নই, সমাজ-অন্তর্গত আত্মসচেতন মানুষ: 'ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধ যাতে আকস্মিকতা-দুষ্ট না হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না হয়, তার জন্য চাই বিজ্ঞানশুদ্ধ মনুষ্য-ধর্ম। যে ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনীদরিদ্রের, উন্নত অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টা জীবনযাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান'। প্রসঙ্গত, সোভিয়েটের

দিকে অবধারিতভাবে আঙুল দেখানো হলেও আমাদের অভিলষিত অমরাবতী একনায়কত্বের আওতায় ব্যক্তিকে যূথবদ্ধতায় বিলুপ্তসত্ত্ব ক'রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিনা সে-প্রশ্ন অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। কোয়েস্‌লার কিংবা অরওয়েলের রচনা অথবা 'আর্টিস্টস ইন য়্যুনিফর্ম' নামক বইটি বিষ্ণু দে'র নিশ্চয়ই অপঠিত নেই। আর উদ্ধৃত বক্তব্যের পর রাশিয়ার নজির দিয়ে যখন মন্তব্য করা হয় যে 'কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়' তখন এই অতিকথনে কি পরোক্ষভাবে শিল্পীকে সমাজবহির্ভূত বিবিক্ত মানুষ হিসেবেই দেখা হয় না? যেহেতু এ-সত্য লেখকের অঙ্গীকৃত যে 'বহির্জগতের পরিবর্তনকে মানসে না মেনেও সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, এই কারণেই বোধ হয় শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে বৈজ্ঞানিকমন্ততার প্রসারের জন্য 'বিশেষভাবে' আবেদন করাকে তিনি প্রয়োজনীয় বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করেন যে 'বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতো শিল্পপদ্ধতির উপার্জনও শ্রেণীহীন,' তিনিও কেন সাহিত্যকে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার সহজ সীমারেখায় দ্বিধাবিভক্তি করতে উৎসুক? মহৎ সৃষ্টিমাত্রই তো ঊর্ধ্বহিতাহিত।

পুস্তকপরিচয়ে প্রবৃত্ত হয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়ত রীতিবিরুদ্ধ। আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য বলছি: আমার উদ্দেশ্য শুধু এটাই দেখানো যে এ-পুস্তকের নিঃশব্দ গলাধঃকরণ সম্ভব নয়, মনের মধ্যে অসংখ্য তর্কবিতর্ক পেঁচিয়ে ওঠে, আর যে-কোনো গ্রন্থের পক্ষেই এটা যে সদ্‌গুণ তা বলাই বাহুল্য। উদাহরণত মাইকেল সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি কি অনেককেই বিচলিত করবে না? 'য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মধুসূদনের মানসে বাংলার জনজীবনের দৃষ্টির আভাস আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন সভ্যতাকে সে দৃষ্টি নিজের ভাষ্য দেয়, সমালোচনার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। তাই মধুসূদনের নাটক দুটিতে ভাষার যে সরস স্বাস্থ্য, যে দেশজ পেশীর সচ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমরা বঙ্কিমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের মিশ্রণকৃতিত্বে পাই না।' এখানে মাইকেল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর অপ্রতিবাদিত আলোচনাটি বারংবার মনে পড়ে। তারপর দীনবন্ধু মিত্রকে 'আমাদের নাট্যসাহিত্যের শীর্ষে' স্থান দেওয়া অথবা হেমচন্দ্রকে 'কবিতার তুলাদণ্ডে' 'ঈশ্বরগুপ্তের সমগোত্র' বলা বোধ করি অনেকেই বরদাস্ত করবেন না। দুঃখের বিষয় এগুলি সবই মন্তব্য এবং মন্তব্যমাত্রই কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে বাধ্য। যাই হোক, পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, যে-উৎকট অসহিষ্ণুতা তথাকথিত বামপন্থী সমালোচনার

অঙ্গাভরণ, 'রুচি ও প্রগতি' তা থেকে অনেকটা মুক্ত এবং এদিক থেকে বিষ্ণু দে বলতে গেলে বরফ্ ভাঙার কাজই করেছেন।

এবং যে-প্রগতিবাদ অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে চীৎকৃত প্রস্তাবমাত্র, বিষ্ণু দে'র বেলায় তা, নিঃসংশয়েই বলা যায়, রসোত্তীর্ণ কাব্য। কর্মে ও কথায় সত্যকার আত্মীয়তা অর্জন করা সহজ নয়, সরল নয় যুক্তি ও ভাবজীবনের সংশ্লেষণ। যে-বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখেন আর যে-বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকার তাঁরা যে অভিন্ন ব্যক্তি তা বিশ্বাস করা রীতিমত কঠিন। কিন্তু 'সন্দ্বীপের চর', মনে না হয়েই পারে না, 'রুচি ও প্রগতি'র একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি এবং শেষোক্ত গ্রন্থ বিষ্ণু দে'র কাব্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য নিশ্চয়ই অপরিহার্য।

মানবিক শুভদৃষ্টিতে এবং সম্পূর্ণতার প্রত্যয়বোধে এ-কাব্য অতুলনীয়। 'সন্দ্বীপের চর', এক কথায়, বিষ্ণু দে'র সমুদ্রযাত্রা এবং তাঁর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাদেরও।

নিয়ে চলো * * * উত্তাল উর্মিল
প্রতিশ্রুতি থরথরীর অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনাস্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠনে, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন ॥'

অথবা

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর স [illegible]
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বায়ুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামকরতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রত্নের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা! উর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা শুব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে।

পাঠান্তে কার মন না উদ্দাম হয়ে ওঠে, অস্থির হয় না জীবনের জঙ্গমতায়?

আর 'সমুদ্র স্বাধীন' কবিতায় গঙ্গা, কাবেরি, নর্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, শতদ্রু, তিস্তা, যমুনা ইত্যাদির এবং 'চৈতে-বৈশাখে' কবিতায় কোকনদ, রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, হস্তীগুম্ফা, কাম্বে, কচ্ছোপসাগর ইত্যাদির অপূর্ব প্রয়োগ আমাদের মনকে স্বল্পায়াসেই সুদূর দিগন্তপিয়াসী ক'রে তোলে, যা, আশঙ্কা হয়, অন্য লোকের হাতে হয়ত ভৌগোলিক নামাবলির নির্ঘণ্ট হয়েই পরিসমাপ্ত হত। বিষ্ণু দে'র অপরূপ শিল্পকার্য এ-সংগ্রহের প্রত্যেকটি দীর্ঘায়িত কবিতাতেই পরিস্ফুট এবং যদিও অনেকগুলি রচনা সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক আর আমাদের একটি শোচনীয় জাতিগত দুঃস্বপ্নের স্মৃতিবহ, তবু লেখকের কলাকৌশলে আমরা তাৎকালোর গণ্ডিকে অতিক্রম করি; 'কঙ্কালীতলা'য় আর নাম কবিতাটিতে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বীভৎস চিত্রকেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে দেখি, এবং কবি-যে ছিন্নদশীর জনতায় পথভ্রান্ত হননি তা দেখে উল্লসিত হই, তাঁর কাছে আলোকের সন্ধান পাই, সান্ত্বনা পাই।

বক্তব্যের দিক থেকে বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ রচনাই একটি আর একটির পুনরাবৃত্তি। তবু সুদক্ষ কারিগরিতে এবং মানবিক মূল্যের অঙ্গীকরণে, বর্তমানের যন্ত্রণার পাশাপাশি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে, মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার বলিষ্ঠ ইশারায় প্রত্যেকটিই স্বকীয়সার্থক। দুঃখের বিষয়, একই শব্দের অবিরাম ব্যবহার মাঝে-মাঝে কাব্যের সীমা অতিক্রম ক'রে ডেমাগগির দিকেই অগ্রসর হয়েছে, তবে এমনতর অসংযমের উদাহরণ কমই। তাছাড়া প্রতীকগুলি প্রায়ই দেশীয় ঐতিহ্যঘেঁষা হওয়াতে ভারানুষঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ততায় কবিতাপাঠ আনন্দময় হয়ে ওঠে।

উপযোগবাদীরা সম্ভবত 'সন্দ্বীপের চর' পাঠ ক'রে সন্তুষ্ট হবেন না, কেননা এতে শিশুবোধ্য সরলীকরণ নেই, প্রস্তাবের চাইতে প্রতীতিটাই স্পষ্টতর। সেই জন্যই বোধ হয় এ-গ্রন্থ কাব্যের স্তরে উন্নীত, আর তাই বিষ্ণু দে'র অনুপযুক্ত এমন দুর্বল পংক্তি আমাদের রীতিমত পীড়া দেয়: 'মনুষ্যত্ব চোখে জলে, একমাত্র ধনিদরিদ্রের ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলোনি'।

এ-গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, আমার মনে হয়, 'আইসায়ার খেদ'। এক চিরন্তন বেদনাবোধের উপর এর সংস্থান, পরিমিতআয়ু মানুষের সান্ধ্য মানসবিবরণ—স্মৃতিরোমন্থনে আনন্দ, জীবনের প্রতি লালসা, বর্তমানের প্রতি তির্যকচারী দৃষ্টি আর কালের উধাও যাত্রা। সাঁওতাল, উরাওঁ আর ছত্রিশ-

গড়ী গানের অনুবাদ 'সন্দীপের চরে'র অন্যতম আকর্ষণ; উল্লেখযোগ্য ১নং ছড়া, 'শালবন' নামক সনেটটি। কিন্তু ফরাসী কবিতার অনুবাদ একটিও ভালো লাগল না। Might have been more out of shame but weakness for friendship eh!

অরুণকুমার সরকার

প্রাচীন প্রাচী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা লিমিটেড। ১॥০

মুদ্রাযন্ত্র-নিঃসৃত প্রকাণ্ড প্রবাহের মধ্যে 'প্রাচীন প্রাচী' ক্ষণিকের ক্ষীণ বুদ্‌বুদ নয়, এর আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং আমাদের ঐতিহ্যচেতনার উদ্বোধক। এ-বইয়ে কবি তাঁর হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেন নি, তাঁর বৈদগ্ধ্য প্রচার করেছেন। সেটাই যথার্থ কবি-কর্ম কিনা, সে আলোচনা এখানে অবান্তর; এখানে আসল কথাটা এই যে এর প্রতিটি ছত্র পরিণত মানসের শ্রমাঙ্কিত। তবু শেষ পর্যন্ত একটা 'কিন্তু' এসেই পড়ে। এই মারাত্মক 'কিন্তু'টাই এ-যুগের অভিশাপ।

কবিসমাজে ইতিবৃত্তবেত্তা, ভূগোলবিশারদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে ত্রাত্য ব'লে গণ্য, এমন কথা বলার সময় আমরা আজ পেরিয়ে এসেছি। তাই কবি যখন ইতিকথাকোবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আমাদের বলতেই হয়—স্বাগতম্! তবে জমাটরকম কতগুলো ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের তালিকা যখন কবিতার সঙ্গে অনুস্যূত হয় তখন পাঠকমাত্রেই ন্যায়সঙ্গতভাবে আপত্তি তুলতে পারেন না কি? এ-সব বিষয়ে উপদেশও কি কবির কাছ থেকে নিতে হবে? উপদেষ্টার কি এতই অভাব? তবে রসের পরিবেষণ-ভার নেবেন কে? আর তা ছাড়া ঠাসাঠাসি ক'রে কতগুলো নামের সন্নিবেশনে কাব্যেরও মান থাকে না, ইতিহাসেরও জাত যায়। এই উভসংকট 'প্রাচীন প্রাচী'র সবএ উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি।

'প্রাচীন প্রাচী' তিনটি দীর্ঘ কবিতার সংগ্রহ: 'এশিয়া', 'ভারতবর্ষ' ও 'বাংলা'। তিনটিই গদ্যকবিতা, তিনটি একই সুরের। ওঠা নেই, পড়া নেই, যেন গজনীর আওয়াজ। তবু বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যেই চারণের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। অবশ্য আজকের দিনে পাঁচালী রচনা ক'রে বসলে নিজেকেই খেলো হ'তে হয় সত্যি কথা, তবে পাঁচালীকে এড়াতে গিয়ে অষ্টোত্তর শতনাম রচনা করাটাও সমানই দুঃখ। তবে সঞ্জয়বাবুর লেখনী স্বভাবতই কোমল ও মসৃণ ব'লে এই কবিতা-ক্যাটালগের ভিতরেই—এবং বাইরেও—এমন অনেক ছত্রই ছড়িয়ে আছে যা নিঃসংশয়ে মূল্যবান।

বিশেষ ক'রে 'ভারতবর্ষ' কবিতাটির প্রথম ও শেষটুকু বড়ো সুন্দর, যেখানে কবি ইতিহাস-দেবতাকে সম্বোধন করেছেন—সেই অক্লান্তকর্মা যাঁর নাভিনালে ফুটে উঠেছিলো 'অতীতের শতদল', আর ফুটে উঠবে ভবিষ্যতেরও পদ্মরাগ। মালা তিনি গেঁথেই চলেছেন—সে-মালা-গাঁথার শেষ নেই—'শেষ নেই ফুলের মতো জীবনের, জীবনের মতো ফুলের'—

> ফুল—যার সুরভিত স্বপ্নে এসেছে আমার বসন্ত—
> আমার বৈশাখ, আমার আষাঢ়, রূপায়িত যার রূপরেখায়।
> যে মাটি ফুল ফোটায় আমার রক্তে তারই হাতছানি—
> পঙ্কমাতার পঙ্কজ আমি মহাকালের মালায়।

এখানে কবির স্বকীয় সুর লেগেছে।

'এশিয়া' কবিতায় কবি আমাদের নিয়ে গেছেন সুদূর অতীতের অন্ধ থেকে অন্ধতর পথে কল্পনার আলো ফেলে-ফেলে কতো বাবিলন, আসীরিয়া, মিডিয়া, ফ্রিজিয়া, লিডিয়ায়—নিনেভের প্রাসাদ থেকে শুনিয়েছেন সেনাচেরিবের রণভেরী—প্রাচীন মহাচীন ও প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও কিছু-কিছু—এমনকি জোরোয়াস্টার, অহুরমজদাও বাদ পড়েননি। কিন্তু আশঙ্কা এই যে অতো অন্ধকারে বিচরণ করতে দৃষ্টি হারাবে না পাঠক? সিদ্ধার্থধাত্রী লুম্বিনীর বনতল থেকে গলগোথার পবিত্র তিরোধানভূমি একদিন যা ক্রুশ-কলঙ্কে অঙ্কিত হয়েছিলো—এ সবেরই রঙ্গালয় হ'লো এই প্রাচীন এশিয়া। বুদ্ধ, খৃষ্ট, কন্‌ফুশিয়স্, মোহম্মদ সকলেই এখানকার—পৃথিবীর সব কটি প্রধান ধর্মের সূতিকাগার এই পুরাতনী এশিয়া। কষিত মনের পটে এই নামাবলীর জাদু ছবি আঁকতে সুরু ক'রে দেয়, সে-কথা সত্য, সে-ছবির বৈদেশিক রোমান্তিকতাও উপভোগ্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাব্যসার আমরা কী পেলাম, এ-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর মেলে না।

'বাংলা' কবিতাটির ভাষা-ব্যঞ্জনা মৃদু ও মায়ালু। বাংলার অনেক পরিচিত নামই আছে—সেই গৌড়ের অভ্যুদয় থেকে আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত। জয়দেব, ঘোয়ী, চণ্ডীদাস, বার-ভুঁইয়া, ক্লাইভ, পলাশী, চার্নক, বর্গী···তিতুমীরের কেল্লা পর্যন্ত। কোনো দেশকে জানবার উপায় অবশ্য তার ভূগোল আর ইতিহাস: কিন্তু আবার বলি, কাব্যে কি এতটা বস্তুভার সইবে?

কোথাও-কোথাও খটকা লাগলো। যেমন: 'যদু আর তুর্বসুর সৌরাষ্ট্র-বিজয়ে'—তুর্বসু কিংবা তুর্বশ দুটোই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু 'তুর্ব্বষ'?

মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে তুর্বসু পাওয়া যায়, কিন্তু বেদে তুর্বশ আছে। ত্বমাবিথ নর্য্যং তুর্বশং যদুং। (ঋক্ ১।৫৪।৬) এমন কি ঋগ্বেদে এক জায়গায় ইনি যদুতুর্বশ হ'য়ে গেছেন, কিন্তু তুর্বষ কোথাও তো নেই।

পরশপুর না পুরুষপুর? গান্ধাররাজ্যের রাজধানী তো? অর্থাৎ আধুনিক পেশোয়ার। কুশান আমলেও রাজধানী ছিলো ওটাই। তবে আর পরশপুর কেন?

কয়েকটা বর্ণাশুদ্ধি কিংবা মুদ্রাশুদ্ধি দৃষ্টিকটু—'শূণ্যতা' 'প্রাঙ্গন', 'কীরাত', 'মহিশূর' 'পৃথিবল্লভ' 'বাশুলী'। প্রথম দুটি একাধিকবার চোখে পড়লো ব'লেই উল্লেখ করলাম।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

একা। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সংকেত ভবন। দু টাকা।

কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতায় যা আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে উপলক্ষ্যনির্বিশেষে তাঁর সপ্রতিভ মার্জিত নাগরিকতা। সমর সেনের মতো, হয়তো সমর সেনেরই প্রভাবে, তিনি নাগরিক কবি, মানে নগর-জীবনের কবি, সেই অর্থে আধুনিক জীবনের কবি। তাই বলে নাগরিক নির্জীবতায় মনে-মনে তিনি যে পরিতৃপ্ত তা নয়। বরং শহরের ধূসর বন্ধ্য জীবনের উদ্দেশ্যহীন হৈ-হুল্লোড়ে আধুনিক জীবনের ব্যর্থতা বোধ ক'রে তিনি বিষণ্ণই।

…গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান
দুর্লভ স্বপ্ন।
সকালে বাজার, দুপুরে আপিস, রাত্রে তাস। নগ্ন
শিশু, ছিন্ন কাঁথা, সূতিকা, ক্ষয়কাশ—
জীবন-জ্যামিতির ফাঁস।…

…মাঝে মাঝে খর
রৌদ্রের গান ভেসে আসে।
সমস্ত আকাশ একটি মেয়ের মুখের মতো; দুপাশে
ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা রাত্রি।…

…একটি
একটি মানুষ; কয়লার পাউডারে, কালির শ্রীমে
সারি সারি দূরে দূরান্তরে অগণিত।…

কিন্তু তাতে কী! এখানেই দিন কাটে, কাটবেও। আধুনিক বিশুষ্ক জীবনের অতৃপ্তি তো আছেই; তবু আর যাই হোক, ঘুরে ফিরে এই শহরেই যেন আসি—কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতায় এই অনুচ্চারিত প্রার্থনা আমি শুনতে পাই। মাঝে-মাঝে পাহাড়ি শালবনে কি ছুটিতে শান্তিনিকেতনে অবুঝ প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা তাঁকে বিচলিত করে, কিন্তু তিনি যে সেখানে আগন্তুক এ-কথা মনে থাকে। শালের বনে যখন 'শীতের সোনার তীর' ঝলমলায়, তখনো শিশিরভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে শাড়ির ভাঁজে চোরকাঁটার ভিড়ের দিকেই তাঁর চোখ। উপমাদিও তিনি সাধারণত এই নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই খুঁজে আনেন। অনেক দিন আগেকার লেখা এক কবিতায় তিনি চাঁদের উপমা দিয়েছিলেন—

যেন স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে তুমি
ঝলমলে
ঝকঝকে।

'একা'র একটি কবিতায় আছে,

নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো
নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে কালি।…

কামাক্ষীপ্রসাদের কবিতা সম্বন্ধে এ অভিযোগ সুপ্রচলিত যে তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই, আর তাঁর ভঙ্গিও প্রধানত সমর সেন ও অমিয় চক্রবর্তীর, কখনো বিষ্ণু দে-র, কখনো বুদ্ধদেব বসুরও; তবু বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্তত এই কারণে যে পঁচিশ পেরিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন আর ত্রিশ পেরিয়ে বই ছাপিয়েছেন। আজ থেকে দশ বারো বছর আগে তাঁরই সমসাময়িক আর যাঁরা অতিআধুনিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ক্ষণবসন্তের সেই পাখীরা আজ কোথায়? কামাক্ষীপ্রসাদও সেই অদম্য আধুনিকদের অন্যতম। তাঁর কবিতা চমক লাগিয়েছিলো প্রথম থেকেই। প্রথম গ্রন্থের প্রায় এগারো বছরের মধ্যে তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখে এখনো আশা হয় যে, যদিও চারখানা বই লিখেও নিজের কোনো বৈশিষ্ট্য আজ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করতে পারেননি, তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর সমবয়সীদের নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে নিজেকে তিনি ব্যতিক্রম বলেই প্রমাণ করতে পারবেন।

এই পর্যন্ত বলে থামতে পারলেই সুখী হতুম, যদি না 'আঁধি', 'আমরা', 'প্রহরী', 'পুনরুজ্জীবন', 'বিকেলের নদী', প্রভৃতি কবিতা এ গ্রন্থে থাকতো।

কেননা এই কবিতাগুলিতে তাঁর কবিস্বভাব নিয়ে এই প্রথমবার তাঁকে ঈষৎ লজ্জিত, বিব্রত ব'লে মনে হলো। তিনি যে 'রোমান্টিক' নন, তিনি যে হালম্যাফিক কথাও বলতে জানেন, সেইটে প্রমাণ করবার জন্য তিনি এমনকি নিম্নোক্ত শব্দরাজি লিখেও ছাপিয়ে দিয়েছেন !—

প্রাণে আজ প্রাণ দাও, কানে দাও গাণ্ডীব টঙ্কার
শত্রুর সগর্ব বুট মেখে যেন এ বুক আমার

চা খাবে ? (নিজেকে প্রশ্ন) ভাঙা আর ফাটা পেয়ালায়
অথবা মাটির ভাঁড়ে গুড় জলে ? (চিনি নেই হায়)।

আমাদের আছে মাটি, লাঙল ফসল আর সুবর্ণ মজাই
বর্বর রাজার নীতি রুখবো সবল বুকে আমরা নিশ্চয়াই।

তাছাড়া কয়েক জায়গায় ছন্দব্যবহারে আমার একটু খটকা লাগলো। যেমন :

ছিন্ন করেছি বহু শতাব্দীর মেকি আবরণটিকে,
এ ঐশ্বর্যের সমারোহ কোন পথে নিয়ে যাবো তুলে ?
ক্লান্তির গামছা পেতে কয়েকটি হাটুরে

নিশাঠাকুরের কড়চা, শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, দেড় টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কবিতা লিখে আমাদের অবাক ক'রে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে 'গীতিধর্ম' আছে কি না, চণ্ডিদাস একজন না তিনজন, চৈতন্যদেব গ্রহণের আগে জন্মেছিলেন না পরে,—এই সব নিগূঢ় গবেষণাতেই যেখানে সাহিত্যপাঠ অবসিত, সেই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে কবিতা লেখা অসাধ্যসাধন ছাড়া আর কী ? সসংকোচে তাই বইখানা খুলেছিলুম ; কিন্তু অনায়াসে শেষ করলুম, কোথাও হোঁচট খেতে হোলো না, এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্নিগ্ধতা জড়িয়ে থাকলো মনে। লোনা নদীর ঢেউয়ে গড়া দক্ষিণ বাংলার একটি গ্রামজীবনে দুশো বছর ধ'রে ভাঙাগড়ার দীর্ঘশ্বাসময় কাহিনী নিয়ে দীর্ঘ নামকবিতাটি রচিত। অখ্যাত গ্রামদেবতার অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা রেখে ধর্মভীরু গ্রামবাসীদের যে-শান্তিনীড় গড়ে উঠেছিল, নতুন কালের ঝোড়ো হাওয়ায় তার চালচুলো উড়ে গেল, আসর বদলো যুগান্তরের। তবু লোক হাটে যায়, মাঠে যায় চাষী, কারখানার বাঁশি ভোরের ঘুম ভাঙায়, অশেষ প্রাণধারার স্রোত বয়ে চলে। এই নিঃস্বন্ধ রূপান্তরের নিরলংকার কাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ভাসিত হোলো।

সুমিত ভাষা-ছন্দ-ভাবের অবিচ্ছেদী সহযোগিতায় যে-কবিতার নির্ভর, স্বভাবতই 'নিশাঠাকুরের কড়চা' সে-জাতের নয়। মুখে মুখে কথা বলার মতো অনায়াস সরলতার ঢং। যেমন :

যা নিয়ে ঘটলো মনোমালিন্য
সেটা ঠিক ছিল না অসামান্য,
কিন্তু মনে ঘটল যেটুকু মালিন্য
সেটুকু ছিল না নেহাৎ সামান্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে এ-ধরনের মৌখিক সরলতার আর কি দিন আছে ?

যাত্রী। শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দেড় টাকা।

চৈতীদূর্বা। বিনয়কৃষ্ণ কর। বহ্নিশিখা প্রকাশনী। আড়াই টাকা।

'কবিতা'রই কোনো এক সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা ভালো লেগেছিল আমাদের। কিন্তু তাঁর এই কবিতাসংগ্রহে সেই দুটি কবিতাই মাত্র উল্লেখযোগ্য দেখে হতাশ হলাম। শ্যামাপদবাবুর ছন্দের হাত ভালো, মনও সংবেদী। তবু যে এক-একটি কবিতা ভালো হয়ে উঠতে-উঠতে এলিয়ে পড়ে, ভাষাব্যবহারে শৈথিল্যই তার প্রধান কারণ। আধুনিক কালের ব্যর্থতাবোধই যদি কবিতার বিষয়বস্তু হয়, তাহলে 'পোয়েটিক ডিকশনের' গতানুগতিকতা পরিহার করা ছাড়া পথ নেই। তাছাড়া আবেগই কবিতার উৎস হলেও সংহতভাবে যথাযথ বিন্যস্ত না-হলে সে-জলে কাব্যের আলো পড়ে না। এ-বিষয়ে অবহিত হলে তিনি ভালো লিরিক লিখতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

'চৈতীদূর্বা' সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে এর মলাটের আষ্টেপৃষ্ঠে পরিচিতি। জনৈক খ্যাতনামা গাল্পিকের, তদুপরি প্রকাশকের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে যে-ধরনের শব্দাবলী অসমান পংক্তিতে মুদ্রিত হয়েছে, তার একটু নমুনা দিই :

বাতাসেরে বলি,
'বহ না বাতাস তুমি জোরে
কানের পাশ দিয়া,'
ও বহে পং পং করি
বলি, 'কই, কবিতার ধ্বনি তব কোথায় ?'

কবিতার বিষয়, ভারতে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উল্লাস। বইটি কি ছাপাতেই হোলো ?

নরেশ গুহ

সমালোচনার পরিভাষা

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা সাহিত্যের উদ্বর্তনের অন্যতম অন্তরায় ভাষাদৌর্বল্য। এই দৌর্বল্যের প্রধান হেতুমূল দ্বিবিধ : প্রথমত, বাংলায় ক্রিয়াপদের দীনতা আত্যন্তিক ; দ্বিতীয়ত, শব্দকোষ নগণ্য। এর মধ্যে প্রথমটি কথাসাহিত্যিককে কাঁদিয়ে ছাড়ে ; দ্বিতীয়টি বাদ সাধে কবির ইচ্ছায়, প্রাবন্ধিকের সংকল্পে। প্রথমটি অবশ্য বাংলাভাষার প্রকৃতিগত, এবং সেইজন্য, কথ্যভাষার এবং উপভাষার সাধকতা সত্ত্বেও, অচিকিৎস্য। কিন্তু সৌভাগ্যত—একই কারণে—এটি-যে শুধু অপ্রতিকার্য ব'লে অগত্যাসহনীয় তা নয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই দুর্বলতারই শক্তিতে রূপান্তরণ সম্ভব, যেহেতু প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ এবং সাংস্কৃতিক বাক্যবন্ধ, দুটোই ক্রিয়াপদলোপের পক্ষপাতী। কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধুই বাধা, সীতান্বেষী রামচন্দ্রের সামনে সমুদ্রের বাহুবিস্তারের মতো, দৃশ্যত অলঙ্ঘ্য, কিন্তু বস্তুত বিজেয়। অনুপ্রাণনার এমন প্রজ্জ্বলন, কল্পনার এমন উল্লম্ফন হয়তো সম্ভব, যাতে এই বাধার পবননন্দনী পরাভবন মন্ত্রবলে ঘ'টে যায় ; কিন্তু কল্পনার কাদাচিক স্বৈচ্ছিকতা সত্ত্বেও বাধা বাধাই থেকে যায়, বাস্তবিক সেতুবন্ধ না-হ'লে সীতা-উদ্ধার হয় না। আর নির্মিতির সেই পরাকর্মে যেহেতু কাঠবিড়ালির প্রচেষ্টাও স্বীকার্য, তাই সাহিত্যসমালোচনার পরিভাষার উদ্ভাবনে এবং প্রমীকরণে আমার মতো অপণ্ডিতের এই প্রযত্ন।

বাংলার বাগ্‌স্পত্যমণ্ডল শুধু বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক পরিভাষায় মনোযোগী ব'লে, এ-কথা আমরা প্রায় ভুলেই থাকি যে বর্তমান বাংলাভাষা কোনো বস্তুর বা ভাবের যথোচিত এবং যথার্থ বর্ণনাতেও পরাঙ্মুখ, যার ফলে আমাদের কথাসাহিত্য পর্যন্ত নিস্তেজ, এবং সাহিত্যের মতো সাধারণিক বিষয়েও প্রবন্ধরচনা

দুঃসাধ্য। যদিও বাঙালি সাহিত্যস্বভাবী, তবু সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের অবোৎকর্ষের বিবিধ কারণের মধ্যে ভাষার নিষ্কর্মতা অগ্রগণ্য। ভাষার অভাবে, মামুলি কথাতেও রম্যতাসঞ্চার আমাদের-তো সাধ্যাতীতই, উপরন্তু, যেহেতু চিন্তা শব্দোপায়ী, মনক্রিয়ার শক্তি যাঁর প্রকৃত, এমন লেখকেরও চিন্তার সাহস ক'মে যায় ; বক্তব্যের সঙ্গে বচনের ব্যবধান বুঝে তিনি উদ্গত প্রসঙ্গ চাপা দেন, কোনো-কোনো বিষয় এড়িয়ে চলেন, এবং অর্থের সূক্ষ্ম তারতম্য বাধ্য হ'য়ে ভুলেই থাকেন। চিন্তার সঙ্গে মন্তার এই লুকোচুরির বিবিধ প্রকটন আমাদের গদ্যালোচনায় লক্ষণীয় : যথা উপমাবাহুল্য, বৃত্তকথন, অতিসারল্য, অতিঘনতা এবং মধ্যপদলোপী পদ্ধতি। কিন্তু আদি দারিদ্র্যের ক্ষতিপূরণ কোনো কৌশলেই ঘটে না ; ভাষার শতচ্ছিদ্রে বেরিয়ে যায় কিছু-না-কিছু অর্থ ; এবং আতিশয্য বা অবৈশদ্য, অস্পষ্টতা বা দুরূহতা থেকে সাধারণত নিস্তার পান না সাহিত্যিক অধিকর্তারাও। তাই, ভাষা চাই।

ভাষাসমৃদ্ধি রচনাক্রিয়ারই উপজাতক নিশ্চয়ই ; কিন্তু যেহেতু বিবেকী লেখকরা স্বল্পসংখ্যক এবং স্বল্পঠিত, এবং দুর্ভাষা দ্রুতসংক্রামক, তাই স্বভাবী প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষার শব্দাল্পতার পূর্ণপ্রতিকার আশুসম্ভব হ'তেই পারে না। তাছাড়া, শব্দোদ্ভাবনের পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেলে বিবেকী লেখক আরো নিবিষ্ট হ'তে পারেন রচনাকর্মেই, এবং সে-পরিশ্রমে যাঁদের অনীহা বা অনীপ্সা, তাদেরও, তৈরি ভাষা পেয়ে, রূপায়ণের সামর্থ্য বাড়ে। প্রসঙ্গত, বর্তমান বাঙালির শিক্ষাসংকরও উল্লেখ্য : আমাদের সাহিত্যিক পঠনপাঠন, অবশ্যতই, প্রধানত ইংরেজিতে ব'লে, যেখানেই প্রাকৃত ভাষায় কুলোয় না, সেখানেই, বক্তব্য থাকলেও, বলতে গিয়ে আমরা অনেকেই ফেল পড়ি। অপরাধ অবশ্য ইংরেজির নয়, অপরাধ আমাদের, আমাদের আত্মঘাতী সংস্কৃতবৈমুখ্যের। ইংরেজি যেমন আমাদের পক্ষে বিশ্বচেতনার নান্যপ্রণালী, আমাদের

ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি তেমনি সংস্কৃত ; এ-দুয়ের রাজযোটক ঘটাতে পারলে, তবেই সম্ভব আধুনিক বঙ্গভাষায় নির্বস্তুক ভাবের যথোচিত অভিব্যক্তি।

পরবর্তী শব্দতালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, পর্যাপ্তও নয়, অব্যতীতরূপে যথার্থও নয়। তবু বঙ্গীয় সারস্বতসমাজে এটি পেশ করছি এই আশায় যে জ্ঞানীজনেরা শুধু আমার ভ্রান্তিশোধনেই ক্ষান্ত হবেন না, নিজেরাও এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হবেন, এতদূর উদ্‌যোগী যে বাঙালির সাহিত্যচিন্তার, অন্তত শব্দাভাববশত, ক্ষীণতার আবশ্যিকতা ঘুচবে। তাছাড়া, এই তালিকায় আমার দায়িত্ব অত্যল্প ; অধিকাংশ শব্দই প্রচলিত, কিংবা পূর্বসূরীর মেধাপ্রসূত ; যথাস্থানে যথাসম্ভব প্রাপ্তিস্বীকারের পরে এ-কথা জুড়তে হয় যে উৎসারোপণে বা অর্থনির্ণয়ে যদি কোথাও ভুল ক'রে থাকি, সেটা আমার বহুপ্রসারী অজ্ঞতারই নিদর্শন। 'প্রচলিত' শব্দাবলীর, আমার বিশ্বাস, একটি বৃহদংশের আদিজনক রবীন্দ্রনাথ ; আর-একটি অংশ অন্যান্য আধুনিক লেখকদের রচনাক্রিয়ার উপজাতক ; বহুব্যবহার সেগুলিকে সামান্যতা দিয়েছে ; বর্তমানে বিশেষীকরণ সম্ভব শুধু রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের শব্দোদ্ভাবনের। অচিহ্নিত শব্দগুলি অবশ্যতই আমার স্বোদ্ভাবিত কিনা, সে-বিষয়েও আমি বিসন্দিগ্ধ ; কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি শুধু প্রচলিত কিংবা জ্ঞাত বিশেষ্য থেকে বিশেষণ, বা বিশেষণ থেকে বিশেষ্য বানিয়েছি ; কিংবা জ্ঞাত বা প্রচলিত শব্দের রূপের বা অর্থের তারতম্য ঘটিয়েছি অনুগুণত্ব আর দ্ব্যর্থকতামোচনের দিকে লক্ষ্য রেখে। উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথ design-এর যে-প্রতিশব্দ দিয়েছিলেন, সেই 'আকল্প' আমি গ্রহণ করেছি pattern অর্থে, কেননা design অর্থে 'প্রতিমান' লক্ষ্যভেদী। 'চলন্তিকা'র প্রাণতত্ত্ববিভাগে assimilation অর্থে 'আত্তীকরণ' আছে, ধনবিজ্ঞান বিভাগে utility অর্থে

'উপযোগ'। কিন্তু সাহিত্যপ্রসঙ্গে প্রথমটিকে 'আত্মীকরণ' বলাই যথার্থ ; আর utility শিল্পকলার অনুরূপী নয় ব'লে 'উপযোগ' চিহ্নিত করা হ'লো use-এর প্রতিশব্দরূপে। Ephemeral অর্থে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাবিত 'আশুক্লান্ত' বর্তমান তালিকায় delicate অর্থে গৃহীত হ'লো। অবশ্য এই পরাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সর্বত্র পৌঁছতে পারিনি ; কোনো-কোনো শব্দ মাথা খুঁড়েই পেতে হয়েছে—এমনকি কপাল কুটে ; কিন্তু সেগুলি আমার সাম্প্রতিক উদ্ভাবন হ'লেও হয়তো কোনো পূর্বসূরীরই প্রবর্তন। যদি পূর্ব-প্রবর্তিত কোনো শব্দকে বর্তমান তালিকায় স্বকীয় ব'লে জ্ঞাপন ক'রে থাকি, সেটাও, আমার কুন্তিলপ্রবণতার নয়, পুনরায় আমার অজ্ঞতারই প্রমাণ। আমার নিজের ধারণা, তালিকার অচিহ্নিত শব্দাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক অপূর্বতার অধিকারী মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি।

কোনো-কোনো অতিপ্রচলিত শব্দও এর অন্তর্ভুক্ত করেছি, কেননা ভাবাত্মক প্রায় কোনো শব্দই বাংলায় এখনো প্রমীকৃত নয় : একই ভাবের জন্য—সামান্য ভাবের জন্যও—ভিন্ন-ভিন্ন লেখক ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ, এবং একই লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ, ব্যবহার করেন ব'লে অর্থবোধে অপলাপের আর বাদানুবাদে বিপ্রলাপের আশঙ্কা নিত্যোপস্থিত। নিকটবর্তী বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন অভিধাই এর প্রতিকার ; কিন্তু নূতনের প্রবর্তনা পুরাতনের সংজ্ঞাসাপেক্ষ ব'লে অতি-প্রচলিতেরও পুনর্নির্ণয় বাঞ্ছনীয়। শব্দ-বহুত্ব শব্দবাহুল্যের বিপরীত ; কোনো ভাষায় শব্দসংখ্যা যত বাড়ে, বিপ্রতিশব্দীকরণ ততই এগোয় ; এবং বাংলাভাষার প্রৌঢ়িপ্রাপ্তির পক্ষে এই শব্দঋদ্ধি আর শব্দসিদ্ধি এখন যুগপৎ প্রয়োজন।

ভাবাত্ম শব্দের দ্ব্যর্থকতাপ্রসূত বিপ্রলাপের একটি বৃহৎ উদাহরণ এখানে উল্লেখ্য। Industry অর্থে শিল্প, যদিও সাংবাদিকতায়

প্রচলিত, 'চলন্তিকা'য় গৃহীত এবং 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা'য় অঙ্গীকৃত, তবু স্পষ্টতই অসম্ভাব্য, যে-কোনো সময়ে যে-কোনো প্রসঙ্গে অসম্ভাব্য। কেননা Art এবং Industryর অভিধা যদি অভিন্ন হয়, তাহ'লে শুধু-যে Art in Industry বা Industry without Art বাংলায় অবশ্যত অব্যক্ত থাকবে তা নয়; শুধু-যে 'শিল্পরসায়নী'তে শিল্পকলার আন্তর তত্ত্ব এবং industrial chemist-এর সহবাসিতা ঘটবে, তাও নয়; আধুনিক জগতের প্রধানতম একটি বিষয়ে কোনো তন্নিষ্ঠ আলোচনাই নিষিদ্ধ হবে বাংলাভাষায়। Art এবং Industry দুটোই প্রভূত-রূপে আলোচ্য ব'লেই, প্রথমোক্ত বিষয়ে 'শিল্পে'র ঐকান্তিকতা অপরিহার্য; দ্বিতীয়টির প্রতিশব্দরূপে 'শ্রমশিল্প' বা 'যন্ত্রশিল্প'ও পরিত্যাজ্য, এজন্য এমন-কোনো শব্দ চাই, শিল্পের নামগন্ধ যাতে নেই, যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ভিন্নজাত। এ-রকম কোনো শব্দ, বা তার সম্ভাবনা, আমার অন্তত এ-পর্যন্ত চোখে পড়েনি; এই একটি প্রসঙ্গে বিবেকী লেখকরা সকলেই পরোক্ষপন্থী, এবং পণ্ডিতেরা নিশ্চেষ্ট। অথচ, বলা বাহুল্য, industry এবং তার উপজাত প্রত্যেকটি শব্দের যথোচিত এবং আনন্তিক অভিধা বাংলায় এখন অত্যাবশ্যক, যেহেতু বিষয়টি অনিবার্যত আমাদের নিত্যচিন্তার অন্তর্গত, কিন্তু সে-সব শব্দের প্রবর্তন এবং প্রচলন অনতিসম্ভব, যতক্ষণ-না 'শিল্প' মুক্তি পায় industryর দিনমজুরি থেকে।

১ = প্রচলিত
২ = রাজশেখর বসু ('চলন্তিকা')
৩ = অতুলচন্দ্র গুপ্ত ('কাব্যজিজ্ঞাসা')
৪ = রবীন্দ্রনাথ
৫ = সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('স্বগত')

abnormal অস্বভাবী ২
abnormality অস্বভাবিতা

absolute পরম ২
the Absolute কৈবল্য ৫, নিরপেক্ষ ৫

abstract বিমূর্ত ২, নির্বস্তুক ৪
abstraction বিমূর্তন ২
academic বৈশ্ববিদ্যালয়িক, বিশ্ববিদ্যালয়ী, প্রাতিষ্ঠানিক
accessory আনুষঙ্গিক ২, সংযোগী ৫
accident আপতন ২
accidental আপতিক ২,৫
accurate নির্ভুল ১, যথাযথ ১ যথাতথ ২ , ৪
accuracy যাথাযথ্য ১, যাথাতথ্য ২,
achievement কীর্তি ১, অবদান ৫, পরাকর্ম
acquirement ব্যুৎপত্তি ৩
active সক্রিয় ১, সকারী ৪ (passive নিষ্ক্রিয় ১, অকারী ৪)
activity সক্রিয়তা ১, কার্যকলাপ ১
actual প্রাকৃত ৪
adequate যথাযোগ্য ৫, যথোচিত ৫
adequacy যথৌচিত্য
adolescent কিশোর ১
adolescence কৈশোর ১, বয়ঃসন্ধি ১
aesthetics নন্দনতত্ত্ব ৪
aesthetic নান্দনিক
aesthetic emotion রস ৩
aesthete সুনন্দী
allegory রূপক ১
allegorical রূপকী
alternative বিকল্প ১, বৈকল্পিক ১
alternation, বিকল্পনা

amateur শৌখিন ১, রুচিৎকর্মা
amateurish শৌখিন ১, অবকৃষ্ট, -ness শৌখিনি ৫, অবোৎকর্ষ
ambiguous দ্ব্যর্থক ২
ambiguity দ্ব্যর্থকতা
ambition অভীপ্সা
ambitious অভীপ্সু
amusement আমোদন
analysis বিশ্লেষণ ১ (synthesis সংশ্লেষণ ১)
anarchy নৈরাজ্য ৪
anthology সংকলনগ্রন্থ ১, চয়নিকা ৪, কাব্যকোষ
apparent আপাত ২
appeal আবেদন ১
appraisal মূল্যায়ন
appreciation গুণগ্রহণ ১
appropriate সমঞ্জস ২
approximate প্রায়িক ২
approximation আসত্তি ২
art শিল্প ১, the arts শিল্পকলা ১, the fine arts ললিতকলা ১, (craft ফলিতশিল্প) the art of poetry কাব্যকলা ১
artist শিল্পী ১
art connoisseur কলাবিদ্ ১, রসজ্ঞ ১, সমজদার ১
artistic শিল্পিক, artful কপট
artistic treatment শিল্পরূপায়ণ
work of art শিল্পকর্ম ১

art for art's sake কলাকৈবল্য ৫, বিষয়ান্তরনিরপেক্ষতা ৩, নির্নিমিত্তি
artifice কলাকৌশল ১, কারসাজি ৫
artificer রূপকার ৪
artificial কৃত্রিম ১
aspiration উৎকাঙ্ক্ষা ২
assimilation আত্মীকরণ
association ভাবানুষঙ্গ ২
assonance অর্ধমিল, স্বরমিল
attitude ভঙ্গি ১
authentic অকপট ৫, অবশ্যমান্য ৫
authenticity অকপটতা, অবশ্যমান্যতা
authority প্রামাণ্য ৫
authoritative প্রামাণিক ১
autobiography আত্মজীবনী ১, আত্মকথা ১, জীবনস্মৃতি ৪
autobiographical আত্মজৈবনিক ৪
average গড়পড়তা ১, মধ্যতন
axiom স্বতঃসিদ্ধ ২

background পটভূমি ১, পটভূমিকা ১
balance ভারসাম্য ১
ballad গাথা ১, গীতিকা ১
beauty সৌন্দর্য, সুন্দর ১, শ্রী ১
being সত্তা ১
belles-lettres রম্যরচনা
belief বিশ্বাস ১
biography জীবনী ১, জীবনচরিত ১
biographical জৈবনিক
biographer জীবনীকার

catastrophe কাটাসট্রফি, সর্বনাশী সমাপ্তি
catharsis চিত্তশুদ্ধি ৫
cause হেতু ১
certitude প্রমিতি ৫
character (উপন্যাস ইঃর) চরিত্র ১, পাত্রপাত্রী ১
character চারিত্র ১
characteristic চারিত্রলক্ষণ, চারিত্রলাক্ষণিক, চারিত্রিক
characterization চরিত্রণ
chiaroscuro আলো-আঁধারি ২
chorus কোরাস ১, সমস্বর ১, বৈতালিক
circumlocution বৃত্তকথন
class শ্রেণী ১
classic ক্লাসিক ১, কুলীন, চিরপাঠ্য
the classics ধ্রুবসাহিত্য
classical, classicist ধ্রুপদী ৫, নৈরাত্মপন্থী, বিষয়প্রধান
classicism নৈরাত্মপন্থা
clear প্রাঞ্জল ১
clarity প্রাঞ্জলতা ১, প্রসাদগুণ ১
cliché বুলি ১, ধরতাই বুলি ১
climax পরাকাষ্ঠা ২, পরমক্ষণ
code সংহিতা ২
coherent সুসংবদ্ধ
(incoherent অসংবদ্ধ)
coincidence সমাপতন ২, কাকতালীয় ১
collaboration সহলিখন

colloquial বাচনিক ৫, মৌখিক
colloquialism বাচনিকতা, মৌখিকতা
combination সন্নিপাত ৫
comedy কমেডি ১, আহ্লাদিকা
comic কমিক ১, হাস্যকর ১, আহ্লাদক
comment মন্তব্য ১
commentary টীকা ১, ভাষ্য ১
common সামান্য ৫
commonplace মামুলি
common sense কাণ্ডজ্ঞান ১
complex জটিল ১, বহুলাঙ্গ ৪
complicated কুটিল
complication কূটায়ন
compressed ঘন
compression ঘনতা
compulsory আবশ্যিক ৪
concentrated সকেন্দ্রীকৃত, গাঢ়
concentration অভিনিবেশ ১, সকেন্দ্রীকরণ, গাঢ়তা
concept প্রত্যয় ২, ধারণা ২, ভাবসত্ত্ব
conception ধারণা ২, ভাবান্তঃসত্ত্ব
concrete মূর্ত ২
conclusion সিদ্ধান্ত ১
condition শর্ত ১
conditional সাপেক্ষ ১, অপেক্ষ
conflict সংঘর্ষ ১
confused বিপ্রলাপিত
confusing বিপ্রলাপী
confusion বিপ্রলাপ
conscious চেতন ১, সচেতন ১

consciousness চেতন ১, চৈতন্য ১, সংবিৎ ৩
'stream of consciousness' চেতনাস্রোত ১, চিৎপ্রবাহ
consistency সামঞ্জস্য ১, স্বসংগতি
(inconsistency স্ববিবাদ)
construction নির্মিতি, বাক্যবন্ধ ৫
constructive নৈর্মিতিক
contemporary সমসাময়িক ১
contemporaneity সমসাময়িকতা ১
contemporaneous আসমসাময়িক
content প্রকারী ৫, আধেয় ৫, অন্তঃসার
continuous অনুক্রমিক ১, অবিচ্ছেদী
continuity অনবচ্ছেদ ২, আনন্তর্য ২, অবিচ্ছেদ ৫
contradiction বিরোধ ১, প্রতিবাদন
contradictory বিরোধী ১, প্রতিবাদী
self-contradictory স্বতোবিরোধী ৪
contrary বিপরীত ২
contrast প্রতিতুলনা
controversial তর্কাপেক্ষ ১
controversy বাদানুবাদ ১
convention প্রথা ১, সংস্কার ১
conventional গতানুগতিক ১, প্রথাসিদ্ধ ৫, গতানুগত
convincing প্রত্যয়ী, প্রত্যয়োৎপাদক
(unconvincing অপ্রত্যয়ী)
conviction নিশ্চিতি ৫, প্রতীতি
co-ordination সমন্বয় ২, সন্নিবেশন ৫

correspondence প্রতিষঙ্গ ২
correspondent প্রাতিষঙ্গিক
cosmopolitan বিশ্বনাগর, বিশ্বনাগরিক, উদ্বাস্তু
cosmopolitanism বিশ্বনাগরিকতা
cosmos ব্রহ্মাণ্ড ১
coterie দল ১, গোষ্ঠী ১
craft ফলিতশিল্প, বিদ্যা
craftsman কারিগর ১, কারু ১, কারুকর্মী
the craft of verse কবিকর্ম, কবিকর্মণ
craftsmanship কারিগরি ১, কারুকর্মণ
creed ক্রীড, সারাম্বা
crime দুষ্ক্রিয়া ২
criterion নির্ণায়ক ২, নিকষ ৫
criticism সমালোচনা ১, সমালোচনা-সাহিত্য ১, বিচার
critic সমালোচক ১, আলঙ্কারিক ১, ব্যাখ্যাতা
critical বিচারী
critical faculty বিচারশীলতা
'criticism of life' জীবনভাষ্য
cultivation অনুশীলন ১, প্রকর্ষণ
cultivated অনুশীলিত, প্রকর্ষিত
culture সংস্কৃতি ৪, চিৎপ্রকর্ষ ৪
cultural সাংস্কৃতিক ১
cultured সুসংস্কৃত, প্রকৃষ্টচিত্ত ৫
cynic সিনিক ১, অসূয়ক ২, শুভনাস্তিক
cynical শুভনাস্তিক
cynicism শুভনাস্তিক্য
daemon জীবনদেবতা ৪
decadence অবক্ষয় ১
decadent ক্ষীয়মাণ
deep গভীর ১, depth গভীরতা ১
definite সংজ্ঞাত, প্রমিত
definition সংজ্ঞা ১, সংজ্ঞার্থ ২
definable সংজ্ঞেয়, defined সংজ্ঞিত
degree মাত্রা ১
(kind জাতি)
delicate পেলব ১, সুকুমার ১, আশুক্লান্ত
delicacy পৈলব, সৌকুমার্য
dénouement গ্রন্থিমোচন
design প্রতিমান ৫
destructive বৈনাশিক ৪
detachment নির্লিপ্তি
details বৃত্তান্ত ১, খুঁটিনাটি ১
development পরিণতি ১, উদ্বর্তন
dialect উপভাষা ১, প্রদেশীকথন
dialogue কথোপকথন ১, সংলাপ ১
didactic উপদেশাত্মক
difference প্রভেদ ১
difficult দুর্বোধ্য ১, দুরূহ ১
direct প্রত্যক্ষ ১, ঋজু
(indirect পরোক্ষ ১, তির্যক)
discipline প্রশিক্ষা
discipline of verse পদ্যপ্রশিক্ষা

discrepancy দ্বৈধ ৫, গরমিল ৫
distinction তারতম্য ১
'divine discontent' ঐশাতৃপ্তি
doctrine মতবাদ ১
doggerel প্রায়পদ্য
drama নাটক ১, নাট্য ১, নাটকীয়তা
dramatic নাটকীয় ১, নাট্য ১
dramatic poem নাটকীয় কবিতা ১, নাট্যকাব্য ১
dramatist নাট্যকার ১
drawing অঙ্কন ১
the earlier পূর্ব-
(the later উত্তর-)
eccentric উৎকেন্দ্রিক ১
eclectic সর্বগ্রাহী
eclecticism সর্বগ্রাহিতা
ecstasy ভাবোন্মাদ ২
effect ফল ১, (নিজার অর্থে) চমক
effective কার্যকারী ১, ফলদ
efficacy সাধকতা ২, উপকারিতা ৫
effort প্রযত্ন ২, ৫
elastic স্থিতিস্থাপক ২, ৪
elasticity স্থিতিস্থাপকতা ৪
elegy এলিজি ১, বিলাপিকা
element তন্মাত্রা ৫
elemental তন্মাত্রিক ৫, আধিভৌতিক,
elementary মৌলিক ২, রূঢ়িক ৪
elliptical মধ্যপদলোপী
emotion আবেগ ১, হৃদয়াবেগ ১
emotional আবেগাত্মক
emotive আবেগী
'emotion recollected in tranquillity' নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন ৫
emphasis উদ্ব্যক্তি, উত্তারণ, প্রোচ্চারণ
emphatic উদ্ব্যক্ত, উত্তার, প্রোচ্চার ২, প্রোচ্চারিত ২
over-emphasis অত্যুদ্ব্যক্তি
endowment শক্তি ৩, ধৃক্ষমতা
entity সত্ত্ব ২
environment পরিবেশ ১
epic মহাকাব্য ১, বিণ এপিক
ephemeral ক্ষণকালীন ১, ঐকাহিক ২, অচির
epigram এপিগ্রাম, সুভাষিত, উদ্ভটবাক্য
epigrammatic উদ্ভট
equipment ব্যূৎপত্তি ৩, উপযোজন
erotic কামোদ
esoteric গোষ্ঠীগত, দীক্ষাপেক্ষ
essay প্রবন্ধ ১
essayist প্রাবন্ধিক
essence সত্তাসার, সারাৎসার
essential সারাৎসারিক
exactitude অনুগুণত্ব ৩
exercise চর্চা ১
experiment পরীক্ষা ১
explicit উৎকথিত, ব্যক্ত
(implicit অবকথিত, প্রচ্ছন্ন)

extreme অন্তিক, আত্যন্তিক
extrovert বহির্মুখ ৫
(introvert অন্তর্মুখ ৫)
facetious ছিবলে ১, বাচাল ১
facetiousness ছিবলেমি, বাচালতা ১
fact তথ্য ১, factual তাথ্যিক
faith আস্থা ১, পরাশ্রদ্ধা
fallacy হেত্বাভাস, ২, প্রমাদ
fallacious প্রমাদক
fancy খেয়াল ১, খোশখেয়াল, আকল্পনা
fanciful খোশখেয়ালি, আকাল্পনিক
fantasy প্রকল্পনা
fantasia প্রাকল্পনিকা
fantastic প্রাকল্পনিক
farce প্রহসন ১
farcical প্রাহসনিক
fashion ফ্যাশান ১, ফ্যাশন ১, কালানুচার, কালপুত্তলী
fashionable ফ্যাশনেবল ১, কালানুচারী, কালপৌত্তলিক
feeling অনুভূতি ১, অনুবোধ ৫
fiction কথাসাহিত্য ১, কাহিনী ১
crime fiction দুষ্ক্রিয়াকাহিনী, দুষ্ক্রিয়াকথন
the art of fiction কথকতা ৫, কথাশিল্প ১, কথাকলা
final অন্তম ৫
fin de siècle শতকান্ত, বিণ শতকান্তিক

flexibility নমনীয়তা ৫
form রূপ ১, sense of form রূপচেতনা
formal বিধিবৎ ২, বিধিবদ্ধ ৫
formula সূত্র ১
function বৃত্তি ২
fundamental মৌল ১, মূলগত ১

general সাধারণ ১, সাধারণিক
(particular বিশেষ)
genius প্রতিভা ১, প্রতিভাবান ১
genre জাত (বাংলা মতে উচ্চার্য)
genuine খাঁটি ১, প্রকৃত ২, জাত্য ২
-ness প্রকৃততা, ২, জাত্যতা ২

harmony স্বরসংগতি ৪
heart হৃদয় ১, হৃদয়বৃত্তি ১
heroic বীর্যাত্মক, দীপক
human মানবিক ১
humanity মানুষ ১, মানব ১, মানবিকতা ৪
humanism মনুষ্যধর্ম ৪
humanist মনুষ্যধর্মী
humour হাস্যরস ১
humorous হাস্যরসাত্মক ১
humourist হাস্যরসিক ১
hypocrite বকধার্মিক ১
hypothesis প্রকল্প ২, অনুমিতি ৫, উপপত্তি ৫, hypothetical প্রাকল্পিক

idea ভাব ১, ২; ideation ভাবনা ৫

ideal আদর্শ ১
idealism আদর্শবাদ ১, ভাবতন্ত্র ৩
idealist আদর্শবাদী ১, ভাবতন্ত্রী
idealistic আদর্শিক
idealized আদর্শায়িত
idealization আদর্শায়ণ, কল্পরূপ
identification একাত্মীকরণ ২, ভবন ২
idiom ইডিয়ম ১, দেশভাষা
idiomatic দেশলাক্ষণিক
idyll ইডিল, চৈতালি (রবীন্দ্রনাথের নাম-গ্রন্থ থেকে)
idyllic চৈতালিক
illusion অধ্যাস ২, প্রতিভাস ৫
illusory প্রাতিভাসিক (ঐ)
image চিত্রকল্প ৫
imagist চিত্রকল্পী ৫
imagination কল্পনা ১, কল্পনাশক্তি ১
imaginative কল্পনাপ্রবণ ১
imaginative literature রসসাহিত্য ১
immediate অব্যবহিত ২
immediacy অব্যবধান
impersonal নৈর্ব্যক্তিক ৪
incident ঘটনা ১
incidental প্রাসঙ্গিক ১, আনুষঙ্গিক ১
incompatible বিসংবাদী ৫
incongruous বিসংগত
inconsistent স্ববিবাদী (consistent স্বসংগত)
individual ব্যক্তি ১, বিণ প্রাতিস্বিক ২

individuality ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ১, প্রাতিস্বিকতা
individualism ব্যক্তিকতা, ব্যক্তিবাদ
inevitability অনিবার্যতা ১, অবশ্যম্ভাবিতা ১
'the inevitable word' শব্দাবশ্যম্ভব
influence প্রভাব ১, প্রতিপত্তি ২
innate সহজাত ১
inner আন্তর ২
insight অন্তর্দৃষ্টি ১, পরিজ্ঞান ২
inspiration অনুপ্রাণনা ১, -প্রেরণা ১
instinct সহজপ্রবৃত্তি ২
instinctive সাহজিক ২
insular দ্বৈপায়ন ৫
insularity দ্বৈপায়নতা
integrity অদ্বৈকল্য ৫, স্বধর্ম
integrated অবিকল ৫
intellect মনীষা ১
intellectual মনীষী, বিণ মননশীল মনস্কিয়
intellectuality মনীষিতা
intellectualism মনীষিকতা
intellection মনন ১, মনস্কিয়া
intelligence ধী ১, বুদ্ধি ১
intention অভিপ্রায় ১
intended অভিপ্রেত ১
intense নিবিড় ১
interest ঔৎসুক্য ৪, আদীপনা
interested আদীপিত

interesting ঔৎসুক্যকর ৪,
আদীপক
interpretation অন্তঃপ্রথন, অন্তরাখ্যান
interpreter অন্তঃপ্রথক, অন্তরাখ্যাতা
intrinsic স্বকীয় ২
introspection অন্তরায়ণ ৫,
অনুব্যবসা ৫
introspective অনুব্যবসায়ী ৫
introvert অন্তর্মুখ ৫
(extrovert বহির্মুখ ৫)
invention উদ্ভাবন ১, উদ্ভাবনীশক্তি
irony পরিহাস ১, ব্যাজোক্তি,
ছদ্মোক্তি, অজ্ঞানভাণ
irrelevant অবান্তর ১,
অপ্রাসঙ্গিক ১
(relevant অনুবন্ধী)
jargon পরিভূষণ, সন্ধাভাষা,
কিচিরমিচির
journalese দুর্ভাষা
journalistic খবুরেকাগুজে ৪
সাংবাদিকী
judgment রায় ১, বিচারবুদ্ধি
juvenilia কৈশোরিকা

kind জাতি (degree মাত্রা)
knowledge জ্ঞান ১

landscape ভূদৃশ্য
law বিধান

learning পাণ্ডিত্য ১, বিদ্যাবত্তা ১
legitimate বৈধ
level স্তর ১
line পংক্তি ১, লাইন ১
literature, letters সাহিত্য ১
literary সাহিত্যিক ১
the literary world সারস্বতসমাজ ৫,
সাহিত্যজগৎ ১, সাহিত্যক্ষেত্র ১
the literary profession
সাহিত্যবৃত্তি ৪, সাহিত্যব্যবসা ৪
man of letters সাহিত্যিক ১,
সারস্বত ৫, সাহিত্যসূরী ৫
folk literature লোকসাহিত্য ১
court literature সভাসাহিত্য,
দরবারি সাহিত্য
the republic of letters
সাহিত্যস্বারাজ্য
local স্থানীয়, পল্লীপ্রভব
local colour স্থানবর্ণিমা
locale ঘটনাস্থান
lyric গীতিকবিতা ১, গীতিকাব্য ১,
লিরিক ১
lyric বিণ, lyrical লিরিক ১,
গীতল
lyricism গীতলতা
lyric poet গীতিকবি ১

major মুখ্য (minor গৌণ)
major poet মুখ্য কবি, কবিপ্রধান
(minor poet গৌণ কবি)

manner ধরন ১, চাল ১
mannerism মুদ্রাদোষ ১
master সিদ্ধ ১, অধিকর্তা, প্রকামী
mastery সিদ্ধি ১, কর্তৃত্ব, প্রাকাম্য
masterly প্রাকামিক
the master সিদ্ধিদাতা
material উপাদান ১, উপকরণ ১
materialism জড়বাদ ১
materialist জড়বাদী ১
matter পদার্থ ১, বস্তু ১
mature রসঘন, পূর্ণপরিণত
maturity রসঘনতা, প্রৌঢ়ি
meaning অর্থ ১, মানে ১
inherent meaning শব্দার্থ ৩
adherent meaning কাব্যার্থ ৩
mediocre মাধ্যমিক ৫
mediocrity মাধ্যমিকতা
medium প্রণালী ৫, নিমিত্ত
melodrama মেলোড্রামা, অতিনাট্য,
নাট্যাতিশয়
melodramatic অতিনাটকীয়,
নাট্যাতিশয়িক
memoir স্মৃতিকথা ১
mentality মনোভাব ১, চিত্তবৃত্তি ৫
metaphor উৎপ্রেক্ষা ১
mixed metaphor সংকরালংকার ৩,
উপমাসংকর ৫
method পদ্ধতি ১
mind মন ১, মানস ১, চিত্ত ১
modern আধুনিক

morality নীতি ১, নীতিধর্ম ১
morals নীতিতন্ত্র
moralist নীতিবাগীশ ১,
নীতিবাদী, চাণক্য
immoral দুর্নৈতিক
amoral অনৈতিক
mutual পারস্পরিক ১, অন্যোন্য ৫
mystery রহস্য ১
mystic সহজিয়া, ব্রাত্য ; বিণ মিষ্টিক,
মরমী ৪
mysticism সহজসিদ্ধি
myth ইতিকথা ২, চিরমিথ্যা
mythology পুরাণ ১

naive বালসরল
narration আখ্যান, কথন, কহকতা
narrative আখ্যান, আখ্যায়িকা
narrative poem কথাকাব্য,
কাহিনীকবিতা
narrator আখ্যাতা, কহক
national স্বাজাতিক ৪
nature (physical) প্রকৃতি ১,
বিশ্বপ্রকৃতি ১, নিসর্গ ১, natural
প্রাকৃতিক ১, নৈসর্গিক ১
nature (human) স্বভাব ১
natural স্বাভাবিক ১
supernatural অলৌকিক ১,
অতিপ্রাকৃত
naturalism প্রকৃতিপন্থা, স্বভাবোক্তি ৫
naturalist প্রকৃতিপন্থী

negative নঞর্থক ৪, নেতিবাচক ১
(positive সদর্থক ৪)
'negative capability' নিরাশক্তি ৫,
নৈরাত্ম্যসিদ্ধি ৫
norm মূলরূপ
normal স্বভাবী ২, মূলরূপী
nonsense প্রলাপ ১
nonsense rhyme আবোলতাবোল
(সুকুমার রায়ের নাম-গ্রন্থ থেকে)
novel নভেল ১, উপন্যাস ১
novelist ঔপন্যাসিক ১, কথক ৫,
কথাশিল্পী
the popular novel গণকথন
—novelist গণকথক

object বিষয় ১, লক্ষ্য ১
objective বিষয়মুখ, বিষয়াশ্রিত ৫,
তন্ময় ৫
(subjective আত্মমুখ ২, মন্ময় ৫)
obscene অশ্লীল ১, অদৃষ্ট্য, অপ্রকাশ্য
obscure নিগূঢ়
observation পর্যবেক্ষণ ১, নিরীক্ষা ৫
occasional কাদাচিৎক ২,
কাদাচিক, ঔপলক্ষ্যিক
ode ওড, স্তব
origin উৎপত্তি ১
original মৌলিক ১, আদিম ১
the original sin আদিপাপ
originality মৌলিকতা ১,
অপূর্বতা ৪

outline পরিলেখ ২

paragraph অনুচ্ছেদ ১
verse paragraph পদ্যানুচ্ছেদ
paraphrase অনুলিখন
parody প্যারডি ১; ব্যঙ্গানুকৃতি
particular বিশেষ ১
(general সাধারণ ১)
passage অংশ ১
passion সংরাগ ৫, প্রমথন, পরাবেগ,
আবেগপ্রাবল্য
passionate সংরক্ত ৫, সংরাগী ৫,
প্রমাথী, পরাবেগী, আবেগপ্রবল
impassioned প্রমথাত্ম
'all passion spent' মন্বশেষ
passive নিষ্ক্রিয় ১, অকারী ৪
(active সক্রিয় ১, সকারী ৪)
pathos করুণরস ১, কানাড়া
pathetic করুণ ১
pathetic fallacy জীবজড়াভেদ
pattern রূপকল্প ৫; আকল্প
thought-pattern চিন্তাকল্প
pedant বিপণ্ডিত
pedantic বিপণ্ডিতী
pedantry বৈপাণ্ডিত্য
penultimate উপান্ত্য ১
perfect পরোৎকৃষ্ট ২, পূর্ণ ৫,
পরাৎপর ৫ (imperfect অপূর্ণ)
perfection পরোৎকর্ষ
personal ব্যক্তিগত ১, ব্যক্তিক
(impersonal নৈর্ব্যক্তিক ৪)

personality ব্যক্তিত্ব ১, ব্যক্তিস্বরূপ ৪
perspective পরিপ্রেক্ষিত ৪,
পরিপ্রেক্ষণিকা ৪
phase পর্যায় ১
phrase শব্দবন্ধ, (কবিতায়) কলি ১
picture চিত্র ১; pictorial চিত্রল
pictorial quality চিত্রলতা
pioneer প্রবর্তক ১, পথিকৃৎ ১,
নিয়ামক ৫
plagiarist কুম্ভিল ২, কুম্ভিলক ২
plagiarism কুম্ভিলকতা
plan পরিকল্পনা ১
plastic নম্য
the plastic arts নম্যকলা
platitude চর্বিতচর্বণ
platitudinous চর্বিতচার্বণিক
platonic প্লাতনিক
platonist প্লাতনী
platonism প্লাতনিকতা
platonic love নিষ্কাম প্রেম ১
plot প্লট ১, কল্প
plotcraft কল্পচাতুরী
poetry কবিতা ১, কবিত্ব ১,
কাব্য ১,
poetic কাব্যাত্ম
poetic diction পদ্যান্বয়, পদ্যশব্দ,
পদ্যাবদ্ধতা
poetic drama কাব্যনাট্য ১
(dramatic poem নাট্যকাব্য ১)
folk poetry ছড়া ১, লোকগাথা

point of view দৃষ্টিভঙ্গি ১
portrait প্রতিকৃতি ১
posterity মহাকাল ৪
pot-boiler হাঁড়িচড়ানে,
জীবিকাজাতক
practical ব্যবহারিক ২, কারয়িত্রী ৪
(theoretical ভাবয়িত্রী ৪)
precise যথার্থ ৫
precision যাথার্থ্য ৫
predecessor পূর্বসূরী ৫, ৯
(successor উত্তরসাধক)
premise প্রতিপাদ
major premise পূর্বপক্ষ ১,
minor premise উত্তরপক্ষ ১
pretentious ময়ূরপুচ্ছী
principle মূলসূত্র ১, তত্ত্ব ২
probable সম্ভাব্য
probability সম্ভাব্যতা
process প্রক্রিয়া ১
professional পেশাদার ১, নিত্যকর্মা
(amateur কচিৎকর্মা)
profound বহুস্তর, স্তরময়, সুদূরস্পর্শী
(superficial একস্তর, নিস্তর,
অদূরস্পর্শী)
projection অভিক্ষেপ ২
propaganda প্রপাগাণ্ডা ১, দুষ্প্রচার
propagandist দুষ্প্রচারী
propensity প্রবণতা ১
prophet ভাবিকথক ৫, প্রবক্তা ৫
prophecy ভাবিকথন

proportion অনুপাত ১, সমানুপাত
মাত্রায়ণ
proportionate আনুপাতিক ১,
সমানুপাতিক
well-proportioned সুষম
sense of proportion মাত্রাজ্ঞান ১
proposition প্রস্তাব ১, প্রতিজ্ঞা ২
prose গদ্য ১
prosaic গদ্য ১, কাঠখোট্টা ১,
শুষ্কং কাষ্ঠং ১
prose poem গদ্যকাব্য ১,
গদ্যকবিতা ১, কথিকা ১, লিপিকা
(রবীন্দ্রনাথের নাম-গ্রন্থ থেকে)
provincial প্রাদেশিক ১
public জনসাধারণ ১, গণ
the reading public গণপাঠক
pun শ্লেষ ১
punctuation যতিচিহ্ন ২,
বিরামচিহ্ন ৫
puritan শুচিবায়ুগ্রস্ত ১, অতিনৈতিক
puritanical অতিনৈতিক
puritanism অতিনৈতিকতা ২
purpose উদ্দেশ্য ১

quality গুণ ১
quantity পরিমাণ ১

range প্রসার ৫, ব্যাপ্তি
reaction প্রতিক্রিয়া ১
real বাস্তব ১
realist বস্তুবাদী, বস্তুতন্ত্রী
realistic বাস্তবিক
realism বাস্তবিকতা ৪, বস্তুতন্ত্র ৩, ৪,
বস্তুবাদ ৫
reason কারণ ১, যুক্তি ১
reasonable যুক্তিযুক্ত ১
(unreasonable অযৌক্তিক ১)
recreation বিনোদন ২
refined পরিমার্জিত ১, পরিশীলিত
refinement পরিশীলন
reflection প্রতিবিম্বন ৫
relief বিজ্ঞাতা, অপলাপ
comic relief হাস্যাপলাপ
religious (poetry, literature)
পারত্রিক, ভগবন্মুখী
religious poet ভক্তকবি
renascence পুনর্জীবন
renascent পুনর্জীবন্ত
the Renaissance রিনাসেন্স ১,
রেনেসাঁস ১
representation প্রতিচিত্রণ
representational arts
প্রতিবিম্বনশিল্প ৫
representative প্রতিভূ ১
response সাড়া ১
responsive সোত্তর
responsiveness সোত্তরতা
(irresponsive নিঃসাড় ১, নিরুত্তর)
retrospection অনুচিন্তা ২,
অনুচিন্তন ২

revision পরিমার্জনা ১; সংক্রিয়া
romance রহস্যবোধ, রহস্যোপাখ্যান
romantic, romanticist
রোমান্টিক ১, খেয়ালী ৫, আত্মপন্থী,
বিষয়ীপ্রধান
rhythm ছন্দ ১,
ছন্দঃস্পন্দ (প্রবোধচন্দ্র সেন)
prose rhythm গদ্যছন্দ ৪

sarcasm বিদ্রূপ ১, sarcastic
বিদ্রূপী
satire ব্যঙ্গরচনা ১
satirist ব্যঙ্গরসিক
satirical ব্যঙ্গ্য
school সম্প্রদায় ১
self-contradictory স্বতোবিরোধী ৪
sensation অনুভবন, প্রক্ষোভ,
হৈচৈ ১
sensational প্রক্ষোভী, হৈচৈয়িক
sensationalism হৈচৈতন্ত্র
sensibility বোধ
sensitive সংবেদী, সংবেদনশীল,
আশুচেতন ৫
sensitivity সংবেদনশীলতা
sensual ইন্দ্রিয়পরায়ণ ৫,
sensuous ইন্দ্রিয়ানুগত
sentence বাক্য ১
sentiment হৃদ্‌রস
sentimental ভাবালু ১, ভাববিলাসী ৪
sentimentality ভাবালুতা ১,
ভাববিলাস ৪
the sentimental novel
ভাবালুকথন
serial ধারাবাহিক ১, পরম্পরীণ ২
serious গম্ভীর ১, গুরু ১, গুরুতর ১
serious literature সৎসাহিত্য ৫
serious writer তন্মনা, তন্নিষ্ঠ লেখক
seriousness তন্নিষ্ঠা
'high seriousness' পরানিষ্ঠা
sequence পারম্পর্য ২
significance ব্যঞ্জনা ৩
significant অভিব্যঞ্জক
signification অভিব্যঞ্জন
sincerity আন্তরিকতা ১
simple সরল ১, স্বল্পাঙ্গ ৪
(complex জটিল ১, বহুলাঙ্গ ৪)
situation সংঘট
sketch নকশা ১, রেখাচিত্র ১
sketchy ঈষদঙ্কিত
skill নৈপুণ্য
slang অপভাষা ৪
social সামাজিক ১, লৌকিক ১
sonnet সনেট ১, চতুর্দশপদী ১
sophisticated বিদগ্ধ
sophistication বৈদগ্ধ্য
sophistry কুতর্ক
sound ধ্বনি ১
'sound fitting sense' ঔচিত্য ৩,
শব্দৌচিত্য
'sound and fury signifying
nothing' নির্ব্যঞ্জক নাদোন্মাদ
source উৎস ১, হেতুমূল
speculation দূরকল্পনা ২
speech কথা ১, (নাটক ইঃ-র)
পরোক্তি, (নিন্দায়) বক্তৃতা
speech rhythm কথ্যছন্দ
the spoken language কথ্যভাষা ১
spirit অন্তরাত্মা
spiritual আধ্যাত্মিক ১, আত্মিক
the stage রঙ্গমঞ্চ ১, স্টেজ ১
standard, standards পরাদর্শ
standardized প্রমীকৃত, প্রামাণ্য

standardization প্রমীকরণ
stanza স্তবক ১, শ্লোক ১
statement উক্তি
understatement অবোক্তি
still life জড়চিত্র
structure গড়ন ১, গঠন ১,
study অধ্যয়ন ১, সন্দর্ভ ১, সন্দর্শন
style রীতি ১, stylist রীতিদক্ষ
subject, subject matter বিষয় ১,
বিষয়বস্তু ১, বক্তব্য ১, বক্তব্যবিষয় ১,
subjective আত্মমুখ ২ মন্ময় ৫,
(objective বিষয়মুখ ২,
বিষয়াশ্রিত ৫, তন্ময় ৫)
substance সার ১
substitute প্রতিকল্প ২
substitution প্রতিকল্পন
suggestion ইঙ্গিত ১, দ্যোতনা ১
superficial পল্লবগ্রাহী ১, একস্তর,
নিস্তর, অদূরস্পর্শী
(profound বহুস্তর, স্তরময়,
সুদূরস্পর্শী)
surrealist অতিবাস্তব ৫
suspense উৎকণ্ঠা ৫, স্তম্ভন,
উৎপ্রতীক্ষা
symbol প্রতীক ১
symbolist প্রতীকী ৫
symbolism প্রতীকিতা, প্রতীকপন্থা
sympathy সমবেদনা ২, অনুকম্পা ৫
sympathetic অনুকম্পায়ী ৫
synonym প্রতিশব্দ ১, নামান্তর ১
synonymous সমার্থক
desynonymization
বিপ্রতিশব্দীকরণ
synthesis সংশ্লেষণ ১
(analysis বিশ্লেষণ ১)
system তন্ত্র ২

talent সহজশক্তি
talented writer জাতলেখক
taste রুচি
bad taste রুচিবিকার ১
tautology অনুলাপ ২
technique টেকনীক ১, টেকনিক ১
কলাকৌশল ১, প্রকরণ, উপায়ন
technical প্রাকরণিক, উপায়িক
technicality প্রাকরণিকতা
technician কলাকুলশলী
temper মেজাজ ১
temperament মতি
tempo লয় ১
temporary সাময়িক ১, অস্থায়ী ১,
তৎকালীন
'temporary suspension of
disbelief' তৎকালীন নাস্তিক্যলোপ
tendency ঝোঁক ১, উন্মুখতা ১
tension টান ২, অধিজ্যতা
texture বিন্যাস ১, বুনোন ১
the theatre রঙ্গমঞ্চ ১
theatrical নাটুকে ১
theory বাদ ১
theoretical ভাবয়িত্রী ৪
(practical কারয়িত্রী ৪)
thinker ভাবুক ১, মনস্বী ১, মন্তা
thought চিন্তা ১, মনন ১
thriller রোমাঞ্চিকা
time, Time কাল ১
the times চলতিকাল ৪
topic চলতিবিষয়, প্রসঙ্গ
topical প্রাসঙ্গিক, আদ্যতনিক
topicality আদ্যতনিকতা, তাৎকাল্য
tradition ঐতিহ্য ৫
traditional ঐতিহ্যপ্রভব ৫,
ঐতিহ্যগত, ঐতিহ্যিক

tragedy ট্রাজেডি ১, শোকান্তিকা
tragic ট্রাজিক ১, শোকান্তিক,
শোকাত্ম
transcendental লোকোত্তর ৩,
তুরীয় ২
transformation রূপান্তর ১, রূপান্তরণ
travesty লঘীকরণ ৫
truth সত্য ১
'beauty is truth,
truth beauty' সত্যশ্রীলতা
type টাইপ ১, জাতিরূপ ২
typical জাতিরূপী, জাতিরূপাত্মক,
লাক্ষণিক

ultimate অন্ত্য
unique অদ্বিতীয় ১, একান্ত, আনন্যিক
unity ঐক্য ১
universe বিশ্ব ১
universal সার্বিক ২, সার্বভৌম ৫,
বিশ্বস্তর ৫, বিশ্বগত, বৈশ্বিক
urban নাগরিক ১
suburban উপনাগরিক
use উপযোগ
usual সাচারাচরিক
(unusual আঘটনিক
the unusual অঘটন)
utopia রামরাজ্য ২
utopian রামরাজ্যিক, রামরাজ্যবাদী

valid স্বীকার্য, মান্য
validity স্বীকার্যতা, মান্যতা
vague অস্পষ্ট
verisimilitude প্রকৃতৌচিত্য ৩,
বাস্তবসদৃশতা
verse পদ্য ১, কবিতা ১
versification পদ্যীকরণ
versifier পদ্যকার
free verse মুক্তছন্দ ৪,
মুক্তক (প্রবোধচন্দ্র সেন)
light verse হালকাকবিতা ১,
লঘুপদ্য, রুচিরা
virtuoso গুণী ১, ওস্তাদ ১, প্রদক্ষ
virtuosity ওস্তাদি ১, প্রদক্ষতা
vision পরাদৃষ্টি
visualizer দৃষ্টিচিত্রক
visualization দৃষ্টিচিত্রণ
vitality প্রাণশক্তি ১, জীবনীশক্তি ১
life force প্রাণনশক্তি ৪
vulgar ঐতরিক, ঐতরেয়
vulgarity ঐতরিকতা
vulgarism ঐতরেয়তা

weltanschauung জীবনদর্শন ১,
বিশ্ববীক্ষা
wit বৈদগ্ধ্য, বিদগ্ধক ; witty প্রহাসক
whim খামখেয়াল ১, whimsical
খামখেয়ালি ১
word শব্দ ; word magic শব্দজাদু
'poetry is written with words'
কাব্য শব্দোপায়ী
wisdom প্রজ্ঞা ১

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

একাদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট
৩৲

দ্বাদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট
৪৲

ত্রয়োদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট
৪৲

একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট একসঙ্গে—৫৲

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট একসঙ্গে—৮৲

নজরুল সংখ্যা—১৲
মাত্র কয়েক কপি অবশিষ্ট আছে

দশম বর্ষের সম্পূর্ণ সেট
(নজরুল সংখ্যা এর অন্তর্গত)
৩৲
মাত্র কয়েক সেট অবশিষ্ট আছে

চার বছরের সম্পূর্ণ সেট একসঙ্গে
১০৲
[মাশুল স্বতন্ত্র]

প্রতিভা বসু

উপন্যাস

সেতুবন্ধ
২॥০

মনোলীনা
২॥০

ছোটোগল্প

সুমিত্রার অপমৃত্যু
৪৲

বিচিত্র হৃদয়
২৲

সুদৃশ্য, সরস, উপভোগ্য
চারখানা বই

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

কবিতা

চতুর্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] পৌষ ১৩৫৫ [ক্রমিক সংখ্যা ৬০

এজরা পাউণ্ড

"কবিতা"র দরবারে পত্রাঘাত

অমিয় চক্রবর্তী

এক

হাওয়ায় ছড়ানো রাঙা, উজ্জ্বল লাল রাঙা, তামার সঙ্গে হলদে আর সবুজ ডোরা-কাটা পাতা, ঝরা পাতা, লক্ষ লক্ষ ঝরা পাতা বাগানে, পথের দুপাশে, বাড়ির দরজা পর্যন্ত পুরু হয়ে আছে। হেমন্তের অজস্রতায় আকাশ পর্যন্ত অন্তিম সোনালি বনবাষ্প, চোখে ঘোর আনে, তার মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রকৃতির অবিশ্বাস্য রক্তিম কখনো শব্দহীন, কখনো উদাসীন অস্ফুট ঝিরিঝিরি দুপুরের পথে কড়া পাহারা-ঘেরা আরোগ্যভবনের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলাম। তার পর অনেক লোহার দরজা, কাচের দরজা, ঘুরোনো সিঁড়ি, বইয়ে সই করা, মনের ডাক্তারকে বোঝানো, মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ যেন অন্যজগৎবাসী এমন চোখের-ভাব মানুষ দুএকজনকে হঠাৎ যেতে দেখা, কেউ ব'সে আছে শেষ-সময় তার অর্থহীন অপেক্ষায় বহন ক'রে, কারো মুখে কান্না পাথর হয়ে গেছে, এখন আর ভাষা নেই, কেবল আঙুল ঘোরাচ্ছে—এই প্রত্যন্ত বিরূপ প্রাণধারণের একটি ঘরে এজরা পাউণ্ড দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। খুব সমাদরে করমর্দন ক'রে মস্ত জনসাধারণের বসবার ঘরটার কোণায় জানলার কাছে বসালেন। বাহিরে ক্রমাগতই হেমন্ত ঝরছে, সোনার মেঘ, কিন্তু "বসন্তের এই চরম

ইতিহাসে"র সঙ্গে আবদ্ধ কবির সাদৃশ্যই মনে আনলাম—সেই প্রকাণ্ড পাতাঝরা মুক্ত সমারোহে নেমে গিয়ে যোগ দেওয়ার উপায় তাঁর নেই।

দুই

মনোভবনের নাম-সহর এখনো এই চিঠিতে অলিখিত রইলো। কেবল অদ্ভুত কবির আরো অনেক বেশি অন্যায় অদ্ভুত সামাজিক অবস্থানের ভূমিকাটুকু দিতে চাই। রাশি রাশি বর্ণঝরা হলদে পাতার ভূমিকার সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটি অবসানপর্বের রহস্যে রঙীন উত্তেজন চিত্র। এইটুকু শুধু বলবার অনুমতি আছে যে মুসোলিনির প্রেত-পর্যায়ের শেষ দিকে যখন সমুদ্র-পারের দৈত্য-আক্রমণে ইটালি ভেঙে পড়ল, এজরা পাউণ্ড তখনো রাপালো সহরেই ছিলেন। জর্মানরা তাঁর ত্রিশ-বছর-বাসিত সমুদ্রের ধারের বাড়িটা দখল করে নি, যদিও সর্বত্র তাদেরই উগ্র প্রতাপ; ইতিমধ্যে তাঁর স্বদেশীয় "মিত্র"বাহিনী এসে সমস্ত রাপালো ঘিরে ফেলল এবং শত্রুপক্ষের তিনি সমর্থক এই চরম অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। বহুকাল কারো জানবার উপায় ছিল না তিনি জীবিত কি নিহত। চতুর্দিকে বিপ্লব, গুলি বারুদ, সৈন্যবাহিনী। মধ্যযুগীয় নরকের আধুনিক সংস্করণ লেখবার দান্তে আজ নেই, থাকলেও পৃথিবী-জোড়া হন্তারক পর্বের বর্ণনা লিখতে তাঁকে অন্য কোনো গ্রহে প্রবাসী হ'য়ে বিজয়ের ভিন্ন পথ দেখাতে হত। কালো কাহিনী চাপা থাক্। কেবল এই কথাও জানা চাই যে যে-অভিযোগে আরো অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এবং অন্য পক্ষের নীতি অনুসারে ঘাতক একটুও দেরি করত না তার থেকে পাউণ্ডকে বাঁচানো হয়। অপরাধী তার মনের দিক থেকে সুস্থ বা নয় এইটুকু সংশয়ের স্থানরক্ষা দ্বারা মিত্র সামরিকের খানিকটা কৃপা প্রকাশ হ'ল বই কি। পিসা সহরের বন্দী-খাঁচায়, ঘরে নয়, পাউণ্ড

তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই Pisan Cantos লেখেন। দৈবক্রমে গরাদের ধারেই মাটি, সেখানে পিঁপড়ের সারি মুক্ত হ'য়ে ঘুরছে, উপরে মেঘ, দূরে রাস্তা, রাত্রের অসহ্য সহস্রশক্তি বিদ্যুৎচক্ষু [১] পেরিয়েও নীলাভ আকাশ। সমস্তক্ষণ শস্ত্র, শিকল, লোহার চাকা এবং লৌহ-পদ-ক্ষেপে ছিন্ন হাওয়ার চীৎকার, তবু কানে ছুটো চারটে ধ্বনি আসে যা বর্মহীন সাধারণ মানুষের, যারা ফল রুটি বিক্রি করতে বা ধোপার কাজে বাহিরের পৃথিবীর প্রতীক তাদের কথাবার্তা শোনা যায়। জটিল মস্তিষ্কের রচিত কঠিন রচনার ফাটলে এইসব সাধারণতার সুর নিয়েই Pisan Cantos-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ [২]। মধ্যে মধ্যে বেদনা অন্ধকার ক'রে আসে, আবদ্ধের প্রতিকারহীন দিগন্তে অস্তিত্বের ছায়া বিলীয়মান—

...the phantom mountain above the cloud
But in the caged panther's eyes :

"Nothing. Nothing that you can do..."

---

(১) the excess electric illumination
(is now focussed).....(p. 43, *Pisan Cantos*)

(২) that stone angle all of his scenery (p. 6, 61, *Pisan Cantos*)

কিন্তু পৃথিবীর মাটি পার্শ্ববর্তী। তাই কবিতার ইঙ্গিতে এই প্রশ্ন দেখা দিল—

Is there a sound in the forest
of pard or of bassarid
or crotale or of leaves moving?

Cythera, here are lynxes
Will the scrub-oak burst into flower?
There is a rose vine in this underbrush
Red? white? No, but a colour between them
When the pomegranate is open and the light falls
half thru it . . . (p. 68)

যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর হাওয়া আলো এসে পৌঁচচ্ছে; স্মৃতির উজ্জ্বলতরতায় লাল গোলাপের লাল আরো স্পষ্ট তুলিতে রঙীন, দেখাচ্ছে যেন ডালিমের দানার মধ্য দিয়ে আলো ভিতরের দিক থেকে রক্তিম। Pound-এর Cantos রূপের নেশায় ভরা; ছোটো ছোটো গীতিকাব্যের মুক্তো ছড়ানো।

green pool, under green of the jungle,
caged : "Nothing, nothing that you can do."

* * * your eyes are like clouds

Nor can he who has passed a month in the death cells
believe in capital punishment
No man who has passed a month in the death cells
believes in cages for beasts

* * * your eyes are like clouds over Taishan
When some of the rain has fallen
and half remains yet to fall (p. 108)

ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু অসমাপ্ত বেদনার পরপারে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দূরান্তরীন কবি দেখতে পান—

The roots go down to the river's edge
and the hidden city moves upward
white ivory under the bark (p. 108)

দৃশ্যের ওপারে প্রকাণ্ড সাদা সহর। তারপরে রাত্রির পাহাড়।

* * * *

and now the new moon faces Taishan
one must count by the dawn star
Dryad, thy peace is like water (p. 108)

রাত্রি কেটে যায়। পুনর্বার সকালের রোদে পৃথিবীর মুক্ত প্রাণচ্ছবি।

And now the ants seem to stagger
as the dawn sun has trapped their shadows,
this breath wholly covers the mountains
it shines and divides
it nourishes by its rectitude
does no injury
overstanding the earth it fills the nine fields
to heaven (p. 109)

মাটির জগতে সূর্যের করোজ্জ্বল দানে তো অবিচার নেই। কেননা

সমতার নিয়মে সৃষ্টিলোক চলেছে, সেখানে অমোঘ নিয়ন্ত্রণের প্রতীক সূর্য।

Boon companion to equity
it joins with the process
lacking it, there is inanition

* * *

If deeds be not ensheaved and garnered in the heart
there is inanition

* * *

the sun as a golden eye
between dark cloud and the mountain (p. 109)

দেখতে দেখতে বন্দীশিল্পীর দৃষ্টি সমস্ত যা-কিছুর সঙ্গে ছবিতে এক হয়ে যায়। সেই ছবিতেই মুক্তি।[৩]

(৩) Pisan Cantos ছবিতে ভরা :

(ক) morning moon against sunrise
like a bit of the best antient greek coinage (p. 113)

* * * *

(খ) And the sun high over horizon hidden in cloud bark
lit saffron the cloud ridge
dove sta memora

* * * * * * * *

. . . . . Primavera
in the timeless air . . . . (p. 30)

(গ) the olives grey over grey holding walls
and their leaves turn under Scirocco . . . . (p. 31)

(ঘ) corn flower, thistle and sword-flower
to a half metre grass growth,
lay on the cliff's edge

* * * * * *

to Helia the long meadow with poplars

* * * * * *

the mountain and shut garden of pear trees in flower
here rested. (p. 36)

মধ্যধরণীসাগরবেষ্টিত দক্ষিণ য়ুরোপের পথ ঘাট দৃশ্য, বিশেষ করে ইটালির, এই- কবিতায় চিত্রময়। দক্ষিণ ফ্রান্সের ছবিও মনকে মুগ্ধ করে।

When the mind swings by a grass-blade
an ant's forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower (p. 111)

Shall save you—তা না হলে তিনি বাঁচতেন না, অথবা ধ্বংস হয়ে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু যদিও কড়া শাসনে দিনের পর দিন আসে—

Withdrawn sword as at Nemi
day comes after day (p. 45)

তবু পৃথিবীর ভাণ্ডার বন্ধ হয় না। হঠাৎ প্রজাপতি ঘরে ঢোকে, বেরিয়ে যায়,[৪] অনেক অন্যায়ের প্রতিকার মনে হয় তার পাখার ছন্দে, রঙে; সূর্যাস্তের মেঘ পাহাড় মনে হয় স্বর্গলোকের;[৫] যার পক্ষে "a day as a thousand years" (p. 9) তারও কাছে ইটালীয় বসুন্ধরা সাদা রাস্তায় প্রাণপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে থাকে[৬]। যখন মন ভেঙে পড়ছে তখন "a lizard upheld me"—তাঁকে স্থির ক'রে দেয় বিশ্বের প্রাণ; ঝিনুকের মধ্যে সবুজ আলো, পুণ্য চাষের ক্ষেত্রে লাঙলের দাগ, পশমের গুটিপোকা তাঁর কাছে অত্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে।[৭] এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য তিনি কবিতায়

(৪) That butterfly has gone out thru my smoke hole (p. 39)

(৫) as a corona of angels
one day were clouds banked on Taishan
or in glory of sunset (p. 8)

(৬) and there was a smell of mint under the tent flaps
especially after the rain
and a white ox on the road toward Pisa
as if facing the tower,
dark sheep in the drill field and on wet days were clouds
in the mountain as if under the guard roosts.
A lizard upheld me . . . (p. 6)

(৭) . whose prayers,
the great scarab is bowed at the altar
the green light gleams in his shell
plowed in the sacred field and unwound the silk worms early
in tensile . . . (pp. 6-7)

একত্র স্পষ্ট বলেন নি, পাথরের নুড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এলোমেলো মনোময় ছন্দের তলে-তলে তা প্রত্যক্ষ দেখা শক্ত নয়। ছবির সঙ্গে গাঁথা হয়ে তাঁর মনের অব্যবহিত ধারণা প্রকাশ পায়, প্রকাশ্য ধার্মিকতার প্রয়োজন হয় না;—

without a painted paradise at the end of it
the dwarf morning-glory twines round the grass blade (p.14)

যারা নিতান্ত মানচিত্রময় নির্ধারিত স্বর্গ চায় তাদের ভাষা তাঁর কাছে তাই দুর্বোধ্য—

I don't know how humanity stands it
with a painted paradise at the end of it (p. 14)

এ-সব কথা হাস্যময়, নিগূঢ়, যারা বোঝে না তাদের বোঝানোর উপায় নেই। কিন্তু Pisan Cantos-এর লেখক জানেন যে যারা বন্দী, যারা দাসের সঙ্গে দাসত্বের সাহচর্যে বর্বরতার দিকে চালিত, তারাও চিরন্তন সত্য প্রকৃতির সঙ্গতায় বিধৃত, তারা কখনো একাকী নয়,[৮] তাদেরও অন্তরে মুক্ত হতে বাধা নেই। কেননা বন্ধন নিজের মনের বন্দী দশায়, সেখানে আলো প্রজ্জ্বলিত হলে বোঝা যায়

Sunt lumina
that the drama is wholly subjective
stone knowing the form which the carver imparts it
the stone knows the form (p. 8)

আত্মসৃষ্টির রহস্য এই শিল্পীর অজ্ঞাত নয়। ধ্বংসের রহস্যও

(৮) a man on whom the sun has gone down
and the wind came as hamadryads under the sun-beat
Vai soli
are never alone
amid the slaves learning slavery
and the dull driven back toward the jungle . . . (p. 9).

নিজের মধ্যে তিনি জানেন[৯], দোষ দেওয়া চলে না। বাহিরে সম্পূর্ণ আশ্চর্য এই যে অত্যন্ত খেয়ালী অদ্ভুত বিচিত্রমানস, এমন কি উদ্‌ভ্রান্ত কবি এই সব কথা বলতে পারলেন, যদিও তাঁর রচনার স্বেচ্ছাকৃত গোলক-ধাঁধাঁয়—অনেকটা তার কারণ আত্মবিনয়—অনেক পাঠকের লক্ষ্য স'রে যাবে। য়ুরোপে এবং আমেরিকায় যে এজরা পাউণ্ডের এ-সব কথা আজকাল অনেকে ধরতেই পারে না তা আশ্চর্য নয়। হয়তো বুঝতে চায়ও না। কেননা সাদা চোখের দৃষ্টিতে, হোক না তা অর্ধ-পাগল বা নির্লজ্জ শিশুভাবের দৃষ্টি, সংসারের অনেকখানি আবছায়া অপচ্ছায়া ধরা প'ড়ে যায়, সভ্যতার পক্ষে সেই নিরাবৃতা সহ্য করা শক্ত।

Ezra Pound-এর Pisan Cantos সম্বন্ধে এই কথা বলা প্রয়োজন যে আধুনিক হিংস্র পক্ষ-প্রতিপক্ষের সাম্রাজ্য, জাতি বা সম্প্রদায় যত বৃহৎ কপট সাধুনামেই আপন নরঘাতবৃত্তি ঢাকুক না কেন, তিনি তাতে ভোলেন নি। তাঁর দুঃখে শোধিত দৃষ্টিতে যুদ্ধ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, যদিও তার পূরো হিসাব এখনো অঙ্কের অতীত—

we have not yet calculated the sum
gorilla + bayonet
(p. 23)

কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে,

woe to them that conquer with armies
and whose only right is their power. (p. 41)

তাই ধুয়োর মতো তাঁর সৈন্যপরিবৃত বন্দীদশার কাব্যে বারবার ধ্বনিত হয়েছে—

there are no righteous wars in "The Spring and Autumn"
(p. 103)

(৯) a man on whom the sun has gone down
nor shall diamond die in the avalanche
be it torn from its setting
first must destroy himself ere others destroy him. (p. 8)

In the spring and autumn
In "The Spring and Autumn"
there
are
no
righteous
wars (p. 61)

য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরেও যে মানুষ বেঁচে আছে তার এই দৃশ্য :

As a lone ant from a broken ant-hill
from the wreckage of Europa, ego scriptor. (p. 36)

প্রশ্ন উঠতে পারে Pisan Cantos-এর বক্তব্য কী? বলা ছাড়া কবিতার বক্তব্য নেই এইটেই বড়ো কথা, কিন্তু বিশেষ কোনো ভাবনা যা শিল্পের উপকরণ এবং অঙ্গীকৃত তাকেও পৃথক দেখা সম্ভব : সেদিক থেকেই পূর্বের বিশ্লেষণ করেছি। আত্ম-ক্রুদ্ধ সমাজ ধনের অসমতায়, জাতি-বিদ্বেষে যন্ত্রে-বাঁধা কুশ্রীতার চরম দুর্যোগে উপস্থিত হয়েছে, এই নিয়ে বন্দী শিল্পীর আক্রমণ, কিন্তু মানুষের স্ববিরোধিতার হিংস্র পর্ব হতে মুক্তির নির্দেশ তাঁর পক্ষে শিল্পের পথেই নির্দিষ্ট, অন্য প্রতিকারের ইঙ্গিত থাকলেও তা উপস্থিত আলোচনার বহির্গত। কনফ্যুসিয়ান নীতি অনুসারে সভ্যতার পুনর্গঠন এজরা পাউণ্ডের বহুকালের ঈপ্সিত বিশ্বাস, বিশেষ ক'রে খাজনা দেওয়া এবং আধুনিক ধনতন্ত্রের উপর তাঁর আক্রোশ—বস্তুত অর্থনীতির তত্ত্ব এবং দৃষ্টান্তে বেশির ভাগ Cantos জর্জর ভারাক্রান্ত।[১০] নিশ্চয় তারও সূক্ষ্ম তারতম্য

(১০) অনেকেই কবির প্রথম লাইনে কবির সঙ্গে স্বস্তি অনুভব করবেন ; পরের পদগুলিতে নানা তথ্য ও তত্ত্বের মিশোল আছে ;—

Oh to be in England now that Winston's out
Now that there's room for doubt
And the bank may be the nation's
And the long years of patience
And labour's vacillations
May have let the bacon come home, (p. 92)

"may be" কথাটা লক্ষ্যণীয়। এ-সব বিষয় ব্যাপারে পাউণ্ডের উত্তেজনা তীব্র এবং নানা

বিচার প্রয়োজন, কিন্তু শিল্পের মধ্যেই যে উত্তর নিহিত আমার কাছে তারই মূল্য চরম। কেননা দৃষ্টির যে-স্বচ্ছতায় সত্য আপনি বিচারিত এবং প্রকাশিত, তার শিল্প শুধু সাহিত্যে নয় সমস্ত সভ্যতার উৎকর্ষে ক্রিয়াশীল। সেইখানেই সন্ধান।

Under white cloud, cielo di Pisa
out of all this beauty something must come, (p. 117)

অনুভূতিই উত্তর; বাহিরের শুভ্রা প্রকৃতিও মেঘে, শান্ত গাছের ছন্দে, সমধর্মিতার অপেক্ষা মেলে আছে। শিল্পের আলোক এখানে অবাধে সঞ্চারিত,

for those trees are Elysium
for serenity
under Abélard's bridges
for those trees are serenity (p. 90)

পুরোনো আঁকা ছবির প্রসঙ্গে Cantos-এ এই শান্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে; অন্যত্র বলছেন—

in the stillness outlasting all wars (p. 5)

সেই নিবিষ্ট মৌনই তাঁর কেন্দ্র।

"OMNIA"
all things that are are lights (p. 7)

* * *

To study with the white wings of time passing
is not that our delight (p. 15)

অতিনির্দিষ্ট মতামতের উদ্ভত ইতিহাসে জটিল; সাধারণের পক্ষে কবিতায় তাঁর বক্তব্য নির্ধারণ করা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এসব কথা বোঝা কঠিন নয়—

to look at the fields; are they tilled?
is the old terrace alive as it might be
with a whole colony
if money be free again? (p. 92)

Pisan Cantos-এও পুরোনো চীন ধন-নীতি, কর বা শুল্ক আদায়, Griselle বা Douglas-এর অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে মধ্যযুগের ইতালীয় এবং বর্তমান মনুষ্যসমাজের অবশ্যম্ভাবী যোগ, John Adams-এর স্তুতি, ইতিহাস পুরাণ কিংবদন্তী জনশ্রুতি, স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় প্রাপ্ত অগোধ্য বা অর্ধবোধগম্য নানা উল্লেখের কাণ্ডকারখানা আছে।

যে-মানুষের মৃত্যুধৌত দৃষ্টি বারবার চরম মুহূর্ত স্পর্শ ক'রে খুলে গেছে

...sinceritas
from the death cells in sight of Mt. Taishan @ Pisa
as Fujiyama at Gardone (p. 5)

তার শিল্প নিয়তই স্বচ্ছতায় পর্যবসিত।[১১] তখন সে বলতে পারে

what whiteness will you add to this whiteness
what candor ? (p. 3)

Pisan Cantos-এ সাযুজ্যের শুভ্র একদৃষ্টি—যাকে শিল্পযোগ বলা যায়—তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণানেকোন্-এর দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সেই কেবলমাত্র অস্তিতার শিল্প এজরা পাউণ্ড দেখাতে পেরেছেন, মনে হয় যা দেখছি তার সঙ্গে দৃষ্টির বাধা নেই—

(ক) What you depart from is not the way
and olive tree blown white in the wind (p. 3)

(খ) till the shrine be again white with marble
till the stone eyes look again seaward
(গ্রীক দেবমূর্তির কথা বলা হচ্ছে)

The wind is part of the process
The rain is part of the process
and the Pleiades set in her mirror
Kuanon, this stone bringeth sleep ...[১২] (p. 13)

---

(১১) Hast 'ou seen the rose in the steel dust
(or swansdown ever?)
so light is the urging, so ordered the dark petals of iron
we who have passed over Lethe. (p. 27)

লক্ষ্যণীয়: "we who have passed over Lethe."

(১২) Pisa-র বন্দীশালায় নিদ্রাহীন মন পাথরের স্পর্শে শান্তি পেয়েছে, নানা স্থানে তার উল্লেখ আছে, কখনো গাছের মর্মর শোনা যায়; যদিও অবান্তর ভাবে বলার ভঙ্গি—

(ক) for this stone giveth sleep
staria senza più scossa
and eucalyptus that is for memory (p. 13)

সেখানে সময় পৌঁছয় না—

(ক) no vestige save in the air
in stone is no imprint and the grey walls of no era
under the olives (p. 16)

(খ) as grape flesh and sea wave
undying luminous and translucent [১৩] (p. 10)

(গ) autumnal heavens *sha-o* (চীন উল্লেখ)
with the sun under its melody
to the compassionate heavens (p. 18)

(ঘ) ...in the soft air (গ্রীক উল্লেখ)
with the mast held by the left hand
in this air as of Kuanon
enigma forgetting the times and seasons
but this air brought her ashore a la marina
with the great shell borne on seawaves[১৪] (p. 21)

(ঙ) (পূর্বে দ্রষ্টব্য)...Primavera
in the timeless air (p. 30)

Pisan Cantos সম্প্রতি পেয়েছি, পড়তে পড়তে সেদিন অনেক রাত হ'য়ে গেল। পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করবার আগে

(খ) Her bed-posts are of sapphire
for this stone giveth sleep (p. 37)

(১৩-১৪) আরো দৃষ্টান্ত :
This Goddess was born of sea-foam
She is lighter than air under Hesperus
* * * *
a petal lighter than sea-foam (p. 70)

এখানে আরেকটি সদৃশ সুন্দর লিরিকের মতো টুক্‌রো উদ্ধৃত না-ক'রে পারছি না—
This fruit has a fire within it,
Pomona, Pomona,
No glass is clearer than are the globes of this flame
what sea is clearer than the pomegranate body
holding the flame?
Pomona, Pomona. (p. 68)

মনকে ডুবিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, দেখি অনেক জায়গায় কবিতা অতি গভীর। তাঁর আধুনিক জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় এই কাব্য বোঝা সহজতর হবে, তাই দুইয়ে মিশিয়ে কিছু নমুনা দিলাম ;— সমস্ত রচনা নানাভাবে প্রশস্ততর বিবিধ বিষয়াক্রান্ত। এর মধ্যে Yeats-এর কথা বহুবার আছে, রবীন্দ্রনাথের বাক্যের উল্লেখ এবং কবীরের নাম এক জায়গায়, আর্ট, শিল্প, বাণিজ্য, বহু লোকজন, দেশ বিদেশের ছিন্ন ইতিহাসের অসংলগ্ন সঙ্গতায় ভরা স্মৃতি ও খেয়ালে মেশা ব্যক্তিগত যাতায়াতের চিহ্ন। কিন্তু পড়তে গিয়ে হঠাৎ মন চমকে ওঠে, কোথায় যেন দরদের হাওয়া দেয়, ছবির মাধুর্যে থেমে যেতে হয়। শিল্পদৃষ্টির যাথার্থ্য, যা সর্বমেবাবিশন্তি, তার উদাহরণ কিছু দিয়েছি, কিন্তু সেই চোখের ধ্যানের মূল কোথায়। সেটাও এই কাব্যে গোপন নেই যদিও সকল নিয়ম ও চিহ্ন অনুযায়ী Pisan Cantos ঘোর আধুনিক। মূল কথা বলার লজ্জা তাঁর ঘুচেছে, বোধ হয় এইটেই শেষতম আধুনিকতার লক্ষণ। বন্দী কবি জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, ধারিণী ধরিত্রীর বৃক্ষলোক আলো ও অন্ধকার মণ্ডলের খুব কাছে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে এই জীবন ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ, এর শিকড় খুঁজতে অভিজ্ঞতার ভিড়ে নামলে চলে না ; যেখানে চিন্ময়তা, শিল্পের ভাষায় ভালো লাগা, সেইখানে ফিরলেই দরজা খুলে যায়। বাহিরের দরজায় বারবার মাথা ঠুকে লেখক নম্র সুরে—কতখানি সুরের বদল—দ্বিধাহীন নম্র সুরে বলছেন—

filial, fraternal affection is the root of humaneness
the root of the process
nor are elaborate speeches and slick alacrity. (p. 15)

বলছেন,

to have friends come from far countries
is not that pleasure
nor to care that we are untrumpeted ? (p. 15)

অত্যন্ত যুদ্ধং-দেহি-আধুনিক, যিনি শিল্পের প্রাচীন ভাবভঙ্গীর গাম্ভীর্য এবং কলাবিদ্যার দস্তুররীতি লঙ্ঘনে সিদ্ধহস্ত, যাঁকে চতুর্দিক থেকে সংঘবদ্ধ আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে, অথচ পশ্চিম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যাঁর অনুকরণ করেছেন, তাঁর কলমে এই স্নিগ্ধতা অনেকের কাছে নতুন ঠেকবে। কিন্তু যারা পাউণ্ডের যথার্থ পাঠক তারা জানে প্রথম হতেই নিজের সম্বন্ধে এঁর আশ্চর্য মৃদুতা এবং সলজ্জ ভাব প্রকাশ পেয়েছে—তাতে অবশ্য মত নিয়ে মহাতর্কে একটুও বাধেনি [১৫]। কবি য়েটস তাঁর "A Packet for Ezra Pound"-এ যা লিখেছেন তাতেও আভাস পাওয়া যায়। য়েটস একটি কবিতায় জনাথান সুইফট্-এর "fanatic heart"-এর কথা বলেছেন, অত্যন্ত দরদী হৃদয়, অথচ কারো প্রতি কারো একটুও অন্যায় বা মতামতের যথার্থ কিম্বা কল্পিত অন্যায় সহ্য করতে না পেরে যে-রকম একরোখা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, Poundও সেই বিশেষ শ্রেণীর দরদী। এই বইয়ে পাউণ্ড যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে আরো সহজ ও নিবিড় হৃদ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

nothing matters but the quality
of the affection—
in the end—that has carved the trace in the mind
dove sta memoria (p. 35)

এই ভাষা একটু অন্য ; পূর্বেকার Cantoগুলি হতে দ্রুততর গভীর লক্ষ্যভেদী, লক্ষ্য ফিরে এসেছে নিজের দিকে।

"Missing the bull's eye seeks the cause in himself" (p. 46)

জনাথান সুইফট-এর ক্বচিৎ পত্রে যে-সুর পাওয়া যায়, যা অন্য

(১৫) আধুনিক এক সমালোচক লিখছেন, "He has always been, as Eliot has recently said, quite unassuming about his own poetry; his arrogance has sprung mainly from his zeal for artistic creation, wherever it is found. That almost impersonal zeal . . ."—*Louis L. Martz*

তাঁর রচনায় নানা আওয়াজে চাপা পড়েছে, Pisan Cantosএ সেই সুরই মূল ধুয়ো।

What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lov'st well shall not be reft from thee
What thou lov'st well is thy true heritage
Whose world, of mine or theirs
or is it of none? (p. 98-99)

কেবল মানুষের তৈরি পৃথিবীতে থামলে পৌঁছনো যায় না, প্রাণের সর্বাসীন স্তরে শিল্পীকে আসতে হয়, পূর্ণতর দৃষ্টি সেইখানে। তাই পাউণ্ড লিখেছেন,

What thou lovest well is they true heritage

The ant's a centaur in his dragon world.
Pull down thy vanity, it is not man
Made courage, or made order, or made grace,
Pull down thy vanity, I say pull down.
Learn of the green world what can be thy place...(p. 99)

যাকে অন্য পরিভাষায় আধ্যাত্মিক বলা হয়—শিল্পের আপন শব্দাবলী ভিন্ন, এবং দুইয়ে মিশিয়ে লাভ নেই—তার কারুভাষা এই পর্যন্ত। এর থেকে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এর ইঙ্গিত কেবল স্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে চুপ ক'রে থাকা নয়, কেননা যখন দেখা যায় তখন চলাও সোজা হয়। বলা বাহুল্য চলা একরকম নয়। মানুষের সৃষ্টির চলা কী এবং কত রকম সে-তর্ক এখানে তুলব না।

But to have done instead of not doing
this is not vanity
To have, with decency, knocked

* * *

To have gathered from the air a live tradition
or from a fine old eye the unconquered flame
This is not vanity. (pp. 99-100)

শিল্পেরও কয়েকটি আশ্চর্য সংজ্ঞা পাওয়া গেল। বোঝা যায় এজরা পাউণ্ডের তুলির জোরও একটুমাত্র কমে নি। তাঁর নিজেরই ভাষায় (অন্যের সম্বন্ধে) "the old hand as stylist still holds its cunning" (p. 56)। যে-অবস্থায় এই কবিতা লেখা তা কল্পনায় ধারণ করলে এই কৃতিত্বের দাম দিতে বেশি ভুল হবে না। মনে রাখা চাই জীবন-মৃত্যুর মহানতা নয়, তার হীন, সঙীন-খোঁচানো চীৎকৃত পরিবেশে এই পদগুলি রচিত হয়। রচনার মধ্যে মধ্যে সেপাই সান্ত্রির কুচকাওয়াজ, রুক্ষ রসিকতা, কখনো বা কৌতূহলের দুটো কথা ধরা দিয়েছে, এও বোঝা যায় খাঁচা থেকে তাঁবুতে লেখকের বাসস্থান বদল হয়।[১৬] কিন্তু স্বকৃত এবং সর্বজনকৃত বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার তাঁবুতে নেই, পরিবেশের উন্নতিও শেষ কথা নয়, হয়তো অন্য উপায়ের মধ্যে শিল্পের কাছে এমন কোনো চাবি আছে যা কেবল পলায়নী বিদ্যা নয়, যথার্থ শিল্পিত মুক্তি। বিকেল তিনটের ঐ মুহূর্ত পেরোনো তাতে আরো সম্ভব হয়,—

...of the wave receding
but that a man should live in that further terror, and live
the loneliness of death came upon me
(at 3 P. M., for an instant)

three solemn half notes
their white downy chests black-rimmed
on the middle wire
periplum

(p. 105)

(১৬) The shadow of the tent's peak treads on its corner peg
marking the hour. The moon split, no cloud nearer than Lucca.
In "The Spring and Autumn"
there
are
no
righteous
wars
(p. 61)

এইখানে পূর্বে উদ্ধৃত লাইন আবার মনে প'ড়ে যায়,

When the mind swings by a grass-blade
an ant's forefoot shall save you
the clover leaf smells and tastes as its flower (p. 111)

তখন বুঝতে পারি এই পরের লাইনগুলির গভীর ইঙ্গিত—

A fat moon rises lop-sided over the mountain
The eyes, *this time my world,*
(ইটালিকস আমার)
But pass and look *from* mine
between my lids
sea, sky, and pool
alternate
pool, sky, sea, (p. 113)

সমস্ত অস্তিত্ব যখন অন্তরে প্রবেশ ক'রে শিল্পিত হয় তখন বাহিরের উপর একান্ত নির্ভরতা ঘোচে। সমুদ্র, আকাশ, জল অন্তরের চক্ষুকে পূর্ণ ক'রে বাঁচায়, সেই চক্ষু ঐ অমন আশ্চর্য চাঁদের শৈলশীর্ষে অভ্যুদয়ের দৃষ্টির চেয়ে কম নয়। এই সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ কাব্যের যবনিকা পড়ল। কবিতার শেষ হঠাৎ মিলান্ত দুই লাইন শেক্‌সপীয়রের কোনো মহাশক্তি সনেটের হাতুড়ির মতো। ভাব এবং কারিগরির পূর্ণ একটি ছেদ টেনে সমস্তটাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলা।

তাঁবুর চারদিকে শীতের বরফ-জমা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, রাত্রিকাল ;

If the hoar frost grip thy tent
Thou wilt give thanks when night is spent. (p. 118)

তিন

মনে হতে পারে রামায়ণে রামের ব্যক্তিগত কথা না বলে তাঁর একটি কীর্তির প্রসঙ্গেই আখ্যান শেষ করছি ; উপায় নেই।

পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু ইন্‌টারভ্যু অর্থাৎ কথাবার্তার নির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করা এখনো চলে না। হয়তো পূর্বে যা লিখেছি তার মধ্যে বহু তথ্য অন্তর্লীন হ'য়ে আছে। পাউণ্ড ডেকে নিয়ে জানলার ধারে বসালেন এবং সব আলোচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন, স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ, তাঁদের লণ্ডনে প্রথম চেনার উৎসুক বর্ণনা দিলেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাছে ভারতবর্ষ, বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এল, বললেন জীবনে এসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একদিন বাংলা গান শুনেছি। এই কথা আমার কন্যা সেমন্তীর হাতের-লেখা খাতায় লিখে দিলেন। গীতিকাব্য যে কোথায় পৌঁছতে পারে তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনা, তার তুলনা নেই; সুর বাদ দিয়েও ছন্দে, মিলের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে, গঠনের সৌকর্যে এবং ভাষার ভাবে-ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার সম্রাটশিল্পী। আরো বললেন, বাংলা কবিতার প্রত্যেক আলাদা বাংলা কথা উনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বুঝে নিতেন, ছন্দের কূট আলোচনা করতেন, এমনি ক'রে তাঁর খুব সুস্পষ্ট ধারণা হয়। লিরিক অর্থাৎ লঘুচারী অথচ রূপে ভরা, ভাবের ভাস্কর্যে গড়া গীতকাব্য, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত বাদেও আদিম সঙ্গীতভাবাশ্রয়ী যার ছন্দ, যার মধ্যে বেদনা অক্ষরের অন্তর্ধ্বনিতে পদান্তে পূর্ণ হয়ে উঠে একটি বিশিষ্ট অনুভূতির মণ্ডলী সৃষ্টি করে এবং তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দৃশ্য ও পরিবেশকে ভাবের উজ্জ্বলতায় অব্যবহিত দেখা যায়, সেই সর্বাতীত কারুসৃষ্টির জগৎশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। বলতে বলতে কথার একটু যে খেই হারিয়ে যায় না তা নয়, উৎসাহে সবারই তা হতে পারে, কিন্তু চীনেরা আর্টকে কেন চারিত্র বলে তা এরই সাংলগ্নিক; অনেকখানি সেই বিষয়ে বললেন। Fenellosa আবার পড়তে অনুরোধ করলেন; পাউণ্ডের কৃত ইংরেজি তর্জমা এখনো পাওয়া যায়। তুলির প্রত্যেক টানেই চরিত্র ধরা পড়ে,

অর্থাৎ শিল্পী যা বলতে চায় শুধু তা নয়, তার মনের গড়ন আঁকা প'ড়ে যায়; ছবির বিষয়বস্তু অনেক সময় আপেক্ষিক অদরকারী, কিন্তু সব মিলে শিল্প মানুষকে বলায়, গড়ায় আঁকায়। রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, এবং তাঁর শিল্পে যেটুকু বেশি বলে তা একই ধর্মী এবং চারিত্রিক,—এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল। মনে পড়ল য়েট্‌স-এর মধ্যে এই চরিত্রের অভাব, যদিও তিনি উজ্জ্বল শিল্পী, তার কারণ পরিভাষায়, উপমায় এমন কি উল্লেখ, প্রসঙ্গ এবং ঘটনার অবতারণা করার ছলে তাঁকে অনেকখানি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে; তিনি যা বলতে চান তার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য তাই তাঁর রচনার গায়ে লিখিত এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। যা বিশ্বাস করতেন না, যে সব নিকৃষ্ট ভৌতিকতার জঞ্জালকে তথ্য না মেনেও তথ্যরূপে ব্যবহার করেছেন, তার অলীকতা য়েট্‌স্-এর গদ্য ও কবিতার অনেক স্থানে দুর্বলতা এবং কৃত্রিমতা এনে দিয়েছে, পাউণ্ডের আলোচনার প্রসঙ্গে আমার মনে পড়লো। পাউণ্ডের কবিতা স্পষ্টবাদী, সত্যবাদী, প্রত্যক্ষ জানা এবং ধারণা বাদে তিনি কাব্যে কিছু বলেন না, তাঁর কবিতার বিপদ একই সঙ্গে অতিমাত্র ভাষণের উৎসাহ অথচ সচেতন শিল্পের হাল ছেড়ে দিয়ে ভাষাকে অবচেতনার স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া; সংসর্গ এবং সংলগ্নতার গোচর পথ একান্ত পরিহার করা। এইখানে য়েট্‌স্-এর শিল্পীজনিত সুবুদ্ধি তাঁকে রক্ষা করে এবং তাঁর গভীরতম আলোকিত বেদনা ও মনোদৃষ্টির শক্তি তাঁর আশ্চর্য শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতায় চিরন্তন প্রকাশিত হয়। পাউণ্ড বললেন, "যদি বাংলা শিখতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্তরে স্তরে যদি অক্ষর, ছন্দ, মাত্রা, ভাবের যাতায়াত শুনে দেখবার সময় থাকত। কিন্তু এই কাজ এলিয়টের করা উচিত ছিল,—তিনি সংস্কৃতে আমার চাইতে অনেক দূর এগিয়েছিলেন।" এলিয়ট ১৯শে নবেম্বর এখানে Library of Congress-এ কবি সভায় আসছেন, নোবেল প্রাইজ তিনি পাবার

পূর্বেই কয়েকজন আধুনিক কবিকে নিয়ে এই আয়োজন হয়েছিলো, পাউণ্ডের সঙ্গেও দেখা করবেন : সেই সময়ে সব কথা হবে। ঠিক এখন পাউণ্ড কনফ্যুসিয়সের সাত হাত জলে নিমগ্ন ; বললেন, ত্রিশ বছর এই ডুবুরির কাজ করছি। তাঁর "Confucius" সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এখন কনফ্যুসিয়সের Analects নিয়ে বসেছেন, দেখলাম পাতার পর পাতা চীনে কবিতার পদান্ত-মিলের বিচিত্র পদ্ধতিকে ইংরেজিতে ছকেছেন, স্বরলিপির মতো দেখাচ্ছে।

এর মধ্যে ডরথি পাউণ্ড এলেন, তাঁর শান্ত দুঃখজয়ী মুখে স্বামীর সমস্ত দুর্গতির অতীত সাক্ষ্য রয়েছে—দুজনে সংসারের কোন্ প্রতীতির উপর ভর ক'রে আছেন তাই ভাবলাম। ইনি য়েট্স্-এর পত্নীর আত্মীয়া, য়েট্স্ পরিবারের নানা কথা হল। দুই বন্ধুকবি মহাতর্কে রাপালোর ঘর ভরে তুলেছেন, কেউ ছাড়বার পাত্র নন, শিল্পের ভাষা নিয়েই বিরোধ। য়েট্স্ কল্পনার সূক্ষ্ম বিলসিত কাহিনী বা ছন্দেও চেতনার উজ্জ্বল রাজ্য ছাড়েননি, আর আমাদের উপস্থিত এই কবি তো চেতনা অবচেতনার পার্থক্য না মেনেই দোভাষী। অথচ পাউণ্ডের প্রথম গভীরতর পরিচয় দেন য়েট্স্, য়ুরোপীয় সংগীতের fugue-এর সঙ্গে Cantos-এর তুলনা করেন। শুধু তাই নয়, পাউণ্ডের সঙ্গে কথা ব'লে ও তাঁর রচনার বাঙ্ময় প্রহেলিকার মধ্যেও বাক্‌শিল্পের অতুল্য পরিচয় পেয়ে য়েট্স্-কে নিজের রচনার সংস্কারে প্রবৃত্ত হ'তে হল। যদিও পুরোনো কবিতাকে বদ্‌লানোর ফল ভালো হল না—যৌবনের ভাষা ও ভাব তনুগত যে-রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল সেখানে পরিবর্তনের চেষ্টা পরিণত বয়সের কবির পক্ষে অন্য কোনো কবির মতোই অনধিকারপ্রবেশ—কিন্তু পরবর্তী য়েট্স্-এর শিল্পে অনেকখানি রূপের দৃঢ়তা দেখা দিল। এর পূর্বেই এই দুই কবির সাহিত্য ও জীবনের সন্ধিস্থল তাঁদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের আগমন :

ভাষা, শিল্প ও ধ্যান, বা "চারিত্রে"র সম্পূর্ণ সৃষ্টিলোক হঠাৎ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ হল। পশ্চিমের দুই কবিই একথা বারবার স্বীকার করেছেন, যদিও অনুৎসুক ভারতীয় এবং উদাসীন বা অবজ্ঞাশীল বর্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যিকেরা আধুনিক জগৎসাহিত্যের একটি বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা ভুলতে বসেছেন। এলিয়ট তখনো অনেক পিছনে, তিনি সাবধানী পদক্ষেপে পাউণ্ডের অনুসরণ করেছেন, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে পূর্বতনের মতো পা ফেলেন নি, নূতন উপায়ে পেরিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর গীতাঞ্জলি তর্জমার মধ্য দিয়ে, দু চারটি ইংরেজি প্রবন্ধে এবং বিশেষ ক'রে এজরা পাউণ্ড ও য়েট্স্-এর মধ্য দিয়ে কী ভাবে এলিয়টের উপর ক্রিয়াশীল তা খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু অনুশীলনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের পরে—এবং অনেকখানি পরে, কালের দিক থেকে নয়, সাম্প্রতিক মূল্য ও চিরকালের দিক থেকেও অনেকটা পরে—য়েট্স্ এলিয়ট ও পাউণ্ড শিল্পশক্তির ক্রমিকতায় এই তিন কবি আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। এঁদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যাথার্থ্যরক্ষা হবে না। রিঙ্কে এই প্রভাবচক্রের একটু বাহিরে, স্থান এবং কালের বাধা তখন এর চেয়ে বেশি ছিল, যদিও পূর্বের মিস্‌টিক্ মনোদর্শন রিঙ্কের শিল্পে পৌঁচেছিলো মনে হয়—কিন্তু লর্কা এবং প্রাচীনতর ভালেরির শেষদিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত ত্রয়ী ইংরেজি কবির অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা কঠিন নয়।

আরো অগ্রসর হলে এই হাওয়াই চিঠির মাশুল দিতে বহু দুঃখার্জিত ডলারেরও শূন্য দশা ঘটবে। তা ছাড়া বর্ণনা লিখেও ইনটারভ্যু না লেখা চাই তো। পরিশেষে পাউণ্ডের দু চারটি বাক্যস্ফুলিঙ্গ উদ্ধৃত করতে দোষ নেই ; তর্জমা করতে গিয়ে নিষ্প্রভ ক'রে দেবো না, টীকা ভাষ্যও দিতে যাবো না। দীর্ঘ স্বগতোক্তি তাঁর প্রায়ই জটিল, অনেক সময় দুর্বোধ্যতায় তলিয়ে

যায়, কিন্তু কথা থামিয়ে নির্দয় প্রশ্নোত্তরে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে ঝলমলে বাক্যবর্ষণে তাঁর একটুও দেরি হয় না, সেই বাক্য যেমন সংহত, সংস্কারে সুদৃঢ়, তেমনি দূরগামী।

"আপনার Cantos কবিতায় 'কাল'-এর নির্ণয়পদ্ধতিটা কী রকমের?" "Eternity is all at once." আবার যোগ করলেন, "Elsewhere I have said, It will never be one hour more than it is at present." আবার যোগ করলেন, "Confucius knew that you cannot reduce or formulate Time." অনেক কষ্টে বার করা গেল যে প্রথম পঞ্চাশ Cantos-এর পরে রীতিমতো "সময়" দেখা দিয়েছে, সেই সময়ের আরম্ভ চীন জগতের ভূমিকা থেকে। তার পূর্বে "সময়"কে অনন্ত সময় (আমাদের ভাষায় "মহাকাল") থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করেন নি। যেমন ভারতীয় সঙ্গীতে রাগিণীর আলাপের পর স্পষ্ট সময় ছন্দে তালে দেখা দেয় সেই উদাহরণ আমার মনে এলো।

"আপনার কবিতায় সংলগ্নতা বা সংসর্গতার রহস্য অনেকের কাছে দুর্গম। যে-পথ আপনার মনের মধ্যে, সে-পথে পাঠকের পক্ষে যাতায়াতের বাধা আছে।" "Heraclitus said, All is fluid. But, of course, the leaf flows into form." "There is a pattern." ঘটনার পরস্পরসম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল; অনেক কিছু আছে এবং ঘটছে, তাদের যোগাযোগ নির্ণয়ের বুদ্ধির তো একটা চর্চা আছে, অন্তত পক্ষে অনুভূতির রাস্তায় তাদের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করা শিল্পের জগতে প্রচলিত। উত্তর এল, "No connection between the Lion and the Rose. Links are not provided. Both exist. But unless you know them both there is some lacuna is your knowledge." যোগ করলেন, "There is

very little that man can ignore without being ignorant." আলোচনা চলল। জানার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের বিচিত্র বস্তুকে ক্রমে কোনো একটা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হতে পারে, সে-পথে চলতে হবে, কিন্তু আসল তাদের মধ্যে যোগ অস্তিত্বের যোগ। সেই যোগের হেতু এবং সেতু দুইই মানুষের শিল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। ("Coexistential Poetry.")

বললেন, বিজ্ঞান যে-যোগ দেখাতে চায় তা কলের যোগ। "Any child can take an alarum clock into pieces. Beasts can make atom bombs. But an Indian Yogi does not force the pace of a rose. He sees. Connections. Healing. Growth."

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বললেন, পৃথিবীর নেতা গান্ধী। যখন তাঁর মৃত্যুর খবর পেলেন হঠাৎ তাঁকে চিনলেন। তার আগে মনে করতেন গান্ধী বিশেষ ক'রে ভারতীয়ের। আবার যোগ করলেন, কিন্তু Pisan Cantos লেখবার সময় বারবার গান্ধীর কথা ভেবেছি। জেলের চেয়ে বড়ো। শুধু তাই নয়, সব প্রাণের কাছে আসা। বললেন, গরাদের বাইরে পিঁপড়ে পোকা সবই আপন হল। একটা কাগজ নিয়ে যা আমাকে লিখে দিলেন সেটা উদ্ধৃত ক'রে এই চিঠি শেষ করব। কিন্তু তারও আগে বললেন, আশ্চর্য গান্ধী; এবং পেন্সিল নিয়ে লিখে দিলেন, "E. P. Guide to Kulchur 1935 (?) Gandhi perceived that India would attain freedom if we don't buy any cotton and at the same time don't buy any guns."

এজরা পাউণ্ড যে নরহত্যা ব্যবসায়ের বিরোধী, এবং যুদ্ধকে কী চক্ষে দেখেন তা পূর্বেই বলেছি। প্রশ্ন করাতে বললেন, মুসোলিনী? এই কারণেই তাকে ঘৃণা করেছি। পাউণ্ডকে মুসোলিনীর ভক্ত বলা হয়েছে, এবং অপরাধের বিষয়ে মন্তব্য

করাতে তিনি হেসে উঠলেন। যে-সব কপটেরা মুসোকে দোষ দেয় তারাও একই হিংসার ব্যবসায়ী, তাদেরও ঘৃণা করি এই আমার বিষয়ে প্রকৃত অভিযোগ। যে-সব ব্যবসায়ী জাতির তালিকা দিলেন তাতে য়ুরোপের পূর্ব বা পশ্চিম কোনো মহাখণ্ড বা ভগ্নাংশ বাদ পড়ল না তা বলা বাহুল্য।

কবিতায় ফিরে আসা যাক। তাঁর Cantosএর কবিতা free verse কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "Eliot has said, no verse is free for a man who wants to do a good job." তারপর যোগ করলেন, "Theory of counterpoint is not musical composition." অর্থাৎ দুই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই ভুল, কারিগরি যেন কারাগার না হয়। এর পরে যেন বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের মতো বললেন, "Ploughing has nothing to do with the quality of the seed." আবার যোগ করলেন, "You cannot organise form by theory." তারপর: "Barometer follows nobody's direction." তারপর: "The cherry cannot grow peaches. In the brain of the cherry there is only one idea—the cherry."

আজ এই পর্যন্ত। পাউণ্ডের সঙ্গে পুনর্বার দেখা হয়েছে। এমন অদ্ভুত প্রতিভাবান এবং অপরিকল্পনীয় আশ্চর্যভাষী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। যে-বিষয়েই কথা বলেছি কী ধরনের উত্তর এসেছে তার নিদর্শন উপরেই রইল, তার চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত কী হতে পারে। আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে তাঁর সংজ্ঞা এই—হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "World of robots is not One World. One world is Indians more Indians, English more English."

যেখানে মানুষের যথার্থ মিলন তার স্তরে শিল্পীকে পৌঁছতে হবে। Pisan Cantos-এর শেষ দিকে সেই কথাই আছে।

সেই একই মনের ভাব নিয়ে এজরা পাউণ্ড আমাকে কাগজে লিখে দিয়েছিলেন, "The necessary component of world thought from India is reverence for life in any form however small. Ezra Pound."

Washington D. C.
৮ই নবেম্বর ১৯৪৮

টি . এস. এলিয়ট

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এ-বছরের শান্তি-পুরস্কার নোবেল-প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহরণ করলেন, সম্ভবত এই কারণে যে প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্টালিনও ছিলেন, ট্রুম্যানও ছিলেন এবং শান্তির সংজ্ঞানির্দেশে কুতর্কের অবতারণা না-করলে ও-দুজনের একজনকেও অলিভ-শিরোপার যোগ্য লাগে না। পক্ষান্তরে, শান্তি-পুরস্কারের এই বিলম্বন হয়তো সতর্কতারই ফল, এবং সর্বগ্রাসী প্রাচী আর ক্ষমাহীন প্রতীচীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ক্ষুদ্র দেশে সতর্কতার প্রয়োজনও বোধগম্য ; কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহ'লে সাহিত্যের পুরস্কার-অর্পণ সুবুদ্ধিসূচক হয়নি। কেননা, মাত্র ক-দিন আগে ব্রেসলাউ-তে—পোল্যাণ্ডের নূতন সীমান্ত আরো স্বাভাবিক দেখাবে ব'লে শহরটির নূতন নাম হয়েছে ভ্রোৎসলাফ—একজন রুশ প্রতিনিধি, শ্রীযুক্ত ফাডিঈভ, একটি আন্তর্জাতিক মনীষী-সম্মিলনে এই অভিমত ঘোষণা করেন যে টি. এস. এলিয়ট, ইউজীন ও'নীল, জন ডস প্যাসস, সার্‌ত্রর আর আঁদ্রে মালরোর রচনাদি সেই রকম, 'যে-রকম লিখতো টাইপরাইটর ফাউন্টেনপেন চালাতে পারলে হায়েনার দল, শেয়ালের পাল।'

সোভিয়েট সমালোচকটির বিচারবুদ্ধির পরিধি দেখে কোনো-কোনো মুগ্ধ 'সহযাত্রী' হয়তো তাঁর ভাষায় প্রোলেটারিয়ান প্রাণশক্তি আবিষ্কার করতে উন্মুখ হবেন। কিন্তু স্মৃতি যাঁদের দীর্ঘতর, তাঁরা এই সচেতন পাশবিকার উদাহরণে এই তথ্যের আরো একটি প্রমাণ পাবেন যে দূষিত ধনতন্ত্রের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর বীর বিপ্লবীদের লুকিয়ে রাখার বদলে লৌহ যবনিকা গোপন করে নব্য সাম্রাজ্যবাদ, মৌরসী অধিকারের প্রতি ঈর্ষা। অবশ্য, খুব বেশি আগেও না, এমন একটা সময় ছিলো, যখন অন্তত ইংরেজি-জানা

সাম্যবাদীরা পাশ্চাত্ত্য অবক্ষয়ের লোমহর্ষক চিত্রণ ব'লে সপ্রশংস কণ্ঠে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' আওড়াতেন ; আর সে-সঙ্গে এও স্মর্তব্য যে আরো কিছু আগে একজন জাত-য়োরোপীয়, ই. এম. ফর্স্টর, ঐ কবিতাটির প্রচণ্ড শক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েও তার মার্কিন প্রণেতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন প্রতন পৃথিবীর ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টির নঙর্থকতা সংশোধন করতে।

সেই সময় থেকে আরম্ভ ক'রে এলিয়ট নিশ্চয়ই তাঁর স্বেচ্ছাবৃত স্বদেশের সঙ্গে নিজেকে একান্তরূপে একাত্ম করেছেন। ক্যাথলিক ধর্মের বাস্তবতা এবং হোলি রোমান এম্পায়ারের প্রপঞ্চ ভিন্ন বর্বরতার উপপ্লব থেকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিস্তার নেই, এই উপলব্ধির ফলেই তিনি উত্তরোত্তর খৃষ্টান ব্যবস্থার আর রাজবাদী আদর্শের প্রবক্তা। যাঁদের জীবনদর্শন ঐহিক তাঁদের কাছে এলিয়টের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে মর্মঘাতী ; শ্রীযুক্ত হর্বর্ট পামার তো তাঁর নৈরাশ্যের কাব্যিক ব্যবহারই করেছিলেন 'আশ ওয়েনজডে'র উত্তরে 'সিণ্ডর থর্সডে' লিখে। 'অ্যাশ ওয়েনজডে', যদিও অস্পষ্টরূপে, এ-কথাই প্রকাশ করলো যে এলিয়ট তাঁর নিঃস্পৃহ প্রত্যাখ্যানের পরপারে ধর্মবিশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন। বস্তুত, এই রূপান্তর শুধু আপাতরূপে আকস্মিক ; য়োরোপের ইতিহাসে সদৃশ কালপ্রভাবে অনুরূপ পরিবর্তন এমন ঘটেছিলো যার আয়তন এর তুলনায় অসীম।

ঘটেছিলো তখন, যখন পেগান পৃথিবীর অস্তিত্ব শেষ হ'লো। তখন, ব্যক্তিগত জীবনে যাঁরা, উদাহরণত, মার্কাস অরেলিয়াস আর এপিকটিটাসের মতো বিভিন্ন, তাঁরা অনন্য আশ্রয় পেয়েছিলেন জেনো-প্রবর্তিত চিরন্তন পুনরাবর্তনের মধ্যে পুরুষকারে বিশ্বাসে। প্রাচীন খৃষ্টানরা, তাঁদের ধ্যান-ধারণার সমরূপী কল্পান্তরবাদ সত্ত্বেও, বিনা দ্বিধায় স্টোয়িক দার্শনিকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, বোধহয় সেইজন্যই তাঁদের ভগবদ্বিদ্যায় অমঙ্গলের সমস্যা এমন

দুঃসমাধান। কেননা স্টোয়িকরা বিশ্বাস করতেন যে ব্রহ্মাণ্ড একটি অখণ্ড, জীবন্ত সত্তা, তার আত্মা ভগবান এবং ভগবানের ক্রিয়াকর্ম যেহেতু কতগুলি সাধারণ বিধানের বশবর্তী, তাই এমন বিধানই তিনি নির্বাচন করেন, যা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রসূ। অতএব, কদাচ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয় ফলাফলের সম্ভাবনা থাকলেও, বিধিগত ধ্রুবতার আনুষঙ্গিক শুভসমূহের নির্বন্ধে অমঙ্গলের বিরল উদাহরণ রীতিমতোই সহনীয়।

স্টোয়িক দর্শন থেকে লাইবনিৎসের শুভবাদে পৌঁছনো সহজ; এবং প্রয়োজনের পরিজ্ঞানই যে মুক্তি, এই হেগেলীয় ধারণাও এর সুস্পষ্ট অনুসিদ্ধান্ত। তত্রাচ, স্টোয়িক সহনশীলতায় কোনো পূর্ণবিপ্লবীই সায় দিতে পারে না, এ-ধারণাতেও না যে মানুষের ভবিষ্যতের উপর ফলাফলনির্বিচারেই পুণ্যকর্ম সার্থক। এবম্বিধ হিতবাদী, উপযোগবাদীদের কাছে এলিয়টের রচনাবলী প্রতিক্রিয়াশীল লাগতে পারে; এঁদের একজন অন্তত, আমার পরিচিতদের মধ্যে দুর্ধর্ষতম প্রগতিশীল, এলিয়টের নোবেল-পুরস্কারণের সংবাদ শুনে বলেছিলেন যে এই নির্বাচন সমাজবিরোধী। এই অপবাদের অর্থ আমার কাছে অনিশ্চিত, তবে যদি এই মন্তব্যের তাৎপর্য হয় এলিয়টের প্রতি কলাকৈবল্যের জীর্ণ সূত্রের আরোপণ, তাহ'লে এ-কথা স্মর্তব্য যে এলিয়ট কবির কাছে শুধু এ-প্রত্যাশাই করেন না যে তিনি প্রত্যেক অনুভূতির একটি 'বহিরাশ্রয়' খুঁজে পাবেন, উপরন্তু তাঁর ধারণায় কবি একজন 'ঘটক' মাত্র, ব্যক্তির আর গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে একটি স্বসমুখ সম্পূর্ণতায় মিলিত করাই যাঁর একমাত্র কাজ।

. . . . . I have said before
That the past experience revived in the meaning
Is not the experience of one life only
But of many generations—nor forgetting
Something that is probably quite ineffable:

The backward look behind the assurance
Of recorded history, the backward half-look
Over the shoulder, towards the primitive terror.
Now, we come to discover that the moments of agony
(Whether, or not, due to misunderstanding,
Having hoped for the wrong things or dreaded the wrong things,
Is not in question) are likewise permanent
With such permanence as time has. We appreciate this better
In the agony of others, nearly experienced,
Involving ourselves, than in our own—
For our own past is covered by the currents of action,
But the torment of others remains an experience
Unqualified, unworn by subsequent attrition.
People change, and smile: but the agony abides.
—*The Dry Salvages*

ফলত, সৎকাব্যের অভিধা এলিয়টের কাছে এই যে তাতে সকল পূর্ববর্তীর চিহ্ন বিদ্যমান; আবার যদি কোনো জীবন্ত ঐতিহ্যের মধ্যে তার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সেই ঐতিহ্যকে সে এতটা অন্তত এগিয়ে দেবেই যাতে ও-দুয়ের কোনো-একটিকে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব হবে না অন্যটির শরণ না-নিলে। এই ধারণা স্পষ্টতই পূর্ণতম অর্থে বিপ্লবী; অতীতেই সৌন্দর্যের বসবাস, ভালেরির এই বিশ্বাসভূমি থেকে এলিয়ট এতই দূরবর্তী যে তাঁর মতে শিল্পী ততটাই শিল্পীনামের যোগ্য, যতটা তিনি স্বযুগের প্রতিবিম্ব।

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction

Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind.
But to what purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves
I do not know.

—*Burnt Norton*

তিরিশ বছরের ফলিত সাম্যবাদ প্রমাণ করেছে যে মতাবলম্বীরা যা-ই বলুন না, বাদে আর প্রয়োগে রাজযোটক বিরল; আর যদিও পাণ্ডিত্যের বিচারে এলিয়টের কবিতাবলী পূর্ববর্তীদের নিষ্কর্ষসংকলিত তিলোত্তমা, আর এলিয়ট নিজেও প্রত্যেক সৎকাব্যে ক্রমাভিব্যক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার উদাহরণ দেখতে পান, তবু তাঁর কাব্যকে শুধু অভিব্যক্তির উদাহরণরূপে গ্রহণ করতে আমার মতো অনতিপণ্ডিতের মন সায় দেয় না। ফলত, আমার কাছে 'ফোর কোয়াট্রেটস'-এর উদ্ধৃত অংশের বৈশিষ্ট্য সেন্ট অগস্টিনের কাল-কল্পনার সঙ্গে তার সাদৃশ্যে নয়, প্রাকৃত অস্তিত্বের ব্যর্থতা থেকে যে-কোনো স্বপ্নমিনারে অপসরণের অস্বীকরণে। গোলাপ-বাগিচায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু 'সেখানে যাবার রাস্তা সে-পথে নয় যার প্রান্তস্থ দরজা আমাদের দিয়ে খোলা গেলো না কোনোদিন।'

এই উপলব্ধির জন্য, হয়তো, আত্মপরিধির মধ্যে বিশ্বকে ধারণ করতে হয়, যেমন অর্জুন করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে, যখন কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণায় বাহু তাঁর অবশ হয়েছিলো; আর তখন যে-অভিজ্ঞতা আমরা পাই সেটা ভূমানন্দ নয়, কিংবা মুহূর্তের

জন্যও আমাদের মনে ত্রিকালদর্শিতা বর্তায় না; শুধু ইতিহাসের পৌনঃপুন্য আবার প্রথম থেকে আরম্ভ হয়, আর এত দুঃখে যে-বিদ্যা অর্জন করলাম তার প্রয়োগক্ষেত্র শূন্যে এসে ঠেকে।

So here I am, in the middle way, having had twenty years—
Twenty years largely wasted, the years of *l'entre deux guerres*—
Trying to learn to use words, and every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words
For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it. And so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating
In the general mess of imprecision of feeling.
Undisciplined squads of emotion. And what there is to conquer
By strength and submission, has already been discovered
Once or twice, or several times, by men whom one cannot hope
To emulate—but there is no competition—
There is only the fight to recover what has been lost.
And found and lost again and again: and now under conditions
That seem unpropitious. But perhaps neither gain nor loss.
For us, there is only the trying. The rest is not our business.

—*East Coker*

বিবর্ণ এই প্রস্তাব এবং; খৃষ্টীয় মতবাদের সঙ্গে হিন্দু আর বৌদ্ধ বিশ্বাসের এই ধর্মসংকর ঘটিয়ে এলিয়ট চর্চের চোখে কতটা পাতকী হয়েছেন, তার বিচার আমার মতো অখৃষ্টানের সাধ্যাতীত। কিন্তু এ-বিশ্বাস আমার সুদৃঢ় যে আণবিক লঙ্কাকাণ্ডের পরেও সভ্যতার কোনো উত্তরকাণ্ড যদি থাকতেই হয়; তাহ'লে এলিয়টীয়

আদর্শের ব্যাপ্ত স্বীকৃতি এখন আবশ্যক, যাতে উত্তরপ্রালয়িক মরুদ্যানগুলিতে, আবার যুগান্তরের পূর্বাহ্ণে, মানুষ সে-আদর্শে আশ্রয় পায়।

সেইজন্য এলিয়টের নোবেল-পুরস্করণে আমি আনন্দিত। তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষের কোনো নূতন স্বীকৃতি অবশ্য বাহুল্য; য়েটস-এর মৃত্যু ইতিপূর্বেই তাঁকে ইংরেজি কাব্যের অধিপতির আসন দিয়েছিলো, আর এখন তো ভালেরিও গত, অতএব য়োরোপে, হয়তো পৃথিবীতেই, তাঁর তুল্য কবি আর নেই। কিন্তু তরুণতর সমসাময়িকদের উপর তাঁর প্রভাব যদিও বিরাট, এবং কোনো-কোনো পূর্ববর্তীর যে-মূল্যায়ন তিনি করেছেন তারও স্থায়িত্বের সম্ভাবনা, তবু তাঁর আবেদন এতদিন গোষ্ঠীগতই ছিলো, সর্বসাধারণে পৌঁছয়নি। এই নোবেল-পুরস্করণ হয়তো তাঁকে সেই জনপ্রিয়তা দেবে, যা প্রত্যেক মহৎ কবির প্রাপ্য; আর তা যদি ঘটে, তাহ'লে শান্তির সপক্ষেও নূতন কণ্ঠ অনেক শোনা যাবে পৃথিবীতে।

(অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে। ইংরেজি রচনার অনুবাদ।)

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

এটা ঘোষ

[আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কৃতিৎকর্মীদের মধ্যে কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬- ১৯৪৮) অগ্রগণ্য। ওমর খৈয়মের বিখ্যাত অনুবাদক, সনেটশিল্পী, গল্পলেখক, 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা'র মণ্ডলীভুক্ত বিদগ্ধ নাগরিক, সাহিত্যক্ষেত্রের উপান্তে অস্থির মনোহর উজ্জ্বলতায় বিচরণ ক'রে উত্তরজীবনে তিনি স্থিত হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী এটা ঘোষ—কুমারী নাম এটেলকা বোগলার (Etelka Boglar)—তাঁর বিষয়ে আমাদের কাছে মুখের কথায় যা বলেন, সেইটে অবলম্বন ক'রে এই স্মৃতিকথা লিখে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ। শ্রীমতী ঘোষের সৌজন্যে আমরা কান্তিচন্দ্রের দুটি অপ্রকাশিত সনেটও পেয়েছি, তাও এই সঙ্গে প্রকাশ করলাম। কান্তিচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ এই ক-টি : (১) ওমর খৈয়ম (২) হাফিজ (৩) সনেট (৪) কবীর বাণী (৫) ধূমকেতু (ছোটোগল্প)। এ ছাড়া কিছু বাংলা ও ইংরেজি রচনা এবং অনুবাদ সাময়িক পত্রাদিতে ছড়িয়ে আছে।—সম্পাদক।]

ওর সঙ্গে দেখা হোলো লণ্ডনের ফেলোশিপ্ ক্লবে শীতের এক বিকেলে। রামকৃষ্ণ মিশনের কী একটা সভা ছিল। আমি তখন পঁচিশে পা দিয়েছি, কান্তি পঞ্চাশ। ভাষা শেখার জন্য দু-বছর ইওরোপ ঘুরে '৩৫-এর ডিসেম্বরে লণ্ডনে এসেছিলাম ইংরেজি শিখব বলে। আমি যুদ্ধের আগেকার রোমান ক্যাথলিক হাঙ্গেরির মেয়ে; প্রতিবেশী জর্মানিতে হর্তাকর্তা হিটলার। আমাদের নিয়ে, শুধু আমাদের কেন, যে-কোনো বিদেশীকে নিয়ে ইংলণ্ডের তখন সতর্কতার অন্ত নেই। দু-মাসের বেশি থাকার অনুমতি মেলে না; শেষে দরকার হলে আবার দু-মাস, কি আরো দু-মাস তার পরেও।

ফেলোশিপ ক্লবে ওর কথাতেই গিয়েছিলুম, ওখানকার ইংরেজি সমাজের পরিবেশে, কথায়-বার্তায়, আমার মতো অনিংরেজের ভাষা শেখার অনেকটা সুযোগ হবে বলে। আমাকে আরো আকর্ষণ করেছিল ইংরেজি ভাষায় ওর নিজের অসামান্য দখল। অনেক ইংরেজকেও বলতে শুনেছি যে মার্জিতরুচি কথোপকথনে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, সহজাত ব্যঞ্জনিপুণতায় সহজে ওর জুড়ি মেলে না। আর তাই, যদিও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি ভাষাই আমার সম্বল, আর ওর কাছে ইংরেজি ছাড়া ইওরোপের আর যে-কোনো ভাষার দরজাই বন্ধ, তবু আলাপ জমলো আমাদের, ক্লবের চায়ের টেবিলেই। কিন্তু সে আর

ক-দিন? বোধ করি চার পাঁচবার মাত্র আমাদের দেখা হয়েছিল লণ্ডনে। ছ-মাস না যেতেই জুন মাসে কান্তি ইংলণ্ড ছাড়লো ইওরোপ বেড়াবে বলে, তারপর ফিরবে ভারতে।

ভিয়েনা থেকে কিছুদিন পরেই হঠাৎ ওর চিঠি পেলুম, ভাষার বাধায় পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, সুখ পাচ্ছে না মুখ বুজে বেড়িয়ে। লিখেছে, খুব ভালো হয় ইওরোপ ভ্রমণে আমি যদি সঙ্গী হই ওর। কিন্তু তা কি সম্ভব? ভাষাচয়নেই তখনো ব্যস্ত আমি; চারদিকের হাওয়ায় এমন অস্বস্তি; এ সময় একবার ইংলণ্ড ছাড়লে আবার কখনো ফেরা হবে কিনা কে জানে। ইওরোপ ঘুরে ওর দেশে ফেরার কথা, কাজেই আমাদের সেই অল্প ক-দিনের আলাপের সেইখানেই শেষ হতো, যদি না দৈবাৎ এর এক মাসের মধ্যেই আমাকেই টেনে আনতো ইতালিতে আমার ভাগ্য।

ইতালিয়ানরা হাঙ্গেরিতে সে-বছর নতুন আপিশ খুললো। এমন একজন লোক চাই, যে হাঙ্গেরীয় ভাষা ছাড়া আরো দু-চারটে ইওরোপীয় ভাষা তো জানেই, এমনকি ইতালিয়ানও জানে। আমি ইতালিয়ান কিছুই জানতুম না। তবু বুদাপেস্ত থেকে মা আমার হয়ে আবেদন পাঠিয়ে দিলেন, আমাকে লিখলেন,—'এটা, তোমার জন্য এ ছলনাটুকু করতেই হোলো। এখনো দু-তিন মাস সময় হাতে আছে, চটপট ভাষাটা শিখে নাও। আমাকে লজ্জায় ফেলো না।' কাজেই জুলাই মাসে সেই ইতালিতেই আমাকে যেতে হোলো। কান্তি তখন পেরুজিয়াতে, আর বিদেশীদের পক্ষে চটপট ইতালিয়ান শেখার জায়গা পেরুজিয়ার মতো সারা ইতালিতে আর দুটি নেই। কী বলব? ভাগ্যই হয়তো আবার এক জায়গায় টেনে আনলো আমাদের। ফ্লোরেন্স, ভেনিস ইত্যাদি দেখবে বলে পেরুজিয়া ছেড়ে কান্তি তখন রওনা-পথে। আমার চিঠি পেয়ে কোথাও আর যাওয়া হোলো না। নতুন ইতালিতে এসে অপরিচিত রেল ইস্টিশানে ওর পরিচিত মুখ দেখে খুশি হলুম।

প্রথম দিনে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই সভাতেই ওকে আমার চোখে পড়েছিল, ভিড়ের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র, সংযত, নিজের ব্যক্তিত্বে নিজেই সম্পূর্ণ। কথার চাকচিক্যেই যে শুধু ওর আকর্ষণ তা তো নয়। সবার উপরে ওকে ঘিরে ছিল সেই আশ্চর্য শান্ত ভাব, যা প্রাচ্য দেশবাসীর স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। শুনেছি অনেকের ধারণা, ভারতের রোদে-পোড়া ব্রাউন রংটা

ইওরোপের মেয়েদের মন ভোলায়; হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু তার চেয়েও টানে বোধ করি এশিয়ার এই আত্মস্থ শান্তি, ওদেশে যা দুর্লভ।

পেরুজিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-মাসের কোর্স নিয়ে আমি ইতালিয়ান শিখতে ঢুকলাম। ঘন-ঘন দেখা হয় ওর সঙ্গে; দুজনেই আগন্তুক, একসঙ্গে বেড়াই, কলেজ ক'রে খেতে যাই একসঙ্গে Foreign Friends' Home-এর একতলার রেস্তোরাঁয়। এমনি ক'রে দু-মাস কাটলো, সেপ্টেম্বর পড়লো, আমার জন্মদিনের মাস। দেশে ফেরার সময় হোলো আমার, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফেরার জন্য বাবা চিঠি লিখলেন। এদিকে ভারতবর্ষ থেকে খবর এলো কান্তির ভাইয়ের কঠিন অসুখ। আমরা ততদিনে স্থির করেছি বিয়ে করব।

কিন্তু কোথায় বিয়ে হয়, কী ক'রে হয়? কাউকে জানাইনি বাড়িতে, মাকেও না। ইতালিতে হাঙ্গেরির কোনো কন্সাল আপিশ ছিলো না। আর বুদাপেস্ত? সেই রোমান ক্যাথলিক দেশে বিচিত্র যত রকম দলিলপত্রের প্রয়োজন হবে এ বিয়েতে, কোথায় পাবো তা আমরা? তবু হয়তো ওকে নিয়ে যেতে পারতুম হাঙ্গেরিতে। কিন্তু মা বাবা কেউ তো ইংরেজি জানেন না, আর ও শুধু ইংরেজিই জানে। তাছাড়া এর কয়েক মাস আগেই মা-বাবার অমতে দিদি বিয়ে করেছিল একজন জর্মনকে। সেই দুঃখের উপর মা-বাবাকে আরো একটা আঘাত দিতে মন চাইছিলো না। আমি যেন পাঁচ বছরের শিশু, এমন ক'রে ভালোবাসতেন আমাকে তাঁরা। রোজ চিঠি পেতুম বাবার। সেই সব স্নেহময় চিঠি সংসারের খুঁটিনাটি হাজার কথায় ভরা। সবই জানানো চাই আমাকে, যেন না থেকেও তাঁদের কাছেই আছি। কী ক'রে লিখবো এ-কথা আমি তাঁদের?

আশা-আশঙ্কায় দুলতে-দুলতে সেই সেপ্টেম্বর কী ক'রেই যে কাটলো আমাদের! সমস্ত ইতালিতে ঘুরে বেড়ালুম দুজনে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোলো ভারতে এসেই বিয়ে হবে; অনেক ইতস্তত ক'রে বাবাকেও লিখে দিলুম সব কথা। অক্টোবর পড়তেই কান্তি ভারতে রওনা হোলো; আর দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলুম আমি—কী উত্তর আসে বুদাপেস্তের।

এমন একটা দিনের কথাও মনে করতে পারি না যেদিন বাবার চিঠি পাইনি। বিয়ের কথা জানিয়ে লেখার পরে একদিন দুদিন ক'রে সাতদিন

গেলো, কোনো চিঠি নেই। উদ্বেগে যখন আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি তখন বাবার একটা টেলিগ্রাম এলো—'আশীর্বাদ।'

বাবা যে কী ক'রে এ আঘাত সামলে নিয়েছিলেন তা চোখে দেখিনি, বাড়ি ফিরে শুনলুম। আমার চিঠি পাওয়ার পরে এতই অস্থির হয়েছিলেন যে ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন, আর ফিরতেন রাত দুপুরের আগে না। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলেননি একটা কথা। মা-তো এ কথা কানে যাওয়া অব্দি রাতদিন ব'সে-ব'সে চোখের জল ফেলেছেন। কয়েক শো মাইল দূরে যে জর্মনি—তাই তো মার কাছে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। আর ভারতবর্ষ? সে তো পৃথিবী ছাড়িয়ে!

বাবা আমাকে একটাও রাগের কথা বললেন না। একা ঘরে পায়চারি করতে-করতে কোনোদিন কাছে এসে দাঁড়াতেন—'মন কি স্থির ক'রে ফেলেছ, এটা? এখনো সময় আছে, এখনো ভেবে দেখ।' আর ভেবে দেখা! ডিসেম্বরের গোড়াতেই ভারতে রওনা হলাম। কান্তি লিখেছিলেন—'একবার এসে এ-দেশ নিজের চোখে দেখে যাও, ওদেশের সমাজের সঙ্গে কিছুই মেলে না এখানকার। যদি ভালো লাগে থেকো, নয়তো ফিরে যেয়ো।' পাসপোর্ট নিতে গেলুম—ভদ্রলোকরা চোখ কপালে তুলে হতাশভাবে এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে। বলছ কী তুমি? ভারতে যাবে বিয়ে করতে? তার চেয়ে শোনো আমাদের পরামর্শ—। জর্মনি থেকে দিদি দেখা করতে এসেছিলেন। দেশ ছাড়বার শেষ সময়ে কী যেন অজানা আশঙ্কায় হিম হয়ে গেলাম। কত দূরে ভারতবর্ষ! আর সত্যি, ডিসেম্বরের সেই সকালে যখন বম্বাইতে ভিড়লাম, আর দলে-দলে প্রায়-উলঙ্গ কুলি জাহাজটাকে ভ'রে ফেললো, বুকের মধ্যে একটা ভয়ের ধাক্কা দিলো হঠাৎ। কিন্তু কান্তি জাহাজঘাটে ছিলেন। বম্বাই থেকে লক্ষ্ণৌ হ'য়ে ক-দিনের মধ্যেই আমরা শান্তিনিকেতনে এসে উঠলুম।

রবীন্দ্রনাথকে কান্তি সব কথাই বলেছিলেন। দু-মাস পরে মার্চ মাসে অত্যন্ত অনাড়ম্বরে রেজিষ্ট্রি ক'রে আমাদের বিয়ে হ'লো কলকাতায়। আইনের চোখেও ভারতীয় হলুম। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করলেন—বেলফুলের মালা গলায় পরিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ইংরেজিতে শুনে তার মানে বুঝলুম। সংসার পাতলুম কলকাতায়, ফ্ল্যাটে।

যৌথ পরিবারের আওতায় কান্তিরই ভালো লাগে না, আর আমি তো—! কান্তি তাই পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন।

কান্তি ছিলেন সেই ধরনের মানুষ, আড্ডায়, মজলিশেই যাঁদের প্রতিভার বিকাশ। পঞ্চাশ পেরিয়ে সেই প্রিয় মজলিশ ছাড়লেন, বাড়ি, আপিশ, কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এর মধ্যেই আবদ্ধ করলেন নিজেকে, পাছে সমাজের কোনো গোঁড়ামির আঘাত আমার গায়ে এসে লাগে। অনেকেই হয়তো এই পরিবর্তনে অবাক হয়েছিলেন; ভেবেছিলেন এত বড় মজলিশি মানুষের এই অধঃপতন কী ক'রে সম্ভব। কিন্তু কান্তিকে যারা সত্যিই বুঝতেন তাঁরা জানতেন যে এই নির্জনতাকে তাঁর নিজের মধ্যেই এত কাল লালন করেছেন তিনি। তাঁর হাসিঠাট্টা, কথার জৌলুশেই যারা মুগ্ধ থাকতো, তারা কি কখনো জানতো যে সামাজিক জীবনের অন্তরালে আরো একটি গভীর সত্তা ছিল তাঁর। তাঁর এই আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস অনেকেরই জানা ছিলো না। অথচ তাঁর ভারতীয় দর্শনচিন্তার আলোচনা বিদেশের পাঠক-সমাজে প্রশংসা এনেছে। আমাদের বিয়ের পরে নিজের অতীত জীবনকে একেবারেই যেন মুছে ফেলে দিলেন। সে-সব কথা বলতেও ভালোবোসতেন না, আমিও কখনো প্রশ্ন করিনি। পঞ্চাশ পেরিয়ে যে-নতুন জীবন গড়তে বসলেন, তাতেই আমি যোগ দিলুম। সে-জীবন গড়া যেন নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া। বিবাহের পরে সকলে যখন জীবনের স্বপ্ন দেখে তখনই কান্তির মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হ'লো। আমাদের বিয়ে যে এইরকমই হবে তা তো আমরা জানতুমই। হাসিঠাট্টার ছলে কতবার সে-কথা বলেছেন, আমিও বুঝেছি নিছক হাসিঠাট্টা সে নয়। অলক্ষ্যে পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেই অন্তরঙ্গ জীবনে তিনি একা ব'লেই সামাজিক মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শানানো কথার আড়ালে পৃথিবীর ভিড় ঠেকিয়ে রাখতেন। ঘরোয়া সুখদুঃখের সঙ্গে অখণ্ড যোগ ছিলো, কিন্তু আসক্তি ছিলো না।

বই খুব ভালোবাসতেন। সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর কাছে গ্যোয়তে আর শেক্সপিয়র। সাহিত্যের বাইরেও নানাদিকে আগ্রহ ছিলো। জীবনী, হিন্দুদর্শন, ফরাশি বিপ্লবের ইতিহাস, যৌনবিজ্ঞান। পারস্য কবিদের তো ভালোই বাসতেন। নিজের যে-কবিপ্রতিভা ছিল কখনো তার পূর্ণ ব্যবহার করেননি।

যা হয়েছে এমনিই হয়েছে। ফিটজেরাল্ডের 'ওমরখৈয়াম' পড়তে-পড়তে ছন্দের একটা দোলা এলো, উঠে এলো কয়েকটা আস্ত পংক্তি—তরতর ক'রে অনুবাদ ক'রে ফেললেন সমস্তটা। 'সবুজপত্রে' সেই অনুবাদ ছাপা হয়েছিল, দেখেছি। এমনি ক'রেই হঠাৎ-হঠাৎ হয়েছে সব। অথচ সারাজীবনই লিখেছেন কিছু-না-কিছু, কখনো সনেট, কখনো কবিতার অনুবাদ, গল্প, এমনকি দার্শনিক প্রবন্ধ। কয়েক মাস আগেও গল্প লিখেছিলেন কলকাতার কোনো পত্রিকার জন্য।

* * * *

সারা বছর ধ'রে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি গেল বার। তাই কথা চলছিল উটির কাছাকাছি কোডাইকানালে হাওয়া বদলাতে যাবো। আমার ইচ্ছে ছিল না। এই বারো বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের, এর মধ্যে দু-চার দিন ছাড়া আলাদা থাকিনি। কিন্তু কান্তির জেদেই যেতেই হ'লো। ওঁরও শরীর ভালো ছিলো না, বন্ধুবান্ধবরা বলে-ক'য়ে কালিম্পং যেতে রাজি করালেন। কিন্তু পাহাড় সহ্য হোতো না ওঁর। আর সরকারি কাজে কুড়ি বছর ধ'রে হিমালয়ে যাতায়াতের পর আবার পাহাড়ে যেতে ভালোই বা লাগে কার? এমনিতেও অরুচি ছিল। বলতেন, চারদিকে দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁপ ধরে। সবচেয়ে ওঁর ভালো লাগত শান্তিনিকেতনে আমাদের দিগন্ত-খোলা বাড়ি, খোলা হাওয়ায় ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তবু বন্ধুদের অনুরোধে শান্তিনিকেতন ছেড়ে ৯ই মে উনি কালিম্পং গেলেন। এদিকে আমি কোডাইকানালে।

কোডাইকানালে মে মাসে এবার কী ফুল ফুটেছিল! কত ভালো লাগতো, উনি যদি সঙ্গে থাকতেন। কালিম্পং থেকে নিয়মিত চিঠি পাচ্ছি, কবিতাও লিখছেন, হঠাৎ ২১শে মে একটা টেলিগ্রাম এলো আমার নামে—'কোডাইকানাল' ছাড়া তাতে আর কোনো ঠিকানা নেই, আমার হাতে পড়ার আগে অন্তত চারটে বাড়ি ঘুরেছে। খোলার আগে হাত কাঁপতে লাগলো। 'কান্তির বড়ো অসুখ—' কিন্তু নিচে কান্তির নাম নেই কেন, বাইরে কেন ঠিকানা নেই? ছুটে ট্রেন ধরলুম। সময় ব'য়ে যাচ্ছে এই বোধটুকু শুধু আছে, আর কিছুই ভাবতে পারছি না। মাদ্রাজে এসে কলকাতার প্লেন ধরতে ছুটলুম। প্লেন তখন ওড়ার আগে মাঠ দিয়ে

দৌড়চ্ছে। আমি একজনকে কাঁধে ধরে ঝাঁকানি দিতে-দিতে চীৎকার করলাম, থামাও! আমাকে যেতেই হবে! আমার স্বামী মারা যাচ্ছেন!' সেই চলতি প্লেন থামিয়েই নিতে হ'লো আমাকে। কলকাতায় এসেই ওঁদের পুরোনো বাড়িতে টেলিফোন করলাম, ভালো ক'রে কেউ কিছু বললো না। আবার স্টেশন, পরের দিন কালিম্পং; পাহাড়ি পথ বেয়ে উপরে উঠছি। বাড়ির কাছাকাছি এসেছি, একজন আমাকে জিগেস করলো, 'আপনিই দক্ষিণ থেকে আসছেন?' 'হ্যাঁ—' আমি তা'কে আরো কিছু জিগেস করতে যাবো, কিন্তু তার আগেই সে কেমন একটু তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলো। বাড়ি এলাম, সেখানেও সবাই আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। কান্তি? কোথায়? কেমন আছে? ঘরে ঢুকলাম; ঘর শূন্য, বিছানা শূন্য। আর তখন—তখন বুঝলাম—এতক্ষণ যা বুঝেও বুঝিনি তা তখন বুঝতেই হ'লো।

* * * *

মা লিখছেন বার-বার, হাঙ্গেরিতে যেন ফিরে যাই। কিন্তু এই তো আমার দেশ। আর আমি কোথায় যাবো?

সনেট

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

১

নিরুদ্দেশ যাত্রা আজি হল অবসান
তোমার কুটীর দ্বারে, দাঁড়াইলে আসি
দ্বারপ্রান্তে, হাতে লয়ে দীপ, মুখে হাসি
আঁখিকোণে যুগান্তের স্বাগত আহ্বান।
পথের ধূলায় ঢাকা মোর দুনয়ান
পূত হল, মুক্ত হল অশ্রুজলে ভাসি,
আমার বয়ানে তব অলকের রাশি
ঢেকে দিল ব্যর্থতার দৈন্য অপমান।

এ কি মুক্তি! এই নব রিক্ততার মাঝে
পূর্ণ আজি অন্তরের অতৃপ্ত কামনা,
চির বিদায়ের আগে জীবনের সাঁঝে
অতীত কাহিনী কত প্রণয় যাচনা
মরীচিকা অবসানে পলায়েছে লাজে,
বন্ধনের মাঝে খুঁজি মুক্তির সাধনা।

ইটালি
১৯৩৬

২

আমার বিদায়বেলা ক্লান্ত আঁখিপাতে
তোমার মূরতিখানি জানি না কি লাগি
মুছিয়া অতীত স্মৃতি উঠিয়াছে জাগি
শেষের স্বপন মাখা জাগরণ সাথে।
জীবন-সায়াহ্নে মোর যে প্রদীপ হাতে
এলে আজি—তারি দীপ্ত শিখাস্পর্শ মাগি

নিরালা ঘরের কোণে মোর অনুরাগী
চিত্তখানি জেগেছিল কত দীর্ঘ রাতে।

আমার আহ্বান ধ্বনি দূর সিন্ধুপারে
পশেছিল কর্ণে তব? অন্তিম নিশ্বাস
বহেছিল বার্তা মোর সুদূর প্রিয়ারে?

মিলনের মালাখানি হারায়ে সুবাস
ছিন্ন শুষ্ক আজি মোর বাসর দুয়ারে,
ঘুমন্ত নয়নে জাগে মরণ-আভাষ।

পেরুজিয়া
অগস্ট, ১৯৩৬

বহুবড়বা

বিষ্ণু দে

পশ্চিমে ছাড়ে চিত্রকরেরা তুলি,
অস্তসূর্য নাজেহাল রঙে রঙে,
প্রাণহন্তারা হার মানে এই জঙে।
আকাশ ছেয়েছি হৃদয়ের সাত রঙে—
ধরেছে আকাশ তোমারই যে অঙ্গুলি,
প্রত্যহ দিই তোমাকেই দিনগুলি।

মিতালি ছড়াও দুই হাতে ডাকো পাশে
সহৃদয়জনে, কাটে দিন শত কাজে।
কর্মিষ্ঠা যে তুমি শর্মিষ্ঠা যে।
তোমার নয়নে প্রাণের প্রতিমা রাজে,
দেবযানী তুমি, প্রত্যহ প্রত্যাশে
তোমাকেই দেখি তীব্র সন্ধ্যাকাশে।

সন্ধ্যা ঘনায়, শহরের ঘুলঘুলি
রঙে রঙে ভেঙে প্রান্তর একাকার,
উদার বিরাট অনাবৃত গ্লেসিয়ার্
আকাশে আলোয় হিমালয়ে একাকার,
তারই মাঝে তুমি মুদ্রিত অঙ্গুলি
বরাভয়ে, আনি কৈলাসে দিনগুলি।

* * * *

অন্ধকার চেনা ছিল অনেক শ্মশান
আমার হৃদয়ে বহু অন্ধকার চেনাশোনা বহুকাল
অন্ধকারে বহু দিনরাত শুনেছি শূন্যের গান।

করেছে তুষার কালো রুদ্ধ হৃদ্‌স্পন্দে আনাগোনা
নরকের হিম অন্ধকারে
বিবর্ণ তুষার এই হৃদয়ের বহু পদপাতে
করেছে নিঃশেষ বহুকাল বহুবার—
প্রচ্ছন্ন তুষারদেশ প্রশান্তির শুভ্র আমন্ত্রণে বা কখনো
উজ্জ্বল কৈলাসে কোনো পার্বত্য আবেগে
কখনো বা মানসহ্রদের এক মোহমুক্ত মাঘে—
হঠাৎ বিদীর্ণ বক্ষ, হিমশিলা চূর্ণ চূর্ণ স্রোতে,
হঠাৎ তুষার-চোরা ভেঙে যায় আবর্তে গভীর,
হঠাৎ তুষারদ্বীপ ওঠে জেগে, অসীম শূন্যতা
ওঠে জেগে, নরকের অপমানে লেগে
উচ্চকিত শীত দেখি গুপ্তচর হৃদয়ের অঙ্গার নিদাঘে।

তবু এ কী অন্ধকার! (এ কোন্ কটাহ
মান্তোভানি! বলো তুমি) প্রাণের প্রবাহ
স্রোতস্বিনী, সবুজ, শ্যামল
প্রান্তর, পাহাড়, দেওদারবন তিমিরমগন সব পুড়ে' অন্ধকার
অসহ্য অঙ্গার সব আসমুদ্র হিমাচল
একমুঠি ক্ষার নীল যমুনার জল দগ্ধ শমী অন্ধকার
অস্থির সিন্ধুর তীর, গঙ্গা বিড়ম্বিত আজ
কর্ণফুলি ভিক্ষাঝুলি কলকাতার আদিগঙ্গা ভিখারীর হাড়
কোন্ রক্তরাগে আঁকা ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার মরণে স্তম্ভিত আজ
নির্চেরাগ মিলিত পাপের
এ শ্মশানে সীমা নেই, এ তো নয় দাহদীপ্ত ঘাটের মশান
এ আকাশ নীরন্ধ্র আকাশ
পাপের মিলনে ভয়ঙ্কর মত্ত অন্ধকার চলে জাঠা

অন্ধ নেক্‌ড়ের পাল
চিনি না করাল এই মহাকাশ দগ্ধ অন্ধকার।

উপমায় খুঁজেছি সান্ত্বনা
ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ
গান্ধীজির অস্পষ্ট উষায়
সামন্তের সন্তের শেঠের নাটকীয় উষসীর বর্ণ সমারোহে
তোমার নির্মোহ ডাকে বিলম্বিত তানে
পেয়েছি উপমা সজ্ঞে
উপমার স্রোতে দেখেছি তো অন্তঃশীলা
ঘূর্ণাবর্তে মাতে, মাতে হাজার খাঁড়িতে
মোহানার শত মোহ স্রোতে আসন্ন মুক্তিতে দিশাহারা—
স্বপ্ন বাঁচে কর্মে
কর্ম দুঃস্বপ্নে অস্থির।

মিলাক্ আমারও সত্তা শত ঘূর্ণাপাকে, একাকার
টলোমলো সমুদ্রের একরাশি জলধারা হাজার হৃদয়
হোক্ হোক্ শত আত্মম্ভরিতায় কানা নদী মজা খাল
সবাই সবাই আজ খুঁজে পাক্ কপিলের গুহা,
মহিমায় মিলাক অণিমা কমলে কামিনী কিম্বা
কালীয়দমনে।
সমষ্টির গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
ধার দিক সবাকেই বিপ্লবীর লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?

তাই তো তুলনা খুঁজি অদ্বৈত সাধনে তাই সমুদ্রের ধাই
এদিকে হৃদয় চিরদ্বৈতাদ্বৈতে গায় নীল যমুনার তীরে অণুর সঙ্গীতে

বিজন তমালতলে অসংখ্যের বংশীরবে প্রাণের বৈভবে
মিলন বিরহে চিরবাহুবন্ধ রাধা।

কিম্বা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি সুরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ পায়
কানাড়া কিম্বা মেঘমল্লারে বা মালকোষের লম্বিত বাহুতে
যমুনা! সমুদ্রে দাও ছায়া নাও
মুরলীমায়ায় দাও নীল তমালের বনছায়া
চিরবিরহীর বাহুবন্ধ চিরমিলনের সাধা
কোমল গান্ধার! জাগো বহুর বাড়বে
ব্যাপ্ত দেয়ালিতে মেল সত্তার অগম অন্ধকার
অন্ধকারে আনো কোজাগরী।
ব্যক্তিস্বরূপের দীপে দীপে জ্বালো তারায় তারায় রূপের আরোপে
বিরহে মিলন আর দুর্ভিক্ষে বসুধা
সূর্যে চন্দ্রে মানুষে মানুষে গোষ্ঠীর আসর।

* * * *

স্বরে স্বরে আর ফাঁক নেই
স্বপ্ন আমার মেলালুম
তোমার অন্ধ বাহুতেই
বন্ধু, এতে দেমাক নেই
মিলে' প্রাণ পাবে বেমালুম।

তুমি ছাড়া আমি অগোচর
তুমি কর্মের কার্বন্
তুমি বিনা আমি ফাঁকা ঘর
আকালের গ্রামে পার্বণ
নীরন্ধ্র সুর, ফাঁকা স্বর।

আমি ছাড়া তুমি উত্তাল
নিশি পাওয়া নেশা, দুর্বার
ম্যামথ ছুটেছে চারিদিক
ঝড় যেন এক, বেগ তার
প্রাকৃতিক, ও অমানুষিক।

তোমাতে আমাতে নেই মিল
তবু তুমি আমি একাকার
তোমার বাহুতে তোলো খিল
আমার হৃদয়ে খোলা দ্বার
দিনে রাতে গড়ি এ নিখিল।

* * * *

প্রকৃতিতে মিলে থাকে আলো অন্ধকার
চক্রে এক অনাদ্যন্ত, বোধ্যদুর্বোধ্যের অতীত
স্ত্রী পুরুষ থাকে যথা, উভয়ত সম্বন্ধে একক
জৈববিশ্বে অপঘাতও স্বভাবে নিয়ত, আদিঅন্তহীন,
সমষ্টি ব্যষ্টির শত শত আপতিক জৈব সমাধানে।

আমারও জীবন করে হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত
অহর্নিশি বিপ্রলম্ভা, সদা করে নামসঙ্কীর্ত্তন
জীবনের, জীবনের আশা
অন্বিষ্টের দীক্ষা আনে কানের কিনারে, প্রাণে
স্থিতি ও গতির
সঙ্গতে গম্ভীর এক ধ্রুপদ বন্দনা যেন জীবনেরই পাখোয়াজে
জীবিকার আসরে আসরে।
তবুও অন্বিষ্ট কেন

অন্বেষার পথে পথে, লালদীঘিতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে
দিশাহারা, সপ্রতীক্ষ, ক্লান্ত, উদাসীন ?
জানি না কোথায় শেষ এ প্রচণ্ড জোয়ার-ভাঁটার
ঘাটে ভাঙা ট্রাফিকের, কিম্বা বুঝি শোভাযাত্রী ঢেউ।
এ তো নয় সমুদ্র বা নদী কোনো প্রাকৃত উপমা
এই ব্যক্তি সমাজের সীমা পার থেকে অগোচর
শোথমত্ত জলেরই গভীরে এই সাঁতারু হাতেই
সীমা বুঝি পরিমেয়
রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রচণ্ড আশায়
স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্রূণস্থ মাতৃত্ব যেন
জীবনমৃত্যুর ব্যষ্টি সমষ্টির ঘূর্ণী কিম্বা বন্যা উন্মুখর স্রোতে
জীবনেরই আশা, শুধু আশাবাদ নয়,
জীব জগতের সুস্থ নিয়মে যা স্বাভাবিক
যেন কাঠ খড় কুটা কিম্বা উপড়ানো বট কিম্বা অশথের চারা
শূন্য আশাবাদে কিম্বা দুঃখের সন্ত্রাসে ভাসে তরল দ্বন্দ্বের ছন্দে
প্রাকৃতিক আত্মদানে যেন কোনো দামোদর অজয়ের বানে
সমষ্টির বৃত্তে ব্যক্তিহীন অনর্থক খাণ্ডবে নিঃশেষ—
নয় সে বড়বা,
এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক
সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি

* * * *

সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে—
অক্ষয় সে দিন !
বলেছিলে সেই যে কথা কানে কানে
অনেক তারার গানে গানে
ধলভূমে সেই পলাশবনের স্তব্ধদীঘির নিদ্রাবিহীন তারার নিচে
—নিচেও তারা,

চোখের তারায় আকাশ এনে
লাল মাটিতে আকাশ হেনে

সেদিন জীবন হারিয়েছিল স্থির সীমানা
জীবনমরণ রক্তে জানা কথায় জানা কথার ফাঁকে কথার পাকে
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে জানা
হাতে-হাতের মুখর ডানা সব সীমানা উড়িয়ে দিয়ে
তারার গানে
পলাশবনের মাটির টানে তোমার আমার দুইটি পাখী—
একটি পাখীই একটি সদসৎ
ডাইনে বামে এক তালাতেই পেয়েছিল যতি।
সোহবিভেত্তস্মাদ্
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ
আজকে সে গান—প্রেমের প্রসাদ
আজও সে গান
মাটির মানুষ ইন্দ্রজালে ডানা মেলায় তারার গানে
লক্ষ তারার তালে তালে রাতের তারায়
প্রাণের ধূপে শহরতলীর ভয়ের কাঁটায় গ্রামশহরের রোমকূপে
মাটির গন্ধে অশ্রুবাষ্পে নষ্টচন্দ্রে
নেভায় কোটি অণুর দগ্ধ নেতি।
ডানা মেলায় রুদ্রসূর্যে নূতনপ্রাতে উগ্রচন্দ্রে
কোটালবানের মেঘমন্দ্রে বিদ্যুতে বিদ্যুতে
মেলায় মেলায় বাজে বাজে আবেগ আমার
মাটির ভিড়ে পাহাড়তলীর হাজার টিলায়
লক্ষ লোকের জোর আওয়াজে
সূর্যে ছড়ায়
ছড়িয়েছিল যেমনটি সেই দিনও

তোমার আমার মিলন হবে বলে'
তোমার আমার মিলন অশেষ
মধুর তোমার শেষ যে না পাই
একাকী বিভেতি
সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে
সেই একতায় নিঃশেষ হোক্ এক ও বহুর নেতি।

ডায়েরি

ষোলো

অমিয় চক্রবর্তী

যে-সংসারে বাঁকা পাতা ঘুরিয়ে আঙুল
বনের কিনারে হেলে চায়,
হাওয়ায় শৈশবগন্ধী মাটির সুদূর ;
কত রৌদ্র এল গেল ;
যে-জীবনে অফুরন্ত প্রাণের কথায় নানা দেশে
নানা রঙে, বেশে, লোক ভাব করে ;
একই জাদুকর শিল্পী হেমন্তের রং-ভরা মেঘ
মিশরে মার্কিনে আনে, ভরে দেয় পত্রময় বনে
বর্ণের আবির-ঝরা ;
নীল ঢেউএ সারি নৌকা, গানে-ভরা ড্যানুবের তট,
বাজনা বাজে জলে জলে যমুনায় মীরার ভজন ;
দেখি ট্রেনে এক-দৃষ্টে বেবি চায় মার দিকে,
হয়তো বা লণ্ডনে ভিড়ে, কিম্বা লক্ষ আলোর মার্কিনে,
—তবু প্রাণ কেঁপে ওঠে ;
লাল-নীল বিদ্যুৎ অক্ষরে
রাত্রির শূন্যের শীর্ষে চিহ্নমালা জ্বলে মোছে শুধু,
তারি তলে চলে যারা জনসাধারণ তুমি আমি
তারা বা সে একজন কেউ,
বাড়ি ফেরে, কিম্বা যায় রুগ্নালয়ে বোনের অসুখ,
কিম্বা ছবি-ঘরে ভিড় করে ;
বিমিশ্র সুখের স্বপ্নে কারো ব্যথা যৌবনী সন্ধ্যায়,
কারো দৃষ্টি দিব্যাগ্নিতে জ্বলে ওঠে,
সমতা সংগ্রামে নামে বীর নিয়ে শান্তির আগুন ;
মাঠে রোদে জলে চাষ, কাজের সূতোয় গ্রন্থি-বাঁধা ;

কত রাত্রি দিন এল গেল ;
সেই এক অভিযাত্রী বহুবিধ পৃথিবীতে
সুন্দর দুর্দিনে
যুদ্ধ আর বারুদের গোলমাল ভরা
অন্ধকার জনশ্রুতি ঘেরে চতুর্দিকে আরবার।
সম্প্রদায়ী, সাম্রাজ্যের রং-ঘৃণা ব্যবসায়ী ঘোরে,
উচ্চ-নীচ জাত-মানা দল
রক্তমাখা মূর্তির পূজারি ;
যার আছে আরো বেশি কাড়ে, ভীরু দেয়,
সংঘ বেঁধে কল্যাণ জানে না যারা।
এরি মধ্যে নক্ষত্র আদিম,
ধ্রুবত্বের তারা ওঠে রবীন্দ্রনাথের মহাবাণী,
মৃত্যুজয়ী গান্ধীজিকে হেনে
অমর প্রেমের শক্তি আরো বেশি ভুবনে ছড়ালো
—এই সব দেখি দূরে এসে ॥

এলেজি

বাণী রায়

"Cover her face ; mine eyes dazzle :
She died young."

The Duchess of Malfi

মৃত্যুরে দেখেছি আমি শ্বাপদের রূপে।
মৃত্যু বারবার জীবনের উপহার
করেছে হরণ।
দেখেছি নির্লজ্জ সেই বুভুক্ষু মরণ।
বিকশিত জীবনের দল
নিষ্ঠুর নখরাঘাতে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত।

শিশুর শিয়রে তার ভয়াল প্রহরা ;
যৌবনের শয্যাতলে মৃত্যুর কণ্টক।
স্তব্ধ-ভীত আঁখি মেলি দেখেছি মরণ
আশ্বাস-বিশ্বাস নিত্য করেছে হরণ।

তোমার কুন্তল কালো,
আরো কালো চোখ,
বিনাহেতু লজ্জানত চোখের পলক।
আইভরি-ম্লান ভালে কুঙ্কুমের টিপ,
আরক্ত অধর দুটি প্রবালের দ্বীপ,
মানস-মুকুতা ঝরে চিত্ত-উর্ম্মি থেকে,
বঙ্কিম কটাক্ষ যায় বাঞ্ছিতেরে দেখে।
—মোহিনী কিশোরী তুমি।
তোমারো শিয়রে দেখিলাম কালো দুটি বাদুড়ের পাখা,
গৃধিনীর লুব্ধ নখ।
মর্ম্মর ফলক তোমার বুকের বেদী ;
ফুটিল গোলাপ,
মৃত্যুর রক্তিম পুষ্প, লুব্ধ নখাঘাতে।
কালো চুলে জ্বলে আলো তবু ক্ষণে ক্ষণে !
সজাগ প্রহরী সে তো বেহুলা-বাসরে।
ক্লান্ত সুপ্ত সেবীদল ; নিতন্দ্র প্রদীপ ;
জ্বলে প্রদীপের তলে প্রবালের দ্বীপ
মধুর বঙ্কিম হাস্যে।
সে কি উপহাস ?
কালের কবলশূন্য আজো দেহতট,
পেল না কালের ছোঁয়া,
—তাই এত হাসি ?

সমালোচনা

ছন্দোবিজ্ঞান, তারাপদ ভট্টাচার্য। গ্রন্থকারের পক্ষে বি. জি. প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত। চার টাকা।

'কিন্তু আরো কত ভালো হতে পারত'—এ-কথা বারবার মনে হয়েছে আমার সম্প্রতি প্রকাশিত 'ছন্দোবিজ্ঞান' বইখানা পড়ে, যদিও স্বীকার করবো একটুখানি হাতে করেই বুঝতে দেরী হয়নি এরকম একখানা বইয়ের প্রয়োজন ছিল।

দ্বিধাগ্রস্ততার কারণটুকু খুলে বলি। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা হয়ত হয়নি এখনো। যেটুকু হয়েছে প্রায় সবই গত কয়েক বছরের মধ্যে। অবশ্যি পুরোনো ব্যাকরণ ইত্যাদিতেও ছন্দ সম্পর্কীয় দু'এক অধ্যায় চোখে পড়ে। কিন্তু কতগুলি মামুলী পদ্যছাঁদের নাম আর দৃষ্টান্ত ছাড়া তাতে বেশী কিছু পাওয়া ভার। বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা তার মৌল রীতিনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু আলোচনার সূত্রপাত বোধহয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছন্দ স্বরস্বতী' প্রবন্ধে। কিন্তু ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' প্রথম উল্লেখযোগ্য বই। এর পরে এ বিষয়ে নানাদিক থেকে আগ্রহ বাড়তে থাকে—আর তাই মাত্র ক'বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', দিলীপকুমারের 'ছান্দসিকী', প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', মোহিতলালের 'বাংলা কবিতার ছন্দ', এ সবের প্রকাশ। ইতিমধ্যে অমূল্যধনবাবুর আর-একখানা বই পেয়েছি আমরা, 'Studies in Rabindranath's Prosody', এ ছাড়া তাঁর এবং আরো অনেকের ছন্দো-বিষয়ক যে-সমস্ত প্রবন্ধ এ-ক'বছরে পত্রিকাদিতে বেরিয়েছে তাও নিতান্ত সামান্য নয়। সে হিসেবে মনে হয়, ছান্দসিকদের ক'বছরের এই আলোচনা গবেষণার ধারা লক্ষ্য ক'রে বাংলা ছন্দের রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্রাকারে গ্রথিত করার সুযোগ আজ যা হয়েছে আগে কখনই ছিল না। অবিশ্যি সুযোগ আছে বলেই দায়িত্ব কম নয়। আজকে তাই কেউ ছন্দোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে আশা করা স্বাভাবিক, পূর্ববর্তী ছন্দোবিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষার ভালোমন্দ ফলাফলগুলোর অন্তত তিনি সদ্ব্যবহার করবেন।

'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' নিয়ে গবেষণা করবার সময় অমূল্যধনবাবুর হাতে সামান্য উপকরণই ছিল; 'ছন্দোবিজ্ঞানে'র গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য এতদিনে গড়ে-ওঠা আরো অনেক উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন। তাই, আশা করা অন্যায় নয় যে ছন্দো-মীমাংসার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পক্ষে কোনো মৌলিক আবিষ্কার সম্ভব হোক আর না হোক, তিনি অন্তত পূর্ববর্তী গবেষণাদিপ্রসূত মতবাদগুলির যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা বিবেচনা করে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে তা থেকে গ্রহণ বর্জনের ব্যবস্থা করে ছন্দোবিজ্ঞানের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সে-কাজ কি আশানুরূপ এগিয়েছে? সংশয় থেকে যায়।

বলতে দ্বিধা নেই, তারাপদবাবু তাঁর স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধেগুলি কাজে লাগাতে বিশেষ সচেষ্ট। বইখানাকে যথাসম্ভব সুসম্পূর্ণতা দেওয়া যে তাঁর অভিপ্রায় তাও খুব স্পষ্ট। তিনি যে শুধু নিজের কতগুলি মতবাদ প্রকাশ করেছেন তাই নয়, বিরুদ্ধ মতবাদ থাকলে অনেক ক্ষেত্রে তারও সমালোচনা করেছেন—অপ্রমাণ করবারও চেষ্টা করেছেন। প্রায় সমস্ত প্রধান বিষয়েই তিনি আলোচনাপ্রয়াসী; সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে সুরু করে বাঙালী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য—তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী সব কিছুই আনতে হয়েছে তাঁকে। তারপর, বিশেষ করে এ বইয়ের যা আকর্ষণ, তা হল শুধু পদ্যের নয়, দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে গদ্য-কবিতা এবং ছন্দোবদ্ধ গদ্যের আঙ্গিক, রীতিনীতি বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। এ চেষ্টা হয়ত অসম্পূর্ণ, গদ্যছন্দের কতগুলি অপেক্ষাকৃত সাধারণ লক্ষণের বর্ণনা ছাড়া বেশী কিছু হয়ত নয়, তবু মনে রাখবো এটুকু আলোচনাও ইতিপূর্বে এ রকমের কোনো বইতে সাহস করে কেউ করেননি (Journal of the Department of Letters-এ অমূল্যধনবাবুর প্রবন্ধ দুটি আরো অসম্পূর্ণ এবং মূলত পর্বাঙ্গবাদের আরো কিছুদূর অনুসরণ-প্রচেষ্টা)। আর এ বই সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবার সবচেয়ে বড় কারণ তারাপদ বাবুর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক; আলোচনার ধারা নিয়ন্ত্রণ এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী পর-পর অধ্যায় সাজানো যুক্তিসম্মত। 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্রে'র পরে এ আদর্শ বিশেষ করে এই বইতেই রক্ষা করবার চেষ্টা দেখা যায়। 'ছন্দো-বিজ্ঞান' বক্তব্য বিষয়ে অনেক সময় তার পূর্ববর্তীর বিরোধী, কিন্তু প্রকরণে তারই অনুগামী।

ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা—আর বইটির বারবার উল্লেখ করেছি ইতিমধ্যে, তা থেকে এতক্ষণে বুঝে নেওয়া আশ্চর্য নয়—'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র' একটি সার্থক রচনা এবং পদ্য সম্পর্কিত প্রায় সব ছন্দ-জিজ্ঞাসারই মীমাংসা এ থেকে হওয়া সম্ভব। যদিও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন, একটু পরীক্ষা করলে বোঝা যায় আপাতদৃষ্টিতে যত অনৈক্যই থাক, প্রকৃতপক্ষে সে সব মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকা সম্ভব, আর বেশীর ভাগ বিরোধ হ'ল পরিভাষা বা নামকরণ ঘটিত। এ থেকে আমার কখনো-কখনো সন্দেহ জেগেছে পদ্যছন্দ সম্বন্ধে এর পরে খুব একটা অভিনব আবিষ্কারের কোনো ক্ষেত্র আছে কিনা। সে যাই হোক, তারাপদবাবুর নিজস্ব ছন্দোমীমাংসা-গুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখনই কোনো সিদ্ধান্তের চেষ্টা সম্ভব নয়। তাঁর নির্দেশিত সূত্রগুলি থেকে যদি আজও-অমীমাংসিত কোনো ছন্দ-জিজ্ঞাসার সদুত্তর, কোনো মীমাংসিত প্রশ্নের সরলতর উত্তর পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তারা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু অন্যান্য ছান্দসিকদের অনেক বহুপরীক্ষিত মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর কোনো কোনো মন্তব্য বিস্ময় না এনে পারে না। সন্দেহ থেকে যায় তিনি হয়ত সে সব মতবাদ এবং তাদের সমর্থনে ছান্দসিকদের যুক্তি ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি—তা না করে যখন নিজ মতামত ব্যাখ্যা করতে গেছেন, তাতে জটিলতা বেড়েছে বই কমেনি। না হলে কী করে তিনি 'অক্ষর'কে সর্বদা স্থিরমাত্রিক বলতে পারলেন, যদি তিনি তাঁকে অমূল্যধনবাবুর মতো ইংরাজি 'syllable'-এর তুল্যার্থে ব্যবহার করতে প্রস্তুত? কিন্তু সব syllableএরই কি সব অবস্থায় উচ্চারণকাল সমান? ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকাল কি আমরা মোটেই অনুভব করি না? 'মর্ম' কথাটির 'মর্'কে দু'মাত্রা দিতে হ'লে তাকে দু'অক্ষরে বিশ্লিষ্ট ক'রে বাগ্-যন্ত্রের দুটি পৃথক প্রয়াস কি করাই চাই? ধ্বনির প্রতি যে-সচেতনতা মাত্রাবৃত্তে 'ঐ' অক্ষরটির ধ্বনি 'ও' এবং 'ই'পর-পর এই দুই ধ্বনির ফল মনে করতে পারে তা নিয়ে প্রবোধবাবুর অক্ষরগণনাকে আনাড়ি চক্ষুসর্বস্বতার অপবাদ দেওয়া সাজে কি? এত জটিলতা সৃষ্টির পরেও কিন্তু তারাপদবাবুকে শেষে বলতে হয়েছে, 'প্রতিটি খাসাহত অক্ষর হইতেছে দেড় মাত্রা'—(পৃঃ ১৮২)।

এরকম আরো অনেক অসামঞ্জস্যের কথা মনে হয় যখন দেখি উপপর্ব বিলাসী ১৬৭ পৃষ্ঠা বিদ্রূপ করে ৫৬ পৃষ্ঠাকে; যখন দেখি ২২১ পৃষ্ঠার স্বীকৃতি 'পাঠক ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গীতে পাঠ করিতে পারেন', ১০৮ পৃষ্ঠার মন্তব্য, 'বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা ঢঙ্গে একই কবিতা পড়া উচিত নয়' ভুলে যাওয়ার ভাণ করে। এ সব দেখে আমার ধারণা এই যে অন্যান্য ছান্দসিকদের প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারাপদবাবুরও বিরোধ তত বেশী নয় যতটা তিনি নিজে ধরে নিয়েছেন—বিরোধিতা অনেক সময় তাঁর নিজের মধ্যেই। অমূল্যধনবাবু যদি তিনটি ঢঙের উল্লেখ করে থাকেন তিনি

তাকেই বলেছেন তিনটি ভঙ্গি এবং তাঁর মতে সেই তিন ভঙ্গি থেকে বাংলা ছন্দের ত্রিজাতীয়তা। যাই হোক, আমার আরো বিশ্বাস এই মতবিরোধিতার বিলাসই তাঁর বাঞ্ছিত সার্থকতার পথে অনেকটা বাধা হয়েছে। সে বিলাসিতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, বরং আপাতবিরোধগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা এবং বিশেষ করে প্রকৃত, আজও-অমীমাংসিত সমস্যাগুলির দিকে সম্পূর্ণ মন ব্যাপৃত রাখতে পারলে ছন্দোবিজ্ঞানীর কাজে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। পদ্য-ছন্দের আজও-অমীমাংসিত সমস্যা বলতে কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি : পয়ারের পর্বে মাত্রাসমকতার প্রমাণ, চরণদৈর্ঘ্য নিরূপণে পর্ব আর পদের আপেক্ষিক গুরুত্ব, ছড়ার ছন্দে হ্রস্বস্বর পর্বের সম্ভাবনা, পদ্যে amphibrach ভঙ্গী সম্ভব করার প্রচেষ্টা, ছন্দে নানা ভঙ্গীর মিশ্রণ প্রচেষ্টা—ইত্যাদি। তা ছাড়া গদ্যছন্দ, ভাবছন্দ এদেরও প্রায় সব কিছুই এখনও রহস্যময়। আর এ সব রহস্যই বিশেষ করে ছন্দোবিজ্ঞানীর জন্য অপেক্ষা করে আছে।

তারাপদবাবুর আলোচনা যে অন্তত কতগুলি বিষয়ে চিন্তার দ্বার খুলে দেয় সে কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। প্রবহমাণতা এবং তার উপর চরণ-প্রান্তিক খণ্ডপর্বের অভাব, ভাব-যতি এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যতির সম্পর্ক, সাধারণ পর্ব ও বিশেষ পর্বের মধ্যে বৈষম্য, গদ্যছন্দের আঙ্গিক কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনায় মৌলিকতার স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আপশোষ না করে পারি না আরেকটি দরজা খুলতে না খুলতেই তিনি বন্ধ করলেন কেন এ কথা বলে যে 'গদ্যকবিতা ছন্দোহীন' (মুখের কথার ছাঁদ উদাহরণ দিয়ে কত দেখালেন রবীন্দ্রনাথ—মনে লাগে নি?)। যাই হোক, আগেই বলেছি তারাপদবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক (কিন্তু, 'বলবৃত্তে পর-পর তিনটি প্রবল শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকিতে পারে', এ কোন বিজ্ঞান?) এবং এক হিসেবে তাঁর অনুসন্ধিৎসাও একটু অতিরিক্ত রকমের বেশী; আশা করা অন্যায় নয় আরো অনেক ছন্দ সমস্যায় তিনি আলোকপাত করবেন ভবিষ্যতে।

একটা কথা বলে শেষ করি। পাঠ্য বই হিসেবে বইটির বিশেষ উপযোগিতা থাকবার সম্ভাবনা—তা হয়ত আর-একটু বাড়তে পারে ভবিষ্যতে সমালোচনার অংশগুলি ফুটনোটে বসিয়ে দিলে, সম্ভব হলে আরো সংক্ষিপ্তাকারে। কারণ, যদিও মোহিতলাল-সুলভ অতিরিক্ত আস্ফালন নেই, তবু সমালোচনার অংশগুলি পাঠ্যবই হিসেবে একটু বেশী দীর্ঘ হয়নি কি?

তাপসকুমার ভৌমিক

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

চতুর্দশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা] চৈত্র ১৩৫৫ [ক্রমিক সংখ্যা ৬১

সমালোচক এলিয়ট

অমলেন্দু বসু

গদ্য ও পদ্য রচনায় সব্যসাচিত্ব ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে ড্রাইডেন এবং ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সঙ্গেই এলিয়টের তুলনা চলে। অন্যান্য কারণেও এই দুই লেখকের সঙ্গে এলিয়টের সম্বন্ধ নিকট। ১৯২২ সালে ড্রাইডেনের উপরে এলিয়ট যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা আধুনিক সাহিত্যে ড্রাইডেন-আলোচনার মোড় ফিরিয়েছে। আর্নল্ড সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনা এলিয়ট একাধিক প্রবন্ধে করেছেন, প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা উক্তি তাঁর গদ্য রচনায় ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র। ড্রাইডেন, আর্নল্ড ও এলিয়টের পারস্পরিক সম্বন্ধ কেবল মানসিক নয়, আত্মিকও।

পদ্য যেন অন্তত গদ্যের মতো সুলিখিত হয়—এই চমকপ্রদ উক্তি করেছেন জনৈক আধুনিক লেখক। চমকপ্রদ,—কারণ অনেকেরই ধারণা যে পদ্যই জাতে উঁচু। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বেশ কিছুকাল অবধি ইংরেজি সাহিত্যে দেখা গেল পদ্যরীতি হ'য়ে পড়েছে শিথিল, মৃদুধী, ভাবালুতায় অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে গদ্যে, বিশেষত হেনরি জেমসের রচনায় সচরাচর প্রকাশ পেয়েছে ভাবঘনতা, যুক্তিপ্রাখর্য, সংহত রীতি। সুতরাং কলাগুণ পুনরুদ্ধার করার জন্য পদ্যকে গদ্যের আদর্শে চলতে হল। গদ্যরীতি ও পদ্যরীতির যে-কৃত্রিম এবং অপকারী

ব্যবধান উনিশ শতকী সাহিত্যে প্রবল ছিল—ওয়র্ডস্বোয়ার্থের বিখ্যাত মত সত্ত্বেও—সেই ব্যবধান আজকের দিনে শীর্ণ হয়ে গেছে, কারণ পদ্য সুলিখিত হচ্ছে গদ্যের মতোই। যা হয়েছিল ড্রাইডেনের আমলে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে এলিয়টের যুগে।

গদ্য ও পদ্যের হরিহরাত্মার যে-উল্লেখ এখানে করছি তা শুধুই রীতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। গদ্য ও পদ্যের অন্তর্লোক অবিভিন্ন এমন কথা বলছি না। গদ্য-লেখক এলিয়ট কবি-এলিয়টের তুল্য বা অধিক সে-কথা বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়, যদিচ এমন আলোচনা আশুসম্ভব। প্রধান কথা এই যে এলিয়টের গদ্যরচনা গদ্য হিসেবে সার্থক, আধুনিক রুচিপন্থী, তাঁর চিন্তাধারার মূল্যবান ভাষ্য। সুতরাং কবি-এলিয়টকে সম্মান করার সময়ে তাঁর গদ্য রচনাবলীর মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করারও প্রয়োজন আছে। এলিয়টী সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য ততখানি পরস্পর-পরিপূরক যতখানি ড্রাইডেনের বা আনর্ল্ডের সাহিত্যে।

২

এলিয়টের গদ্য ড্রাইডেনের ও আনর্ল্ডের গদ্যের মতোই বিচার-ধর্মী, শুধুই সৃষ্টিপ্রেরণায় উপজাত নয়। ড্রাইডেনের সঙ্গে এলিয়টের তুল্যতা রচনারীতিতে; উভয়েরই রীতি নিরপেক্ষ। আর্নল্ডের সঙ্গে তুল্যতা সমালোচনা-কর্মের ধারণায়। এলিয়ট বলেছেন:

> আমার অনুমানে চিন্তার সেই বিভাগের নাম সমালোচনা, যা এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজে—'কাব্য কী, কী তার উপযোগ, কোন ইচ্ছা সে মেটায়, কেন আমরা কবিতা লিখি, পড়ি, আবৃত্তি করি; কিংবা, যদি আমরা চেতন বা অচেতন মনে অনুমান করি যে এ-সব আমরা জানি, যা কাব্যেরই মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়। এ ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য সৎসমালোচনার সম্ভব; কিন্তু এ-সবেরই অঙ্গীকারে সে অধিকারী। কাব্যের যথাযথ সংজ্ঞা নিয়েই যদি কথা হয়, তাহ'লে, অবশ্য, সমালোচনা কখনোই বলতে পারে না

> কাব্য কাকে বলে; কিন্তু এ-রকম কোনো সংজ্ঞার সন্ধান পেলেও, তার উপযোগ কোথায় আমি জানি না। কবিতার চরম মূল্যায়নেও সমালোচনা পৌঁছতে পারে না কখনো। তবে সমালোচনার দুটি ভাবয়িত্রী সীমা দেখতে পাই; দুই সীমায় দুটি প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজি: একদিকে, 'কাব্য কী?', অন্য দিকে, 'এই কবিতাটি ভালো?'
>
> (*The Use of Poetry and the Use of Criticism*)

সমালোচনা-কর্মের যে-দুই শাখার নির্দেশ এলিয়ট এখানে দিয়েছেন তা সাধারণ্যে সুবিদিত। সমালোচকমাত্রেই বিশেষ গ্রন্থ বা লেখকের মূল্যায়ন ক'রে থাকেন। কিন্তু যেহেতু কাব্যের প্রকৃতিচিন্তার সমস্তটাই ভাবয়িত্রী আলোচনা, ফলত দার্শনিক প্রচেষ্টা, অতএব এই অনুসরণের শেষপ্রান্তে সমালোচক কোনো সর্বব্যাপী এথিক বা নীতিতত্ত্বের সন্ধানে আকৃষ্ট হন। তিনি তখন এই জ্ঞানে পৌঁছন যে সাহিত্যকর্ম জীবনের বিচিত্র এবং জটিল অভিজ্ঞতার এক অংশ মাত্র। যে-নীতিতত্ত্ব জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলত, সমালোচনার পরিধি সর্বস্পর্শী হয়ে পড়ে। সমালোচনার এই ব্যাপ্ত ধারণা এলিয়টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোলরিজ সাহিত্যবিচার থেকে পৌঁচেছিলেন দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায়; কার্লাইল, রস্কিন সমাজতত্ত্বে এবং রাজনীতিতে। এমনকি, অস্কার ওয়াইল্ডের প্রবন্ধাবলীতেও একটি ব্যাপক নীতিতত্ত্বের ইঙ্গিত মেলে। উনিশ শতকী ইংলণ্ডের সমালোচনার এই বহুবিস্তৃত ধারণার, এবং সেই ধারণার প্রয়োগের, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ম্যাথ্যু আর্নল্ড ব'লে এ বিষয়ে আনর্ল্ডের সঙ্গে এলিয়ট একাত্ম। এলিয়ট নিজেই বলেছেন, "আমরা এখনো আর্নল্ডী যুগেই আছি"; এবং যেহেতু এলিয়টের গদ্যরচনায় বারবার আর্নল্ড খণ্ডনের তীক্ষ্ণ প্রয়াস দেখা যায়, সেই কারণে বুঝতে হবে যে এলিয়টের উপরে আর্নল্ডের প্রভাব—নঙর্থকভাবে হলেও—প্রবল।

এমনকি, আর্নল্ডের ও এলিয়টের প্রবন্ধাবলী বা গ্রন্থাবলীতে শিরোনামা নির্বাচনেও উভয়ের চিন্তাপ্রণালীর সাদৃশ্য ধরা পড়ে। উভয়েই এক মূল জীবনবেদের কষ্টিপাথরে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ-নীতি, রাজনীতিকে যাচাই করতে চেয়েছেন। এই জীবনবেদ উভয়ক্ষেত্রেই একই নীতিসন্ধানী মানসিকতা থেকে উদ্ভূত। রগ্‌বির প্রথিতযশা শিক্ষকের সন্তানে এবং পিলগ্রিম ফাদারের বংশধরে একই নীতিতত্ত্বের রক্তধারা প্রবাহিত। উপরন্তু, এই জীবনদর্শন যে-প্রত্যক্ষরূপ নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তাকে উভয়েই বলেছেন "কাল্‌চার"। আর্নল্ডের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "কাল্‌চার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি"। এলিয়টের এক গ্রন্থের নাম "আফ্‌টার স্ট্রেঞ্জ গড্‌স্", যাকে তিনি বলেছেন "এ প্রিমার অব মডর্ন হেরেসি", এবং হেরেসি বস্তুটি অ্যানার্কিরই অপর রূপ। "কাল্‌চার" বিষয়ে এলিয়টের নূতন গ্রন্থেও আর্নল্ডের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র প্রকট, কেননা ও-গ্রন্থেরও আরম্ভেই আর্নল্ডকে খণ্ডন করতে তিনি চেয়েছেন। এলিয়টের ধারণাবলী বহুল পরিমাণে আর্নল্ডের ধারণার বিরোধী হ'লেও স্পষ্টতই ঐতিহ্যপ্রভাব, এবং চিন্তাজগতে ঐতিহ্যের স্থান এলিয়টী মতেই অত্যুচ্চ।

আরো এক বিষয়ে এ-দুজনের তুল্যতা লক্ষ্যণীয়। এলিয়ট বলেছেন, সমালোচনার প্রথম সীমার প্রশ্ন হ'লো: "কাব্য কী?", আর্নল্ড কখনোই প্রত্যক্ষভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করেন নি। কাব্য কী, তা যদি জানতে চাও মহৎ কাব্যের উদাহরণ অধ্যয়ন করো। সমালোচনার দ্বিতীয় সীমার প্রশ্ন, "এ কবিতাটি ভালো?", এর মীমাংসাতেই, আর্নল্ডী মতে, প্রথম সীমার প্রশ্নের সমাধান নিহিত। এলিয়টও বলেছেন: "আমার ইচ্ছা নয় যে কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে দূরকল্পনা দ্বারা আমি কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করি।" আবার বলছেন: "কাব্যের প্রকৃতি বিষয়ে, কাব্যের নির্যাস যদি কিছু থাকে সে-বিষয়ে, চূড়ান্ত ভাবয়িত্রী আলোচনা নন্দনতত্ত্বের

অন্তর্গত। সে আলোচনা কবির পক্ষে, কিংবা আমার মতো স্বল্পযোগ্য সমালোচকের পক্ষে অবান্তর।" এই বিচারভঙ্গির আকর্ষণ এর সহজবোধ্যতা; এর ত্রুটি এই যে শেষ পর্যন্ত এর মূল্য নির্ভর করে বিচারকের ব্যক্তিগত রুচিতে। তথাপি অ্যাংলো-স্যাক্সন মন এম্পিরিয়্যাল বা প্রায়োগিক জ্ঞানে অভ্যস্ত এবং নিপুণ। উপরন্তু এম্পিরিসিজম বুদ্ধির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন না হলেও ব্যবহারিক জীবনে নির্ভরযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যে কোলরিজের পরে ই. এস. ডাললাস ছাড়া কেউই কাব্যের স্বরূপ নিয়ে ভাবয়িত্রী আলোচনা করেন নি, এমনকি শেলিও না। সুতরাং এলিয়ট তাঁর প্রায়োগিক ঐতিহ্যেরই অনুগামী, যদিও এক্ষেত্রেও বহু নূতন আলোচনা দ্বারা তিনি ঐতিহ্যকে এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে কাব্যের স্বরূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনা না থাকলেও বহুস্থলে যে প্রাসঙ্গিক এবং পরোক্ষ দ্যোতনা আছে তার প্রমাণ মিলবে আমেরিকার ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে অধুনা-প্রকাশিত সিস্টার কসটেল্লোর "বিটুইন ফিক্সিটি অ্যাণ্ড্ ফ্লাক্স্" নামক গ্রন্থে।

এলিয়ট বিচার করেছেন কাব্যের উপযোগ কী? "ইউস অব পোয়িট্রি" কথাটিতেই পাওয়া যায় অনিবার্য বেন্থামী গন্ধ। মনে পড়ে কার্লাইল উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন:

> The uses of this Dante? We will not say much about his "uses". A human soul who has once got into that primal element of *Song*, and sung forth fitly somewhat thereform, has worked in the *depths* of our exsitence; feeding through long times the life-roots of all excellent human things whatsoever,—in a way that "utilities" will not succeed will in calculating!

যে-উপযোগবাদের বিরোধী ছিলেন কার্লাইল, তারই বিরোধিতা করেছিলেন রস্কিন, এ-যুগে করছেন এলিয়ট।

বেন্থামবাদ আজও নানাভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাবধারায় সক্রিয়, কখনও প্রকট, কখনও অন্তঃশীলা। রস্কিন "মডর্ন পেইন্টর্স"এ শিল্পের যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে হয়তো বা তাঁর অচেতন বেন্থামী ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে, বৃহত্তম গোষ্ঠীর মহত্তম মঙ্গল। এলিয়টের গ্রন্থেও পাই দূরাগত বেন্থামী সুর। তথাপি এ-কথা স্মর্তব্য যে কাব্যানুভূতি বিষয়ে এলিয়টের সঙ্গে বেন্থামের প্রত্যক্ষ তুলনা চলে না। "র‍্যাশ্‌নালে অব্‌ রিওয়র্ড" গ্রন্থে বেন্থাম লিখেছিলেন :

> Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it is more valuable than either. Everybody can play at push-pin : poety and music are relished by a few. The game of push-pin is always innocent : it were well could the same be always asserted of poetry.

শিল্পকলার সঙ্গে পুশ-পিন ক্রীড়ার এই বেন্থামী তুলনা অবশ্য এলিয়টের অনভিপ্রেত। পক্ষান্তরে, তিনি "দি ইউস অব পোয়িট্রি অ্যাণ্ড দি ইউস অব ক্রিটিসিজম" গ্রন্থের সমাপ্তিতে ছায়ালোক থেকে কোলরিজের বিষণ্ণ প্রেতের ইশারা দেখার পূর্বে বলেছেন :

> কাব্যের উপযোগ অবশ্য তার সংজ্ঞার নির্ণায়ক নয়। যদি তার দ্বারা কোনো গণ-ঘটনার স্মৃতিরক্ষা সাধিত হয়, কোনো উৎসবের উল্লসন, কোনো ধর্মানুষ্ঠানের অলংকরণ, কিংবা যদি কোনো জনতার চিত্তবিনোদন সে করে, তবে তো ভালোই। বোধের সেই বিপ্লব সে ঘটাতে পারে, যা যুগে-যুগে প্রয়োজন ; দৃষ্টির আর মূল্যায়নের যে-সব গতানুগতিক প্রণালী নিত্যই গড়ে উঠেছে, সেগুলি ভেঙে ফেলে মানুষকে এই জগৎটাকে, কিংবা জগতের কোনো অংশকে, নূতন ক'রে দেখাতে পারে।...কিন্তু কাব্যকে যিনি অনুভব করেছেন, আর সেই অনুভূতি নিয়ে চিন্তা করেছেন, এ সব তাঁর জানা কথাই।

কাব্যের উপযোগিতা বিষয়ে এলিয়টের আলোচনা তাঁর সমাজচেতন দৃষ্টির পরিচায়ক, এবং এই বহুনিন্দিত বেন্থামবাদই এই সমাজচেতনার মূল। এলিয়টের সমাজচেতনা কাব্যকে অতিক্রম ক'রে সমালোচনার স্বরূপেও পৌঁচেছে। তিনি বলছেন :

> সমালোচকের স্বকালে কাব্যের উপযোগিতা কী ছিল তার পরিচয় সমালোচনায় মেলে।
>
> যুগে-যুগে যুগধর্মের দাবী সমালোচনায় প্রতিফলিত হয়।
>
> সমালোচনার উদ্বর্তন কাব্যের উদ্বর্তন বা পরিবর্তনের লক্ষণ। আর কাব্যের উদ্বর্তন সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষণ।

এই ধরনের সমাজচেতন দৃষ্টিতে সমালোচনার আলোচনা করেছেন এলিয়টের শিষ্য ব্রনৌস্কি। সমাজচেতনা কথাটি অধুনা অতি-প্রযুক্ত, অসতর্ক-প্রযুক্ত হয়ে গ্লানিকর অর্থবাহী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সন্দেহ জাগে যে সমাজচেতন লেখক একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের দুষ্প্রচারী মাত্র, অথবা সমাজচেতন সমালোচক নিতান্তই সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচার করছেন। এলিয়ট এ-বিষয়ে সাবধান হয়ে বলছেন :

> সমালোচনার অগ্রগতির যে সংক্ষিপ্ত পুনর্দর্শন আমি এখানে করলাম, তার মানে এই নয় যে আমি কোনো বিশেষ আধুনিক সমালোচনাপদ্ধতির সমর্থন করি, সমাজবিজ্ঞানী পদ্ধতির তো নয়ই।

সাহিত্যবিচারের নিজস্ব নিকষ আছে, কিন্তু সাহিত্যের, তথা সমালোচনার উদ্বর্তনের সঙ্গে সংযোগ আছে সমাজের অভিব্যক্তির—অনুগামী হয়েই হোক বা প্রতিগামী হয়েই হোক—এই কথা এলিয়টের প্রতিপাদ্য।

৩

সমালোচক হিসাবে এলিয়টের প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এ-পর্যন্ত করেছি। কিন্তু কতগুলি ধারণা নিয়েই সমালোচকের সমালোচকত্ব প্রতিষ্ঠা পায় না। আধুনিক অনবসরক্লিষ্ট,

চিন্তাভীরু পাঠকেরা চায় যে সমালোচক হবেন এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, যাঁর বিচার অনুসারে নির্ভয়ে বই কেনা এবং পড়া যায়, যেমন কিনা "সানডে টাইমসে"র তারিফ-মতো শেয়ার বেচাকেনা করা যায়, কিংবা "ইভনিং নিউজে"র পরামর্শে ফুটবল ফাটকার টিকিট কেনা যায়। কী কাজ অনর্থক স্বীয় মস্তিস্ক এবং সংবেদনাকে ক্ষুব্ধ ক'রে? এ-ধরনের পরামর্শ এলিয়টের সমালোচনায় মিলবে না, সে-কথা বলা বাহুল্য; যদিও, পূর্বে যে-কথা বলেছি, বিশুদ্ধ তত্ত্বানুসন্ধানের চেয়ে রুচিসম্মত ব্যবহারিক আলোচনাই ইংরেজি সমালোচনার বিশিষ্ট পদ্ধতি; যে-পদ্ধতিকে সমালোচনাকর্মের অন্যতম ধারা বলে স্বয়ং এলিয়ট নির্দেশ দিয়েছেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর নিজেরই গদ্যরচনা। এলিয়টের কয়েকটি সমালোচনার খ্যাতি হয়েছে সমালোচনার উৎকর্ষের জন্য ততটা নয়, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যতটা। তাঁর "মেটাফিসিক্যাল পোয়েটস" প্রবন্ধটি অধ্যাপক গ্রিয়র্সনের বিখ্যাত সংকলনগ্রন্থের আলোচনা এবং আলোচ্য গ্রন্থের মতোই বিখ্যাত, কেননা এখানেই তিনি ঐ কবিগোষ্ঠীর সংবেদনার অবৈকল্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়েছেন। ড্রাইডেন বিষয়ক প্রবন্ধটি যে নবসন্ধানী, সে-কথা পূর্বেই বলেছি। এই দুই প্রবন্ধেই এলিয়ট আলোচ্য লেখকদের ঐতিহ্যপ্রভবতার উপরে জোর দিয়েছেন, আর ঠিক এই ধরনের চিন্তা প্রচলিত সমালোচনার অনায়ত্ত ছিল; অভিনব সমালোচনা কখনও বৈনাশিক সমালোচনার সমার্থক, এবং বৈনাশিক মত মাত্রেই গ্রাহ্য নয়। মিলটনের বিরুদ্ধে এলিয়টের দুটি অভিযোগ: প্রথমত, তিনি ইংরেজিকে মৃত ভাষার মতো ব্যবহার করেছেন; দ্বিতীয়ত, তাঁর কল্পনাশক্তি দৃষ্টিচিত্রল নয়। যদিও ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির বক্তৃতায় এলিয়ট মিলটন বিষয়ে তাঁর পূর্বমত অনেকটা সংশোধন করেছেন, তবু সংশয় জাগে যে এলিয়ট তাঁর

ইঙ্গ-ক্যাথলিকবাদের তির্যক দৃষ্টির ফলে অক্সফোর্ড আন্দোলনের কবিদের মতোই পিউরিটান বিপ্লবের বিরোধী, এবং এই বিরোধিতাবশত ঐ বিপ্লবের কাব্যাত্মিক মুখপাত্রের প্রতি অনুকম্পাহীন।

সমালোচনায় মতের অভিনবত্ব ব্যাপকগ্রাহ্য হোক বা না হোক, সমালোচনার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সেটাই নয়। বরঞ্চ, পুরাতন কথাটির নির্ভীক পুনরাবৃত্তিতেই মনস্বিতার নিদর্শন, যদি সেই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রাণ না হয়ে স্বকীয় অভিজ্ঞতায় সজীব হয়। এলিয়ট যে এই মনস্বিতার অধিকারী তার প্রমাণ দান্তে, মার্ভেল এবং জ্যাকবীয় নাট্যকারদের বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী। পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম রসবিচারের অতীব প্রশংসনীয় সমন্বয় এ-সব প্রবন্ধে ঘটেছে। অতীত সাহিত্যের যে পুনর্মূল্যায়ন উত্তম সমালোচনার লক্ষণ, তা সার্থক হতে হলে কেবল যে কালসংগতির প্রয়োজন তা নয়, সেই সঙ্গে সমালোচকের বিবেক, পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে। এলিয়ট এ-সব গুণেরই অধিকারী। তিনি বলেছেন:

> যুগে-যুগে, প্রায় প্রতি শতাব্দী অন্তর, এমন কোনো সমালোচকের উদ্ভব প্রয়োজন, যিনি অতীত সাহিত্যের পুনর্দর্শন করবেন, কবিকে এবং কাব্যকে নূতন মূল্যানুক্রমে সাজাতে পারবেন। এর অর্থ বিপ্লব নয়, নূতন সম্পর্কস্থাপন মাত্র। আমরা যা দেখছি তা অংশত পুরাতন দৃশ্যই, যদিও পরিপ্রেক্ষিত নূতন এবং আরো দূরবর্তী।...অধিকাংশ সমালোচকই সর্বশেষ মহৎ সমালোচকের উক্তি তোতাপাখির মতো আওড়ান, কিঞ্চিৎ স্বাধীন লেখকদের মধ্যে দেখা যায় বৈনাশিক প্রচেষ্টা, অস্বাভাবিক অতি-মূল্যায়ন। দেখা যায় নূতন নূতন রীতির প্রবর্তন। অবশেষে আবির্ভাব হয় প্রামাণিক সমালোচকের যিনি মূল্যানুক্রমে আবার শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। এই নবমূল্যায়নের হেতু কেবল কালপরিবর্তন নয় অথবা নূতন নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নয়...এর হেতু এই যে কোনো যুগের মানুষই শিল্প বিষয়ে ঠিক তেমন ধারণা পোষণ করে না, যেমন করেছে অন্য যুগের মানুষ।

এই নবমূল্যায়ন, নবযুগের প্রবর্তন এলিয়ট তাঁর সমালোচনায় করেছেন। তাঁর কোনো-কোনো উক্তি আমাদের কারো-কারো মনঃপূত না-হ'তে পারে কিন্তু তাঁর সমালোচনার পদ্ধতি, বিশ্লেষণী শক্তি, সর্বোপরি তাঁর পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা আধুনিক পাঠককে অল্পাধিক প্রভাবিত করেছে। গত বিশ বছরের ইংরেজি সমালোচনায় এই প্রভাব সুস্পষ্ট। যাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা ক'রে থাকেন তাঁরা জানেন সিকি শতাব্দী পূর্বে ছাত্রগণ যে-সব সমালোচকের মত অনুসরণ করতো, আজকের ছাত্ররা তাঁদের বাদ দিয়ে এলিয়ট ও এলিয়টপন্থীদের অনুগামী। বাংলা সমালোচনাতেও এই প্রভাব পৌঁচেছে। এখনো আমাদের সমগ্র সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের কোনো বিশদ, শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য প্রয়াস অবশ্য হয়নি, কিন্তু এই প্রকার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনের চেতনা এসেছে। সেই সঙ্গে দেখতে পাই সমালোচনায় এমন কোনো-কোনো উন্মুখতা যা এলিয়টের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ব'লে পূর্বে উল্লেখ করেছি। আধুনিক বাংলা সমালোচনা যুক্তিপ্রধান ও বিচারধর্মী হবার প্রয়াসী, এবং এ-কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে এই বিচারধর্মিতার মূলে আছে বাঙালী সাহিত্যিকের এলিয়টপ্রীতি।

এলিয়ট যখন বিশেষ লেখকের বা গ্রন্থের সমালোচনায় নিযুক্ত তখনও তাঁর দৃষ্টি বৃহত্তর নীতিগুলিকে অবহেলা করে না। ফলে তাঁর সমালোচনায় নিরন্তর এমন রসগ্রাহিতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, যা বিশেষ এবং সামান্যকে ছেড়ে নির্বিশেষ এবং সার্বিকের সন্ধানে চলে। অংশের চূড়ান্ত রসোপলব্ধির পরিণাম ভূমানন্দ, শালগ্রাম শিলা থেকে পৌঁছনো যায় পরব্রহ্মে। বিশেষ লেখক এবং বিশেষ কবিতার সূক্ষ্ম আলোচনার ফলেই এলিয়ট মন্তব্য করতে পারেন :

> In English poetry words have a kind of opacity which is a part of their beauty...
>
> The experience of a poem is the experience both of a moment and of a lifetime.

এ-সব উক্তি অনধিকরীর মুখে দাম্ভিকতা শোনায়, কিন্তু এলিয়টের বিশ্লেষণকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে এই সব "অবিটার ডিক্‌টা" পাঠকের চিত্তে প্রথম লাগায় চমক, যে-চমককে এলিয়ট রচনা-রীতির গুণ মেনেছেন, এবং তারপরে চমক ছেড়ে পাঠক পৌঁছয় শ্রদ্ধান্বিত স্বীকৃতিতে। এলিয়টের অপর এক মত উল্লেখযোগ্য :

> The creation of a work of art, we will say the creation of a character in a drama, consists in the process of transfusion of the personaltty or, in a deeper sense, the life of an author into the character.
>
> The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an "objective correlative", in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion ; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.

শিল্পকর্মে আবেগ প্রকাশের একমাত্র উপায় একটি "অব-জেকটিভ করিলেটিভ" বা বহিরাশ্রয়ের আবিষ্কার, এই কথা থেকে প্রচণ্ড একটি প্রশ্ন উঠছে :

শিল্পের প্রকৃতি মন্ময় না তন্ময় ? যেমন কিনা, বস্তুজগতের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে দার্শনিক শেষ পর্যন্ত পৌঁছন মূল স্রষ্টার অস্তিত্বে, অথবা রাসায়নিক পৌঁছন পরমাণুতে, তেমনি চিন্তাশীল সমালোচক মাত্রেই মানবেন যে শিল্পসৃষ্টির আদি ও আধ্যাত্মিক নিদান শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপ। অথচ শিল্পরূপায়ণের সময়ে প্রয়োজনবিশেষে এই নিদান মন্ময়ীভূত বা তন্ময়ীভূত হতে পারে। এই রূপায়ণবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপ কোন্ প্রকৃতির তার উপর, কতটা সহজ, কতটা জটিল,

কতটা অন্তর্মুখ, কতটা বহির্মুখ; নির্ভর করে রূপচেতনার উপর। সর্বোপরি নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে সমসাময়িক পরিবেশের সংগতি কতখানি তার উপর। উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় কবি কেবল স্বীয় গূঢ় ব্যক্তিস্বরূপের নয়, প্রকটতর ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ কাব্যে করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকী কাব্যে উক্ত শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যী মনোভাব সক্রিয় ব'লে ঐ কাব্যের প্রকৃতিতে প্রধানত দেখতে পাই—ভিক্টর হিউগোর ভাষায়—লিবরেশন অব দি ঈগো : সহংচেতনার বন্ধনছেদ। এ-যুগের সাহিত্যে ব্যক্তি এবং সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের ধারণা বদলেছে। ব্যক্তি এখন সংকুচিত। সাহিত্যের প্রকাণ্ড অংশ থেকে ব্যক্তিকতা লোপ পাচ্ছে। কাব্য এখন প্রকটভাবে মন্ময় নয়। আধুনিক কবির প্রয়াস ব্যক্তিস্বরূপের তন্ময়ীভূত রূপসৃষ্টি, যার প্রয়োজনে বিষয় বা পরিস্থিতি বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাবলী নির্বাচিত হবে, এবং পাওয়া যাবে ঐ ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষ সাময়িক আবেগের বহিরাশ্রয়ী সংশ্লেষণ। এলিয়টের মতবাদ অধুনা সুবিখ্যাত। মতবাদটির প্রকাশভঙ্গিতে নবত্ব আছে, বক্তব্যে নয়। ডক্টর জনসন রাসেলাস-এ ইমলাক-প্রমুখাৎ এই কথাই বলেছিলেন। পরবর্তী কালে এমার্সন টেনিসনের রচনাভঙ্গির প্রশংসা ক'রে পরে বলেছিলেন, "বাট হি ওয়ন্টস এ সবজেক্ট",—তাঁর কোনো বিষয় নেই। টেনিসন নিজেও তা বুঝতেন। কার্লাইলকে বলেছিলেন, "আই হ্যাভ নাথিং টু সে",—আমার বক্তব্য কিছু নেই। যে-আর্থারীয় কাহিনীতে এলিয়ট বহিরাশ্রয়ী সংশ্লেষণ পেয়েছেন, তা টেনিসন নির্বাচন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তা তাঁর বহিরাশ্রয়ের কাজ করেনি। এই প্রকার বহিরাশ্রয়ী সংশ্লেষণের সফল সন্ধান উনিশ শতকী ইংরেজি কাব্যে একমাত্র শেলি পেয়েছিলেন প্রমিসিয়ুসের কাহিনীতে। এলিয়ট বুঝতে পেরেছিলেন পূর্বসূরীদের ত্রুটি কোথায় (যদিও আর্নল্ডের

মতোই শেলির কাব্য সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিহীন)—এখানে পাই তাঁর বিশ্লেষণী বিচারশক্তির পরিচয়। এই ত্রুটি থেকে তিনি স্বীয় কাব্যে মুক্ত, এখানে পাই তাঁর বিচারশক্তি এবং কলাসৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রমাণ। আর সমালোচনা এবং কলাসৃষ্টির নিকট সম্বন্ধের কথা এলিয়ট পুনঃপুনঃ বলেছেন।

৪

এলিয়টের বিচারে কাব্যের স্বরূপ কী এই প্রশ্নের উত্তর যদিও কোথাও প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া হয়নি তবু এর আভাস বা পরোক্ষ আলোচনা অনেক স্থলেই আছে। সেই আলোচনার আলোচনা স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত বলে বর্তমান প্রবন্ধে তাকে বাদ দিতে হচ্ছে। তবে পূর্বে যে কথা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক যে কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ভাবয়িত্রী বিশ্লেষণের চেয়ে কাব্যের সামাজিক মূল্য বা প্রয়োজন বিচারই সমালোচক এলিয়টের প্রধান চিন্তনীয়। এলিয়টের বিশ্বাস যে সুদ্ধু ভাবয়িত্রী বিশ্লেষণ যদি "সাউণ্ড থিয়লজি", খাঁটি ধর্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহ'লে সে বিপদসংকুল হয়ে দাঁড়ায়।

আমার ধারণা ধর্মতত্ত্বের এই উল্লেখ এবং প্রয়োজনবোধ এলিয়টের চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য, কারণ এই প্রয়োজনবোধ তাঁর সাধারণ নীতিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর সাহিত্যিক মতাবলী এই নীতিতত্ত্বের অংশমাত্র। চরম বিচারে এলিয়ট নীতিবাদী, মর‍্যালিস্ট। শুদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকলা তিনি মানেন না, মানেন শিল্পের সঙ্গে মানবজীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এ-কথা মানেন বলেই তিনি বুঝেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্য এবং কবির মূল্যায়ন যুগে-যুগে কী ভাবে বদলেছে। এই মূল্যায়নকর্মে আর্নল্ডের স্থান উচ্চে, যদিচ আর্নল্ডের মূল্যায়ন এলিয়ট গ্রহণ করেননি। আর্নল্ড

বলেছেন, আধুনিক জগতের ধ্বংসায়মান বিশ্বাসের মধ্যে কাব্যই মানবের অনন্য রক্ষাকর্তা। আধিদৈবিক ধর্মবিশ্বাস আর সম্ভব নয়, সুতরাং উক্ত ধর্মবিশ্বাসের পথে মানুষের চিত্তবৃত্তির সম্যক বিকাশ হয় না, হয় কাব্যানুভূতিতে। অধ্যাপক রিচার্ডস আর্নল্ডের মতের জের টেনে বলছেন আগামী সংস্কৃতি হবে পেগান, ধর্মহীন, এবং সেই সংস্কৃতিতে কাব্যের পথেই চরিতার্থ হবে মানুষের নিগূঢ় বেদনা। এলিয়ট আর্নল্ড বা রিচার্ডস্ কারো সঙ্গেই একমত হতে পারেননি। তাঁর "ইউস অব পোয়িট্রি" গ্রন্থে তিনি বিপরীত মতের সমর্থক ফরাসী দার্শনিক মারিত্যাঁর গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যার মর্মার্থ এই যে কাব্য মানুষের রক্ষাকর্তা নয়, বরং কাব্যেরই প্রয়োজন রক্ষিত হবার, এবং সেই রক্ষণকার্য সম্ভব ধর্মবলে, খৃষ্টীয় ধর্মবলে। এলিয়ট মারিত্যাঁর সঙ্গেও একমত নন। বস্তুত, তিনি এই গ্রন্থে কাব্যের ধর্মীয় সম্বন্ধকেই প্রধান বলে মানতে চাননি এবং পাদরি ব্রেমঁর মতও অগ্রাহ্য করেছেন, কারণ ব্রেমঁ ধর্ম এবং কাব্যের উৎস অভিন্ন চিন্তা ক'রে উভয়কে একাত্ম বলেছেন। "ইউস অব পোয়িট্রি" গ্রন্থে এলিয়টের নিজের মত এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

> Any theory which relates poetry very closely to a religious or a social scheme of things aims, probably, to *explain* poetry by discovering its natural laws ; but it is in danger of *binding* poetry by legislation to be observed—and poetry can recognise no such laws.

অতএব সমাজচেতন সমালোচক যদিও মানেন যে সাহিত্যকর্মের অভিব্যক্তি প্রশস্ততর সমাজজীবনের অভিব্যক্তির শাখা মাত্র, তবু তাঁর মতে সাহিত্যের রূপ স্বকীয় ও স্বতন্ত্র, এবং সাহিত্যের বিধান সাহিত্যেরই, অন্য কোনো ব্যবস্থার নয়।

লক্ষ্য করতে হবে যে এই উক্তি এলিয়টের "ইউস অব পোয়িট্রি" গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং এই গ্রন্থ তাঁর ১৯৩৩ সালের

বক্তৃতার মুদ্রিত সংস্করণ। এর পরের বৎসর, ১৯৩৪ সালে তিনি "ধর্ম ও সাহিত্য" শীর্ষক বক্তৃতায় উপরোক্ত মত ছাড়িয়ে এসেছেন :

> কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা সাহিত্য-সমালোচনার পরিপূরণ প্রয়োজন। নীতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে সার্বিক স্বীকৃতি যে-যুগে যতটা থাকে, সে-যুগের সাহিত্যসমালোচনা ততটাই সম্পূর্ণ হ'তে পারে। আমাদের মতো যুগে, যখন এই প্রকার কোনো সার্বিক স্বীকৃতি অনুপস্থিত, তখন খৃষ্টান পাঠকদের পক্ষে আরো বেশি প্রয়োজন যে তাঁদের পঠনপাঠন—বিশেষত রসসাহিত্য—নীতিতত্ত্ব ধর্ম-তত্ত্বের আদর্শে তাঁরা পরীক্ষা করবেন। সাহিত্যের "মহত্ত্ব" একান্তরূপে সাহিত্যিক আদর্শেই নির্ণীত হ'তে পারে না, যদিও এ-কথা স্মর্তব্য যে কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয়, তার বিচার সাহিত্যিক আদর্শে সম্ভব।

এলিয়টের পূর্বমত ঠিক পরিবর্তিত না হলেও পরিবর্ধিত হয়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ঘোড়াকে আর তিনি আগের মতো রাশ ছেড়ে দিতে রাজি নন। হয়তো মারিত্যাঁর মতো তিনিও বুঝেছেন যে আধুনিক সাহিত্যে দেবাংশের চেয়ে দানবাংশ প্রবলতর। এই কারণেই তিনি চেয়েছেন "সাউণ্ড থিয়লজি," খাঁটি ধর্মতত্ত্ব। এলিয়টের এই ধর্মদৃষ্টি সুনির্দিষ্ট। এই দৃষ্টি প্রথমত খৃষ্টীয়, দ্বিতীয়ত অ্যাংলো-ক্যাথলিক। অ্যাংলো-ক্যাথলিক চিন্তাধারার আদীপক কাহিনী বর্ণনা আমার উপস্থিত প্রসঙ্গের বহির্ভূত, তবু এ-কথা বলা প্রয়োজন যে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এলিয়ট ক্রমশ কীবল ও প্যুসির ধর্মমতকে এমন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন যে উত্তর-ষোড়শ-শতকী প্রটেস্টান্ট ধারাটিই বিপথ ব'লে তাঁর মনে হচ্ছে। তাঁর প্রথম জীবনের বন্ধু টি. ঈ. হিউমের মতো তিনিও মনে করেন যে রেনেসাঁস এবং উত্তর-রেনেসাঁস সংস্কৃতি খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের বিপথগামী। আর্ভিং ব্যাবিটের নব-মনুষ্যধর্ম সম্পর্কে তাঁর আপত্তিরও এই কারণ।

মানব-সংস্কৃতির মুক্তির অনন্য পন্থাই খৃষ্টীয় ধর্ম। "থট্‌স্ আফটার ল্যাম্বেথ" প্রবন্ধে তিনি বলছেন :

> সভ্য কিন্তু অখৃষ্টান চিত্তবৃত্তি গঠনের পরীক্ষা পৃথিবীতে চলেছে। এ-পরীক্ষা ব্যর্থ হবে; কিন্তু এর অবসানের অপেক্ষায় দীর্ঘ ধৈর্য চাই। ইতিমধ্যে কালসংস্কার আমাদের কর্তব্য, যাতে অদূরবর্তী যুগান্ধকার ভ'রে জীবন্ত বিশ্বাস রক্ষা পায়; যাতে সভ্যতা নূতন এবং নূতন ক'রে গঠিত হ'তে পারে, এবং পৃথিবী আত্মহত্যা থেকে বাঁচে।

অর্থাৎ, খৃষ্টীয় মত অব্যর্থ সত্য এবং অখৃষ্টীয় মত নিশ্চিত ভ্রান্ত, এবং এই সর্বস্পর্শী বিশ্বাসেই এলিয়টের সাহিত্যতত্ত্ব নিহিত। এ-ক্ষেত্রে আমার মতো অখৃষ্টীয় পাঠকের পক্ষে সংশয়-গ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু খৃষ্টীয় অখৃষ্টীয় দ্বৈততার অতিরিক্ত আরেকটি দ্বৈততা এলিয়টের চিত্তে গুপ্ত। জগতে যখন দুই মত আছে, একটি আস্তিক আরেকটি নাস্তিক, এবং উভয় মতই অদ্বিতীয়তার দাবী করে, তখন একের পূর্ণ বিনাশেই অপরের সাফল্য এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত। অস্তিদ্বারা নেতি হয় উচ্ছিন্ন হবে নয় ধর্মান্তরিত হবে, দুইয়ের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এলিয়টের খৃষ্টীয়তার মূলে আছে এইপ্রকার উচ্চণ্ড এবং অসহিষ্ণু আত্মবিশ্বাস, দার্শনিক অদ্বিতীয়বাদ। ভারতীয় ঐতিহ্যের পরমতসহিষ্ণুতায় পুষ্ট হ'য়ে, মুক্তির মার্গ অদ্বিতীয় নয়, বহু, এই তত্ত্বে বিশ্বাস ক'রে এলিয়টের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এলিয়টের মতের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের অসংগতি ধর্মীয় নয়, দার্শনিক। আমার ঐতিহ্যে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে এলিয়টের মতে হস্তক্ষেপে আমি অনধিকারী, এমনকি এই মতের সাহিত্যিক ধারাকে অংশত গ্রহণ করতে পারলেও বেশি দূর অনুসরণ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বহু আধ্যাত্মিক দ্বৈততা এবং বিরোধ দেখা গেছে, কিন্তু কোনো পক্ষেরই নিঃসংশয় অবসান

ঘটেনি, ঘটেছে সাময়িক পতন। এলিয়ট যাকে বলেন খৃষ্টীয় সভ্যতা, যদি তা আজ বা ভবিষ্যতে জয়ী হয়ও, সেই জয় যে চিরস্থায়ী হবে তার ভরসা কোথায়? জগতে চলেছে অহ্রিমাণ ও অহুর মাজদার নিত্য সংগ্রাম, মুহুর্মুহু উত্থান এবং লয়।

যে-ব্যাপকতা এলিয়টের সমালোচনার সর্বোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, তাতেই তার চূড়ান্ত ত্রুটি।

বোদলেয়ার-এর কয়েকটি কবিতা

প্লীহা (১)

তিক্ততার নিত্যভক্ষ্য আর্তনাদী হৃদয়ের 'পর
যখন ঢাকনার মতো আকাশের গুরুভার চাপে,
অখণ্ড মণ্ডলব্যাপী দিগন্তের বিষণ্ণ প্রহর
দিনেরে লুকায় কালো, রাত্রির চেয়েও কালো খাপে ;

যখন পৃথিবী ডোবে অবরুদ্ধ স্যাঁৎসেঁতে পাতালে,
যেখানে দুর্বল আশা বাদুড়ের মতো ঘুরে-ঘুরে
পলাতে পারে না, ঠোকে ত্রস্ত পাখা দেয়ালে-দেয়ালে,
অবশেষে পোকা-পড়া পচা ছাতে মরে মাথা খুঁড়ে ;

যখন প্রকাণ্ড কোনো গরাদের অবিরল শিক
নেমে আসে বর্ষণের পরিকীর্ণ বিরাট ধারায়,
নিঃশব্দ মনুষ্যদল, মাকড়শার মতো পাশবিক,
যখন জঘন্য উর্ণা মস্তিষ্কের গভীরে বাড়ায় ;

অকস্মাৎ ঘণ্টাগুলি লম্ফ দেয় অসংবৃত রোষে,
আকাশের প্রান্তে হানে ভয়ংকর কর্কশ চীৎকার,
ভূমিচ্যুত, অনিকেত প্রেতদল শূন্যে যেন ফোঁশে,
সে-বিকট বিলাপের তৃপ্তি নেই, ক্লান্তি নেই আর।

আর ধীরে, আমার আত্মার পথে, ঢক্কানাদবাদ্য বিনা
চলে দীর্ঘ শবযাত্রা, সারি-সারি কফিনের যান ;
আশা, পরাজিত, কাঁদে ; অত্যাচারী বীভৎস যন্ত্রণা
আমার আনত শিরে রোপে তার কৃষ্ণ নিশান।

প্লীহা (২)

জীবনবিদ্বেষী বৃষ্টি বিশাল প্রপাতে, কলস্বরে—
পার্শ্ববর্তী গোরস্থানে বিবর্ণ কবরবাসী, আর
ফুটপাতে কুয়াশায় ছায়াচ্ছন্ন মরত্বের 'পরে
অফুরন্ত পাত্র থেকে ঢালে তার ঠাণ্ডা অন্ধকার।

পোকা-পড়া শীর্ণ দেহ অবিশ্রাম ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে
বাতায়নে শয্যা খুঁজে হন্নে হ'লো আমার বিড়াল ;
শীতে-কাঁপা, বিষণ্ণ প্রেতের স্বরে কে চলে চেঁচিয়ে
নর্দমার জলোচ্ছ্বাসে—কোন বৃদ্ধ কবির কঙ্কাল।

ঘণ্টার বিলাপে পড়ে ধূমায়িত চিমনির নিশ্বাস,
শ্লেষ্মাভরা কাংস্যরবে পেণ্ডুলম রটায় হতাশ ;
ইতিমধ্যে বাসিগন্ধ জীর্ণ তাসে—মারাত্মক নেশা

রেখে গেছে বৃদ্ধ মৃত শোথরোগী, দিয়ে গেছে দাম—
ইস্কাবনী বিবি আর হরতনের সুকান্ত গোলাম
তাদের ক্ষয়িত কাম লক্ষ্য ক'রে জমায় তামাশা।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসে, মোহিনী সুন্দরী সন্ধ্যা ; দুষ্ক্রিয় দুর্জনে
সখ্য দেয় ; আসে যেন ষড়যন্ত্রী, মার্জারচরণে ;
বিশাল কক্ষের মতো আকাশ ক্রমশ বোজে, আর
অধৈর্য মানুষ নেয় পশুত্বের বন্য অঙ্গীকার।

হে সন্ধ্যা, মধুর সন্ধ্যা, তুমি তারই ঈপ্সিত প্রহর,
হাতে যার আজিকার দিনব্যাপী শ্রমের স্বাক্ষর
সত্যই অঙ্কিত।—তুমি সেই সব আত্মার সান্ত্বনা,
দুরন্ত দুঃখের তাপে দগ্ধ যারা ; যে-অনন্যমনা
পণ্ডিতের নতশির এতক্ষণে ভারাক্রান্ত হয়,
যে-শ্রমিক ন্যুব্জপৃষ্ঠে ফিরে পায় শয্যার আশ্রয়।

ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচেরা, ক্রূর, রক্তশোষা,
গুরুভারে জেগে উঠে শুরু করে দৈনিক ব্যবসা,
খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পরদা ছেঁড়ে, দরোজা ধাকায় ;
বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হ'লো ইতস্তত
পথে-পথে, অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো ;
খোলে সে নিগূঢ় পথ দিকে-দিকে ; চতুর সংকেতে
আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে শত্রু যেন জেতে ;
ক্লেদের নগর এই—তার বুকে চলে এঁকে-বেঁকে,
যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দে জাগে রান্নাঘর
এখানে-ওখানে ; অর্কেস্ট্রা উল্লসে ; ওঠে তারস্বর
রঙ্গমঞ্চে ; আর শস্তা রেস্তোরঁয়, যেখানে জুয়োর
ফুর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
তাদের সাকরেদ যত ; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
প্রতিশ্রুত ; অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,
মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে।

মগ্ন হও, এ-গম্ভীর লগ্নে তুমি মগ্ন হও, মন
ভাবনায় ; রুদ্ধ করো কর্ণদ্বার। এই সেই ক্ষণ,
যখন রোগীর দুঃখ তীক্ষ্ণ হয় ; অন্ধ কালো রাত
আঁকড়ে তাদের কণ্ঠ ; সন্নিকট তাদের নিপাত,
নিয়তির পূর্ণতায়, সর্বগ্রাসী, সামান্য পাতালে ;
ওঠে ব্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ঘন হ'য়ে নামে হাসপাতালে।
এর মধ্যে একাধিক, ব্যঞ্জনের সৌরভের আশে
ফিরবে না আপন ঘরে, রাত্রিকালে, দোসরের পাশে।

উপরন্তু অনেকেই বোঝেনি, জানেনি কোনোদিনই
গৃহকোণে মধুময় শান্তি ; এরা কখনো বাঁচেনি।

উষা

প্রভাতী বিউগিলে জাগে ব্যারাকের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ,
সদ্যোত্থিত হাওয়ায় লণ্ঠন কাঁপে।
এই-তো এখন
অসুস্থ স্বপ্নের ঝাঁক বিকারের বীজাণু ছড়িয়ে
শ্যামল কিশোরদলে রেখে গেলো পেঁচিয়ে-মুচড়িয়ে
শয্যা-'পরে ; লণ্ঠনের রক্তচক্ষু কেঁপে-কেঁপে ঘুরে
যেন লাল ব্রণচিহ্ন সদ্যোজাত, দুর্বল দিনেরে
এঁকে দিলো ; দিন আর লণ্ঠনের যুদ্ধের নকলে
আত্মা চায় গুরুভার দুর্মোজাজ দেহের দখলে
ছেড়ে যেতে। বাতাস, অশ্রুল মুখ, হাওয়ায় মোছানো,
বিকম্পনে ভ'রে যায়, ব্যাকুল পলায় কারা যেন ;
লিখে-লিখে ক্লান্তি এলো পুরুষের, রতিক্লে নারীর।

এখানে-ওখানে গৃহে ধোঁয়া ওঠে। নির্জীব শরীর
আলুলিত, বিবর্ণ চোখের পাতা, হাঁ খোলা, নির্বোধ,
রঙ্গময়ী নাগরীরা আবিল আবেশে নেয় শোধ
প্রমথিত অনিদ্রার ; অনাথারা ঠাণ্ডা, রোগা স্তন
ঝুলিয়ে ফুঁ দেয় কাঠে, আঙুলেও। এই সেই ক্ষণ,
যখন প্রসূতি নারী অবরোধে, কার্পণ্যে, ঠাণ্ডায়
তোলে তীব্র আর্তনাদ প্রখরিত গর্ভযন্ত্রণায় ;
সফেন শোণিতে দীর্ণ ফোঁপানো কান্নার মতো ঐ
কুক্কুটের তানে ছেঁড়ে কুজ্ঝটিকা ; ছড়ায় অথই
কুয়াশা, বন্যার মতো, ডোবায় প্রাসাদশ্রেণী ; আর
হাসপাতালে গভীর গহ্বরে, মুমূর্ষু রটায় তার
করাল ঘর্ঘরধ্বনি, নাভিশ্বাসে, অসম বমনে।
লম্পটেরা ঘরে ফেরে—আছে কাজ, প'ড়ে গেছে মনে।

উষা

উষা, শীতে-দাঁতে-দাঁত-লাগা, নির্জন সীনের তীরে
সবুজ-লোহিত সাজে অগ্রসর হ'লো ধীরে-ধীরে।
ধূসর প্যারিস জেগে, চোখ রগড়ে, এখনই আবার
কর্মঠ বৃদ্ধের মতো হাৎড়ায় যন্ত্রপাতি তার।

সূর্য

পুরোনো শহরতলি, জীর্ণ ঘরে যেখানে খড়খড়ি
গুপ্ত কোনো ব্যসনের কুঞ্জবনে সতর্ক প্রহরী,
যখন নিষ্ঠুর সূর্য তীক্ষ্ণ তীর দ্বিগুণিত করে
মাঠে, ঝোপে, নর্দমায়, শহরের ছাতের উপরে,
আমি একা, মগ্ন মৃগয়ায়, অদ্ভুত সন্ধানে হেঁটে
পথ চলি ; শিহরি, খোয়ার মতো কথার হোঁচটে,

কোণে-কোণে মিলের পিছল, দ্রুত গন্ধ নিতে-নিতে
হুমড়ি খেয়ে পড়ি কোনো বহুদিন-ঈপ্সিত পংক্তিতে।

পূষণ, পালক পিতা, পাণ্ডুতার শত্রু, তার তাপে
নিরপেক্ষ উজ্জীবন ঝ'রে পড়ে পতঙ্গে, গোলাপে ;
দুশ্চিন্তা উবায়ে দেয় নীলিমায়, দেয় দীপ্ত ডাক
পূর্ণতারে, নূতন ভাণ্ডারে ভরে মস্তিষ্ক, মৌচাক।
সে-ই পুনর্যৌবনের মন্ত্র পড়ে, যাতে খঞ্জ কুলি
শিশুর উৎসাহে মাতে ; পড়ে তারই অমোঘ অঙ্গুলি
শস্যক্ষেত্রে, ফসলের বৃদ্ধির আদেশে ; পড়ে সেই
অমর হৃদয়ে, যার স্বর্গসুখ কেবল বেঁচেই।

যখন, কবির মতো, অবতীর্ণ হয় সে নগরে,
হীনতম বস্তুদের মহামূল্যে উচ্চে তুলে ধরে ;
উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে
আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।

স্তোত্র

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার !

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

অক্ষয় সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে ;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে।

কেমনে, অম্লেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমারে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
শাশ্বতের অন্তরে আমার।

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে—
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার !

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

সারাৎসার

জীবনানন্দ দাশ

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা র'য়ে গেছে শুধু ;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট ক'রে দিয়ে সূর্য আসে ;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি ;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি ;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা ;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মত জেগে নক্ষত্রকে
কি ক'রে মানুষ ও মানুষীর মত ক'রে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চ'লে ;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন ;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হ'লে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় :
অনুভব ক'রে আমি অনুভব করেছি সময়।

একটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ে ঝরা সোনার মতন
সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন ;—আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর কর—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মত শিল্পীর হাতের থেকে নেমে ;
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল ফসল সূর্যের সঙ্গে তোমার মতন।

উড়ো মেঘ

মৃণালকান্তি দাশ

১

অন্ধকারে মুছে গেছে সন্ধ্যার আলোক,
শূন্য নীড়—ধূসর পালক,
উড়ে গেছে রাঙা পাখি !
দূর নীলে চেয়ে আছে
রিক্ত দু'টি চোখ।

২

তোমার জীবন থেকে আজ
আমি বহুদূর !
সেই রাত্রি, সেই গান নেই—
আছে স্তব্ধ নীরবতা ;
আঁধারে জ্বলিছে
শেষ স্বপ্নের সলিতা !

৩

জ্যোৎস্না চাঁদ তারা লয়ে
তুমি জেগে আছ,
তোমার দু'চোখ ভরে
অপরূপ রাত্রি যায় ঝ'রে !
আলো ছায়া বুনি একা
আমি এই নিঃসঙ্গ প্রহরে।

৪

আমার আকাশে শরৎমেঘের
অকারণ আনাগোনা,

তোমার হারানো স্মরণে বিলীন
বিধুর রাত্রিদিন।

৫

একক তারার মত
তোমাকে সুদূর মনে হয়।
তবুও তোমাকে নিয়ে
কেটে যায় আমার সময়—
নিঃসঙ্গ প্রাণের রাতে
নিরিবিলি কারা কথা কয়!

৬

নির্জন মনে স্মৃতি ও স্বপ্নে
স্বর্গ রচনা করি.
গানের আকাশ গড়ি—
ফোটে আর ঝরে,
কত স্বপ্নের মণি,
উত্তরফাল্গুনী!

৭

হে দূরচারিণী, নন্দিত তব দেশ,
সিন্ধু-পাখির অচল নিরুদ্দেশ!
সোনার হরিণ দূর দূরান্তে লীন,
দিগন্ত-পথে হারায় রাত্রিদিন—
দিকসন্ধানী দীপ্ত সূর্যসেনা।
বিয়োগান্ত কি এ-ইতিবৃত্ত,
অলীক স্বপ্ন বোনা?

৮

হারানো স্মরণ যৌবন-রাঙা পাখি,
কোনো ফাল্গুনে আবার আসবে না কি!

ফেলবে মনের মাটিতে কোমল ছায়া,
সোনার পালক ঝরবে দু'একখানি?
এখানে রইল নীলের নিমন্ত্রণ,
রৌদ্রালু দিন, অরণ্য-হাতছানি।

৯

অনেক জীবন মরণে জেনেছি স্বপ্ন রচনা নয়,
লেখা হয়ে রয় তারি স্বাক্ষর অগ্নির অক্ষরে—
কত কথা, গান—কত না স্বপ্ন ঝরে।

১০

একটি বিরহ শুধু,
রৌদ্র গান ফুরায় এ ফুলের প্রহর—
আকাশে ফোটে না চাঁদ-তারা,
আদিগন্ত নামে অন্ধকার
উদয়াস্তহারা।

১১

একটি স্বপ্নের মতো হোক এ জীবন,
একটি মৃত্যুর মতো মিলালো স্বপন।
প্রেমের তো মৃত্যু নেই,—
আমারো হবে না অসসান,
এই ব্যথা বিষণ্ণতা হবে স্বপ্ন
রৌদ্র ফুল গান।

১২

অগ্নিবর্ণ দিন
রৌদ্রদগ্ধ স্বপ্নগুলি,
অবসান বসন্তের গান—
রিক্তশাখা পুষ্পবীথি!

একা জেগে আছি
আমি এক ক্লান্তপক্ষ
আশার মৌমাছি।

১৩

হে অনন্যা, স্বপ্নতনু আকাশ-দুহিতা।
আত্মার অমর-তীর্থে দুঃখদীপে
একা-একা জ্বালো দীপান্বিতা।

১৪

এই রাত্রি হবে স্বয়ংবরা,
রিক্ত আলো দীপ নীলতারা—
বিরহের বিষণ্ণ বুনোন :
আশুক্লান্ত মধুর স্মরণ!

শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব

বিষ্ণু দে

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসায় রূপান্তরে আশা,
তবু নির্বাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে
হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে গদীতে
ব্যারাকে ব্যারাকে। কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধে তীর্থযাত্রায় না, বারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে।

কথাকে যে রূপ দেবে গণ্ডীতে অধরা
তীব্র অনির্বচনীয়ে বেঁধে দেবে নির্দিষ্ট নিশ্চিত
ঐতিহ্য যেখানে জীব্য সচল মুষ্টিতে,
বর্তমান ঐকতান ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
গলির মোড়েই, তবু অফুরান, কোথা সেই সাধনার সীমা
সেই গলির সীমানা? শব্দে শব্দে প্রতিযোগ
সাযুজ্যের স্বাতন্ত্র্যেই যোগাযোগ উভয়ত সমতায়
বিলুপ্তি তো নয়, নেই গলির সীমানা, পায়ে চলার পথের
শেষ কোথা, ম্যাকাডাম রাজপথ নয়, শব্দে শব্দে প্রতিযোগ,
ঘাটে ঘাটে ভাবো নদী, বাংলার ঘাটে ঘাটে
একই শব্দে শত রূপ শত প্রতিবাদ জমে শত ব্যবহারে,
কিছু তার ভেসে যায়, কিছু ধুয়ে', কিছু রয়ে জীবনে জীবনে
ঘরে বাইরের স্রোতে মুখের আলাপে।
অক্ষরে অক্ষরে স্বত্বের সংগ্রাম, দায়ভাগের বিন্যাসে

যোগে ও বিয়োগে আর নব আগন্তুকে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায়
দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের পালা, স্বরে সুরে সজ্ঘর্ষ সংযোগ।
একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গীতে সমস্ত ভাষার
বাংলার, ভারতের, মানুষেরও সমস্ত অতীত (অবশ্য একটি ঢেউ)
সম্মুখীন মোহানার ঘোরে ফল্গুস্রোতে ভবিষ্যতে—
কিম্বা বন্যার তোড়ে বাঁধের সংস্কার, নাকি কেটে দেবে খাল ?

একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আততিতে
মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্ত সঙ্গীন
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয়ে যায় লীন
কিন্তু যাবার আগে উঠায় সঙ্গীন
সেইরকম মুহূর্ত,

অনার্য আর্যের, কৃষক ও শাসকের, বৌদ্ধ আর ব্রহ্মণ্যের
গৃহস্থ ও ধনিকের স্মার্ত আর লৌকিকের, শ্রমিক ও ধনিকের
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক,
তবু তার আততির ভাষা একাগ্র সন্ধানী চূড়া
বিস্তারিত পাহাড়ের, শেষ যার অগোচর,
তবু তার লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত অমোঘ
কৌরব রাজন্যে নয় অর্জুন বা একলব্যে জ্যামুক্ত সার্থক।
খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত। দেখা যায়
সেই মন চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে।
সেই সাধ্যে গেঁথেছি সাধনা। কাব্য সে সন্ধান জীবনের।
একটি জীবন বটে, অনন্য, তবুও সমস্ত ভাষায়, অন্যোন্যও।
তাই জাঠায়, মিছিলে, শোভার সন্ধানে যাত্রী মিটিঙের মুখে

কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা বা উৎপ্রেক্ষাই,
যে দাবি জানাতে হবে, যে জুলুম বন্ধ করণে হাঁক
সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
সবাই মানুষ, শিল্পী কবি। অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে
জুলুম ও দাবি লড়ে অতলান্ত আততিতে
তাই তো দ্বন্দ্বের স্রোত কোটালের বান আর
এদিকে স্বপ্নের কূপও, আর্তেসীর কাব্যের নির্ঝরে
তাই তো হাজার শিলা যন্ত্রণার অস্থির সংস্থান।

শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমি'
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
যোগাযোগে অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব নিপাতনে
ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।
তাদের চোখের ব্যঞ্জনায় আমি যে দেখেছি
উত্তোলিত বাহুর মুষ্টিতে, প্রবল আওয়াজে
সম্মিলিত পদক্ষেপে সমাহিত অতীত জীবন
বর্তমান জীবনের বিন্যাসের যোগাযোগে উৎসারিত
ত্রিকালের মুহূর্ত চূড়ায় চূড়ায়িত, লক্ষ্যভেদে তীর কিংবা বর্শার
ফলক এক।
মৃত্যুঞ্জয় তাই তো জীবন, জীবনে মরণে একাকার।
কবিতার সমাধান জীবনে গোচর আজ, কবিতার
আত্মদানে, যেন মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পর্বত শিখর।
হয়তো শিখরও ডোবে উর্মিল কল্লোলে, হয়তো বা

প্রাণ দেয় গুলির জুলুমে, হয়তো বা মাথা তোলে,
জেগে ওঠে উপলক্ষ্যে, ভাষণের দাবী কিম্বা প্রয়োজনে,
মুখ্য নয়, হাতিয়ার, একাগ্র সঙ্গীন।
শব্দ ভাষা ছন্দ ইত্যাদির মুষ্টিমেয় গঠনের
সংবেদনের দ্বন্দ্ব জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুষ্টিবদ্ধ,
গৌণ কিন্তু অকৃত্রিম, চালিত এবং আন্তরিকও
একতার বহুধাসাধনে মুঠি মুঠি প্রতিবাদ
জুলুমের দাবির সম্বাদ। সর্ব কাম ত্যাগ করে'

এই তবে। বাকি সে তো একান্ত তোমার
অদ্বৈত নিশ্চয় কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈতে সম্ভোগ-দ্বন্দ্বের
বিলাস, সে তোমারই দায়, তোমার হৃদয় মনে কি মাত্রায়
মিলনের কিবা রূপ দেবে, সে জানো তুমিই
পায়ে চলা দীর্ঘ গলি কিম্বা দ্রুত প্রশস্ত এস্‌ফল্ট রাজপথে,
রূপ তোমার জীবনে কবিতার সব কলেবরে রূপ
বিশ্বরূপ জনগণে, প্রত্যক্ষে ও অগোচরে যেদিকে তাকাও
ক্লৈব্যে নয়
রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে সচেষ্ট সংযোগে।

পাউণ্ড প্রসঙ্গে আরো

'কবিতা'র গত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর 'এজরা পাউণ্ড' প্রবন্ধ প'ড়ে কোনো-কোনো পাঠকের মনে পাউণ্ড বিষয়ে নতুন ক'রে আগ্রহ জেগেছে ব'লে এই তথ্যবাহী নিবন্ধের অবতারণা।

লরেন্সী উন্মাদনার অবসানে পাউণ্ড আর এলিঅট একই সঙ্গে বাংলাদেশে পৌছন। উনিশ-শো তিরিশের বছরগুলি ভ'রে এ-দু'জনের বই কলকাতায় হাতে-হাতে ঘুরেছে, নাম মুখে-মুখে রটেছে; আর কোনো বন্ধুসভায় কেউ যদি বলেছে 'এলিঅট', তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই 'পাউণ্ড' ব'লে ওঠার কেউ-না-কেউ থেকেছেই। বাংলার তরুণ, অনতিতরুণ কবিদের কানে তখন নূতনের মন্ত্র এ-দু'জনই জপাচ্ছেন; প্রকৃতিভেদে আকর্ষণ বেশি কারো কাছে এলিঅটের, কারো কাছে পাউণ্ডের।

যুদ্ধ বাধলো, যুদ্ধ চললো। এলিঅট নিরুপায় হ'য়ে বিড়ালের পদ্য লিখতে বসলেন; অডেন, ইশরউড, হক্সলি দেশ ছাড়লেন; ইএটস আর জয়সের মতো ঠিক সময়ে মরতে না-পেরে ভর্জিনিয়া উলফকে অগত্যা জলে ডুবতে হ'লো। শুধু সিটওএল-ভাইবোন টিঁকে থাকলেন খাঁটি ইংরেজ সংস্কৃতির পাহারায়। আর সেই নিষ্প্রদীপ বিশ্বনিশায় অকস্মাৎ নির্বাপিত হ'য়ে গেলেন এজরা পাউণ্ড। নতুন বই না, নতুন সংস্করণও না; সাহিত্যের পত্রিকাদিতে নাম নেই, আলোচনায় উল্লেখ নেই; নতুন কাব্যসংকলনে তাঁর কবিতাসুদ্ধু বাদ। যেন এজরা পাউণ্ডের অস্তিত্বই নেই। 'পাউণ্ডের খবর কী?' 'পাউণ্ড কোথায়?' এ-প্রশ্নের উত্তরে শুধু এই গুজব শোনা গেছে যে তিনি রোমের রেডিওতে ইঙ্গ-মার্কিনের নিন্দে রটাচ্ছেন। আরো কিছু-কিছু গুজব পৌছতে লাগলো যুদ্ধের শেষদিকে, যুদ্ধের পরে। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে এ-দেশে আমরা কিছুই জানতে পারিনি এতদিন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধেই প্রকৃত ঘটনার সারাংশ প্রথম পাওয়া গেলো।

আরো কিছু বিবরণ পাউণ্ডের জন্মভূমিতে সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে। শিকাগোর 'Poetry' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় পিসাতে পাউণ্ডের বন্দীদশার কিছু খবর জানিয়েছেন ডেভিড পার্ক উইলিয়ামস নামে সেই কয়েদখানারই এক প্রাক্তন প্রহরী। প্রবন্ধের নাম 'The Background of The

Pisan Cantos' ; কাব্যের সঙ্গে তথ্যকে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখানো আছে। নিচের অংশে প্রধান তথ্যগুলি উদ্ধৃত হ'লো।

কয়েদটি নামিত Disciplinary Training Centre (D. T. C.) পিসার কাছেই। রাপালো থেকে সেখানে ধ'রে এনে পাউণ্ডকে প্রথমে রাখা হ'লো খাঁচাতে। ডি. টি. সি.তে খাঁচা ছিলো আধ-ডজন, 'বাক্স' ছিলো গোটা ষাট। 'বাক্স' মানে কংক্রীটের খুপরি ; ঠিক ততটাই বড়ো, যাতে আস্ত একটা মানুষ শুতেও পারে, দাঁড়াতেও পারে ; নির্জনদণ্ড যারা পায়, তাদের জন্য দু-সপ্তাহের জল-রুটি বরাদ্দ সেখানে। 'Incorrigible'-দের শায়েস্তা করা চাই তো। পাউণ্ড বলেছেন 'death cell'। কিন্তু ডি. টি. সি.তে মৃত্যুদণ্ড বিরল ছিলো ; পালানো শিল্পী আর ভীষণ বদমাশদের জন্যই এ-সব খাঁচা-খুপরির ব্যবস্থা ('escape artists and especially dangerous criminals')। মোটা তারের খাঁচা, যাতে অন্তর্বাসীকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখা যায়। ওরই প্রথমটা ভেঙে ফেলে তারের বদলে মোটা-মোটা শিক বসিয়ে পাউণ্ডের 'গরিলা-খাঁচা' তৈরি হ'লো, ঠিক পিছনেই সারি-সারি 'বাক্স'। সতর্কতা মজবুত, পাছে 'দেশদ্রোহী'কে উদ্ধারের কোনো চেষ্টা হয়। কোনো চেষ্টা হয়নি।

মাথার উপর দিনের বেলা ত্রিপলের চাল, রাত্রে শীত ঠেকাতে খাঁচার মধ্যেই ছোট্ট তাঁবু। সিমেন্টের মেঝেতে ঘুমোতেন। সঙ্গী বলতে পাহারওলা আর গুণ্ডা ডাকাত ('ডেঞ্জেরাস ক্রিমিন্যালস')। আবার পাউণ্ডের সঙ্গে কথা বলা তাদেরও বারণ। লোহার ফটক খুলে-খুলে কৃপণ পথ্য নিয়ে আসতো এক নিগ্রো দরোয়ান, খাবারের সঙ্গে কিছু খবরও বিলোতো। পাউণ্ড তাকে বলেছেন 'God's messenger'।—কিন্তু ঈশ্বরের অন্য এক দূত খাঁচায় ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী : ঘণ্টার পর ঘণ্টা কনফ্যুসিয়স পড়তেন ; কখনো বই রেখে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন শুধু, ছেঁড়াখোঁড়া দাড়ি আঁচড়াতেন আঙুলে; আর তাকিয়ে দেখতেন সামনে পিসার রাস্তা, দুটো-একটা শাদা বলদ মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে।

গরিলা-খাঁচায় কয়েক সপ্তাহেই স্বাস্থ্য ভাঙলো ; বদলি হলেন চিকিৎসার এলাকায়। এখানে অনেকটা আরাম হ'লো। নিজের তিনকোণা তাঁবুতে বাসা পেলেন, শোবার খাটিয়া, বই, কাগজ-কলম। প্যাকিং-বাক্সের টেবিল

বানিয়ে উপহার দিলো কয়েদিদের মধ্যেই একজন ; 'কিন্তু সাবধান—কাউকে বোলো না যেন।' ('Doan you tell no one I made you that table.') দয়া সেখানে বিপদে বোঝাই ; কিন্তু বন্দীরা, প্রহরীরাও মানুষ ; শাস্তির ভয়েও অনেকে সেটা ভুলতে পারেনি। ('…many trainees and guards were willing to take risks in order to remain compassionate human beings'.) এই তাঁবুতে, প্যাকিং-কাঠের এই টেবিলে ব'সে, পাউণ্ড পিজান ক্যান্টোজ লেখেন, কনফ্যুসিয়স অনুবাদ করেন। ছ-মাস ছিলেন যেখানে : ১৯৪৫-এর মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। নবেম্বর মাসে তাঁকে নিয়ে আসা হ'লো আমেরিকায় ; তাঁর প্রকৃতিস্থতায় সকরুণ সন্দেহের ফলে এবার তাঁর বাসা হ'লো এক উন্মাদভবনে, ওয়াশিংটনের সেণ্ট এলিজাবেথস হাসপাতালে। তখন থেকে সেখানেই আছেন।

ডি. টি. সি.র একটু বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বন্দীদের নাম সরকারি ভাষায় 'trainee', শিক্ষার্থী। রোজ চোদ্দ ঘণ্টা ধ'রে 'শিক্ষা' ; ঝাঁপদৌড়, বন্দুক-ঘাড়ে কুচকাওয়াজ, তার উপর 'চন্দ্রালোক-ড্রিল'। টাকাকড়ি নিষিদ্ধ ; যার-তার বরাদ্দ তামাক সিগারেটই বেচাকেনার উপায়। অটোম্যাটিক রাইফেল নিয়ে সান্ত্রী আগলে আছে চারদিক। পাউণ্ডের খাঁচার খুব কাছেই কয়েকজন কয়েদি একবার পালাবার চেষ্টা করে ; দূর থেকে রাইফেলের গুলি তখনই তাদের লুটিয়ে দিলো মাটিতে। নিরন্তর সুকৃতির ফলে ক্ষমার ব্যবস্থাও ছিলো। তাতে চোদ্দ মাস সময় লাগার কথা ; তবে আগেও হ'তো। বিষ্ঠা কুড়োবার 'মধুগাড়িতে' ('honey wagon') কাজ করলে ক্ষিপ্র ক্ষমা প্রায় নিশ্চিত। যারা অসুখে পড়তো, তাদের মধ্যে দুটো দল সংখ্যায় প্রায় সমান-সমান : একদল বিশ্রামের আশায় অসুখের ভাণ ধরেছে, অন্য দল কোনো কঠিন পীড়া লুকিয়ে-লুকিয়ে চলছিলো অনেক দিন—পাছে ক্ষমার, মুক্তির সুযোগ হারায়। তাঁবুতে ব'সে-ব'সে পাউণ্ড সব দেখতেন, বুঝতেন ; শুনতেন কুচকাওয়াজের হুকুমদারি, ঢাকের একঘেয়ে বাদাম্-বাদাম্, সাময়িক অপভাষায় কয়েদিদের, পাহারাদের কথাবার্তা। কর্তৃপক্ষের মুখের বুলিতে 'trainee'রা ছিলো 'god-damned'। পাউণ্ড বলেছেন 'man-damned'। ডি. টি. সি.র সব কথাই পিজান ক্যান্টোজ-এ আছে।

২

পিজান ক্যান্টোজ-এর জন্য পাউণ্ড একটি পুরস্কার পেলেন সেদিন। পুরস্কারটির নাম Bollingen Prize, বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের জন্য মার্কিন-দেশে সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছে, পাউণ্ডই প্রথম পেলেন। অবশ্য, এজরা পাউণ্ড এতদিনে একখানা বই লিখলেন যা ১৯৪৮-এর মধ্যে আমেরিকায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সব-সেরা, এ-কথাটা রীতিমতো অসংগতই শোনায়; পুরস্কারের মূল্যও মাত্র এক হাজার ডলার। কিন্তু পাউণ্ডের এই পুরস্করণের সার্থকতা সম্ভবত তার সম্মানে বা অর্থমূল্যে নয়; এটা সাহিত্যসমাজের ব্যথিত বন্ধুতারই নিদর্শনমাত্র, হয়তো তাঁর 'উদ্ধারে'র ইঙ্গিতও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন। পুরস্কারের নির্বাচনী-সমিতি মনোনয়ন করেছিলেন আমেরিকার Library of Congress; সমিতির সদস্য ছিলেন এলিঅট, অডেন, কনরাড অয়কেন এবং আরো অনেক মার্কিনী সাহিত্যসেবী। পুরস্কারের ঘোষণাকালে তাঁরা যে-নিবেদন জানিয়েছিলেন, তাতে অল্প কথায় অনেকটা বলা আছে:

> 'The fellows are aware that objections may be made to awarding a prize to a man situated as is Mr. Pound. In their view, however, the possibility of such objection did not alter the responsibility assumed by the jury of selection. . . . To permit other considerations than that of poetic achievement would destroy the significance of the award and would, in principle, deny the validity of that objective perception of value on which any civilized society must rest.'

সমিতির আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি। মার্কিন খবর-কাগজ থেকে জানা গেলো যে ক্ষুদ্রতর কবিরা বিক্ষুব্ধ। আক্রমনের ঝাঁক উড়ছে। পিজান ক্যান্টোজ-এ কেউ দেখছেন ফ্যাশিজম-এর বীজাণু; কেউ বলছেন পাউণ্ড কোনোকালেই কিছু লিখতে পারেন না। এ-উপলক্ষ্যে কাগজের রিপোর্টররা পাউণ্ডের সঙ্গেও দেখা না-ক'রে ছাড়েনি। তাদের একজনের কাছে তিনি বলেছেন, 'What I want to know is whether anybody heard my broadcasts, and, if so, how they could have any earthly idea of what I was talking about.' এর আগে, প্রথম যখন তাঁকে পিসা থেকে ওয়াশিংটনে আনা হ'লো, তখন কাগজওলাদের বলেছিলেন,

'There is an idea afloat here that I betrayed this country. If that damned fool idea is still in anybody's head I want to wipe it out.'

বলিঞ্জেন পুরস্কারে অন্তত এটুকু হলো যে তাঁর জন্মভূমিতে—যেখানে বয়স্ক জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র তিনি কাটিয়েছেন,—লোকে নিন্দে করতেও আবার তাঁকে মনে করছে। ইংলণ্ডের কথা একটু আলাদা; সেখানে পাউণ্ডকে মনে রাখার দু-একজন আছে এখনো। টি. এস. এলিঅটের ষাট বছরের জন্মদিনের জয়ন্তী-গ্রন্থে উইণ্ড্যাম ল্যুইস এলিঅটের উপলক্ষ্যে পাউণ্ডের কথাই বলেছেন। লণ্ডনে পাউণ্ডের ছোট্ট ফ্ল্যাট ছিলো সদ্যোজাত প্রতিভার আঁতুড়ঘর, গৃহস্বামীর আবিষ্কৃত দু-চারজন অজানা প্রতিভাবান সব সময়ই উপস্থিত; আর সেই ফ্ল্যাটেরই ছোট্ট তিনকোণা বসবার ঘরে ল্যুইস প্রথম চোখে ছাখেন নবোদিত মার্কিন কবিকে, 'যে নাকি কী-এক কবিতায় বিলাপ করেছে বুড়ো বয়সে ইজের গুটিয়ে পরতে হয় ব'লে'। বন্ধু দু-জনকে আলাপে বসিয়ে পাউণ্ড সোফায় শুয়ে প'ড়ে মিটিমিটি তাকাতে লাগলেন তাঁর শেষ পুরস্কার—আবিষ্কারটির দিকে। ভাবটা এই, 'কেমন!' যেন এই আশ্চর্য নতুন প্রুফ্রক কবিতা আর তার আশ্চর্য নতুন প্রতিভাশালী লেখককে একই সঙ্গে এই মাত্রই বের করলেন ভেলকি খেলিয়ে মাথার টুপি থেকে। আটলাণ্টিকের ওপার থেকে নতুন-আসা কবিকে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে পাউণ্ড তখন ভারি ব্যস্ত; বেশি কথার সময় নেই, চায়ের পরেই যেতে হবে এলিঅটকে নিয়ে ফোর্ড ম্যাডক্স হ্যফর-এর বাড়িতে।

এলিঅটের কাব্যে পাউণ্ডের প্রবল প্রভাবের কথা, ল্যুইস বলছেন, কারো কাছেই গোপন নেই। ল্যুইস-এর মতে, শতকাস্তিক চন্দ্রালোকের অলিগলি থেকে পাউণ্ডের বিস্ময়কর শিক্ষকতাই এলিঅটকে উদ্ধার করে। অবশ্য, এ-প্রভাবের কথা গোপন থাকার কথাও নয়, কেননা কাব্যের ভিতরকার সাক্ষ্য বাদ দিলেও, পাউণ্ড-সংকলনের ভূমিকায় এলিঅট নিজেই লিখেছেন, 'I am most pleased with my own verses when I find they have caught some echo of Mr. Pound's.' (এর উল্টো একটা মতও সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে: পূর্বোক্ত জয়ন্তী-গ্রন্থে কনরাড অয়কেন জানিয়েছেন যে এলিঅট একবার এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন,

'Pound is rather intelligent as a talker: his verse is touchingly incompetent.' অসংখ্য যে-সব পাঠকের এলিঅটের চিঠি পাবার বা কথা শোনার সুযোগ কখনো হবে না তারা অবশ্য এ-দুটোর মধ্যে প্রকাশ্যে স্বাক্ষরিত মতটাকেই সত্য ব'লে ধরবে)।

পাউণ্ড-যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তক, এ-কথা তাঁর শত্রুও মানে। তাঁর নিজের রচনাবলীর মহিমা তো আছেই; তাছাড়া অন্য একটি কারণেও আধুনিক কাব্যে বিশিষ্ট তাঁর স্থান। সে-কারণ এই যে তিনি ছাড়া অন্য যে-দু'জন কবি এ-যুগের ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ, (তিনজনের একজনও জাত-ইংরেজ নন), তাঁদের উভয়েরই তিনি উত্তমর্ণ। মহত্তর উত্তর-ইএটস সারা জীবনের অভ্যাস বদলে নতুন ছাঁচে ছন্দ খেলিয়েছিলেন বয়সে কুড়ি বছরের ছোটো এই কবি-জনকের পরামর্শেই : 'A Packet for Ezra Pound'-এ তার প্রমাণ আছে। ইএটস আর এলিঅট একই সময়ে একই ভাষায় কবিতা লিখেছেন, বসবাসও করেছেন একই দেশে; অথচ সাহিত্যিক জীবনে—ব্যক্তিগত জীবনেও—এ-দু'জনের সম্বন্ধ কত ক্ষীণ, তা একটু চোখেই পড়ে। যেন একজনের জগতে অন্যজনের ঠিক স্থান নেই। মনে হয়, প্রুফক আর মাইকেল রবার্টস-এর একমাত্র মিলনস্থল ছিলো এজরা পাউণ্ড। পাউণ্ডের প্রসার এতটাই যে প্রায় বিপরীত প্রকৃতির এই দু'জন কবির প্রত্যেকের মনেই তাঁর সংক্রমণ সফল হয়েছিলো। এ ছাড়াও অনেক সমসাময়িকের উপর তাঁর প্রভাব পড়েছে, অনেককেই তিনি বন্ধুতায় বেঁধেছেন। উইণ্ড্যাম ল্যুইস পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলছেন, 'এজরা যে শুধু নিজে বড়ো কবি তা নয়, অন্যদেরও সে এমন কাজে লেগেছে যে ভাবতে তাক লাগে। এ-কথা যেন আমরা না ভুলি যে···তারই বিচারবুদ্ধি, তারই উদারতার ফলে জেমস জয়স-এর সাহিত্যপ্রতিভা ধরা পড়লো, প্রশংসা পেলো। তারই চেষ্টায় সংকটের সময়ে মোটারকম কিছু টাকা জয়সের হাতে পৌঁচেছিলো। সাহিত্যিক সে, হাড়ে, মজ্জায়, মাথার লালচে চুলের গোড়ায়-গোড়ায় সাহিত্যিক। সাহিত্য তার নিশ্বাস, সাহিত্য তার খাদ্য, সাহিত্য তার স্বপ্ন। তার জাতের মানুষ খুব বিরল।'

৩

উন্মাদভবনে এই বিরল মানুষের অবলোপ দুঃখ দেবে অনেককেই, দিচ্ছে।

শুধু তাঁর বগদী বন্ধুরাই না, ইংরেজি-জানা জগৎ ভ'রে তাঁর অসংখ্য ভক্ত পাঠকও শুধু নয়, 'যে-নিরপেক্ষ মূল্যবোধ যে-কোনো সভ্যসমাজের ভিত্তি', সে-মূল্যবোধ যে হারায়নি এমন যে-কোনো মানুষকেই দুঃখ দেবে। কালাপাহাড়ি নবত্বের জন্য পাউণ্ডকে বরাবরই পাগল ব'লে আসছে কেউ-কেউ; সেটা বাদ দিলে আর-কোন অর্থে তিনি এখন পাগল তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, কেননা সমস্ত ক্যান্টোজটাই কারো-কারো কাছে প্রলাপ ঠেকলেও পিজান ক্যান্টোজ অন্যগুলির তুলনায় অপলাপ নয়। এলিঅট—যিনি ১৯২৮ সালে বলেছিলেন যে 'ক্যান্টোজ'ই একমাত্র সমসাময়িক পাঠযোগ্য দীর্ঘ কাব্য—'পিজান ক্যান্টোজ' বিষয়ে বিশেষ সপ্রশংস,* এবং জন ক্রো র‍্যানসম-এর মতো বিচক্ষণ পণ্ডিতও তাকে মহৎ কাব্য ব'লে মেনেছেন। আর পাউণ্ডের মস্তিষ্ক, কলম নিরন্তর সক্রিয়: এখন মগ্ন আছেন কনফ্যুসিয়সে; 'The Unwobbling Pivot & The Great Digest' সমন্বয় অনুবাদে বেরিয়ে যাবার পরে 'Analects'-এ হাত দিয়েছেন।

কনফ্যুসিয়সকে এত ভক্তি তিনি কেন করেন সে-কথা 'The Great Digest'-এর মুখবন্ধে পাউণ্ড নিজেই বলেছেন। এখানে তার তর্জমা দিচ্ছি।

'শাসনতন্ত্র আর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নিয়ে অন্য যে-কোনো দার্শনিকের তুলনায় কনফ্যুসিয়স ভেবেছিলেন অনেক বেশি। ভাবতে হয়েছিলো, মার্কেট ইন্সপেক্টর থেকে প্রাইম মিনিস্টরের পদে উঠেছিলেন তো। অতীতের দু-হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস পেয়েছিলেন, আর সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সারাংশ এমন ক'রে লিখেছিলেন যাতে বড়ো-বড়ো সরকারি চাকুরদের কাজে লাগে; হেরোডোটস-এর মতো কতগুলি টুকরো-গল্পের সংগ্রহ লেখেননি। আগেকার বড়ো-বড়ো সম্রাটদের শাসনতন্ত্রের

* 'To those who have read the previous Cantos, THE PISAN CANTOS will present little difficulty. In my opinion, they are superior to some of those which precede them; and in the place for which they are intended in the whole work, they will hold their own with any. I find in them the same technical mastery, and a new poignancy of personal speech. Such an achievement is all the more worthy of admiration, because of their having been written under conditions which, for most men, would have stifled inspiration; and which, if they had not stifled inspiration, would certainly have prevented the author from bringing his work to completion.'

T. S. Eliot

মহত্ব কোথায়, তার কনফ্যুসীয় বিশ্লেষণ এতই সারবান যে তাঁর সময়ের পর থেকে চীনদেশের প্রত্যেকটি দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের সূত্রপাত করেছেন কোনো কনফ্যুসীয় সম্প্রদায়, আর তা গ'ড়েও উঠেছে কনফ্যুসীয় প্রতিমানের ভিত্তিতে। চীন ততদিনই শান্ত ছিলো, যতদিন দেশের কর্তারা কনফ্যুসিয়সের এই পাতা ক-টি বুঝতেন। এখানে যে-সব মূলনীতি সংজ্ঞিত হ'লো তার অবহেলার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজবংশে ভাঙন ধরলো, দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। যে-একমাত্র প্রণালীর সমাজ-সংশ্লেষণী কার্যকারিতা বার-বার প্রমাণিত হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করা বিশ্বব্যবস্থার প্রস্তাব-কারীদের পক্ষে মারাত্মক।'

পাউণ্ডের এই প্রস্তাব ওয়াশিংটন, নানকিং কি দিল্লির কানে পৌছবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা যারা পৃথিবী ভ'রে বর্তমানের সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলার শিকার, আমরা এটুকু বুঝলাম যে পাউণ্ড আমাদের সকলের কথাই ভাবছেন। কিন্তু কী-অবস্থায় ভাবছেন? কী-অবস্থার মধ্যে লিখছেন, খাটছেন, বেঁচে আছেন? ওয়াশিংটনের এক কাগজে জানা গেলো এখন তাঁর উপর ঠিক ততটা কড়াকড় নেই; গরাদবদ্ধ ঘরেই থাকতে হয়, তবে পাহারাসমেত বাগানে বেড়ানো যেতে পারে, যদিও এই সুবিধেটুকু তিনি প্রায় ব্যবহারই করেন না, ঘরেই থাকেন। ঘরও তাঁর একার নয়, সেখানে আরো ক-জন থাকে যারা প্রকৃত অর্থেই উন্মাদ। এই শুধু স্বস্তি যে তিনি ইচ্ছা করেন এমন লোক দেখা করতে পারে; তাঁর পত্নী নিয়মিতই আসেন, বন্ধুরা মাঝে-মাঝে, তাঁদের মধ্যে এলিঅটও। হয়তো এটুকুই দয়া। নিজের চারিত্রশক্তিও তাঁর অসামান্য নিশ্চয়ই; নয়তো পিসার অবরোধ থেকে আরম্ভ ক'রে এই চার বছর ধ'রে মনের সৃষ্টিশীলতা সব সত্ত্বেও সতেজ রাখতে পারছেন কেমন ক'রে। কিন্তু বয়স এখন ৬৩, স্বাস্থ্য ক্ষীয়মাণ, চারদিকে সারাক্ষণ প্রকৃতিচ্যুত অ-মানুষ। এ-ভাবে আর কতদিন বাঁচবেন এজরা পাউণ্ড? একনায়কাধীন রাষ্ট্র হ'লে এ-প্রশ্নের চরম নিষ্পত্তি অনেক আগেই হ'য়ে যেতো; পশ্চিমী গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আর আদর্শ ভিন্ন ব'লেই কথাটা উঠছে। পাউণ্ড ফাশিস্ট কিনা তার বিচার যথাস্থানেই হোক—কি না-ই হোক—এখানে নিজেদের একবার মনে করিয়ে দেয়া ভালো যে ফাশিজম-এর শত্রুপক্ষের প্রকাণ্ড অংশের কানে টি. এস. এলিঅটের অক্ষরপংক্তিও হুঙ্কাহুয়ার অনুনাদী।

৪

উইণ্ডাম ল্যুইস তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে লণ্ডনে এলিঅটের আদিপর্বের কথা ভাবলে পাউণ্ডের তিনকোণা বসবার ঘরের ছবিটাই তাঁর চোখে ভাসে; সেখানেই এলিঅটকে দেখতে পান, একই আসনে ব'সে, একটু দূরে আসল মানুষটি—এজরা। এলিঅট কোথায় থাকেন, তা পর্যন্ত ল্যুইস জানতেন না, —দরকার হয়নি—পাউণ্ডের ঘরেই দেখা হ'তো। বস্তুত, পাউণ্ড আর এলিঅট সে-সময়ে এমনভাবেই পরস্পর-জড়িত ছিলেন যে বন্ধুদের মনে হ'তো দু-জনের নিয়তি একই অবিচ্ছেদ্য সূত্র ধ'রে চলেছে। কিন্তু নিয়তি বড়ো বাঁকা। ও-দু'জনের একজন আজ এইমাত্র দিগ্বিজয় শেষ ক'রে স্তুতিধূপের ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন; অন্য জনের অবস্থা এখানে লিখলাম। (কারো-কারো হয়তো এলিঅটের অন্য এক উপদেষ্টাকেও মনে পড়বে: ফ্রান্সের কারারুদ্ধ অশীতিপর শার্ল মোরা।) পাউণ্ড পূর্ব-পশ্চিমের বহু ভাষা, চিন্তা, সংস্কৃতি এমন আত্মসাৎ ক'রে নিজের মধ্যে মিলিয়েছেন যে তিনি প্রকৃতই বিশ্বকবি: জাতে মার্কিন, বাসভূমিতে ইংরেজ আর ইতালীয়, নাড়ির টানে ক্রবাদূর, জীবনদর্শনে চৈনিক, সার্বভৌম, অক্লিষ্টকর্মা, আশ্চর্য এই কবির বিষয়ে আগ্রহ তাঁর আদিভূমি ইডাহো থেকে শুরু ক'রে, ইওরোপ পেরিয়ে, চীন-জাপান পর্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত বাংলাদেশে আমরা তাঁর দ্বিগুণ ঋণে আবদ্ধ। আমরাও যেন এ-কথা না ভুলি যে পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম ভক্তের অন্যতম এজরা পাউণ্ড, স্বকীয় রচনাতেও তিনি রবীন্দ্রঋণী, আবার আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর প্রাণসঞ্চারী প্রভাব সুস্পষ্ট। আজ যাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এলিঅটের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছেন, অবাক লাগে যে তাঁরাও কখনো পাউণ্ডের নাম করেন না। বাঙালি সাহিত্যসমাজকে তাই মনে করিয়ে দিই যে পূর্ব-পাউণ্ডের কবিতাবলীর জন্যই সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' জন্মাতে পেরেছিলো, বিষ্ণু দের 'চোরাবালি'তে এবং সম্ভবত ভিন্ন ভঙ্গিতে অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া'তেও সে-বীজ সক্রিয়, নিম্নস্বাক্ষরকারীও নিজেকে নানাভাবে পাউণ্ডের ঋণী মনে করে। গুণগ্রাহী উল্লেখযোগ্য সমালোচনাও বাংলায় তাঁর হয়েছে: সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উইণ্ডাম ল্যুইস ও এজ্রা পাউণ্ড' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। তা-ই থেকে নিচে যে-অংশ তুলে দিচ্ছি, সেটা আধুনিক বাঙালি লেখকের সাধারণ মনোভাবেরই প্রতিফলন।

'পাউণ্ড ইদানীন্তন কাব্যকলার উদ্ভাবক ; এবং আবহমান রচনারীতির অকৃপণ গুণগ্রাহী। তাঁর সুমন্ত্রণায় শুধু অপরিণত শিল্পীরাই উপকৃত হন নি, য়েটস-এর মতো আত্মস্থ কবিও সে-প্রভাবের মূল্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।···পাউণ্ড সমালোচক হিসাবেও নমস্য। সত্য বটে তাঁর মত পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মতোই অস্থির, এবং তিনি নিশ্চয়ই নিন্দা প্রশংসা দুয়েতেই শতমুখ ; তাহলেও এলিয়ট, জয়স, ল্যুইস ইত্যাদি সাহিত্যরথীরা পাউণ্ড-এরই আবিষ্কার। সুতরাং তাঁর রুচি অমোঘ ; এবং যে-কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা ভাবিকথন সম্ভব, তার একদেশদর্শিতা বাহ্য ও নগণ্য।'

('স্বগত', পৃঃ ১৪০)

বুদ্ধদেব বসু

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাবের বিষয়ে পাউণ্ডের কয়েক লাইন লেখা শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী আমাদের পাঠিয়েছেন। এখানে তা প্রকাশ করলাম :

A skilled literary detective should be able to find traces of a debt to Tagore (the author's and that of some further english and american writers) in the parts of LUSTRA done about 1911.

The debt being due to having learned not from the translations, but from questions regarding the relation of translation to bengali original, to the effect that Rabindranath did not use a generic word for scarf, but a particular word indicating the tip of the scarf that is caught by the air and flutters over the shoulder.

Yeats noticed that the ducks (somewhere, I think, in Gitanjali) were the ducks of life, not of literature.

The current from Tagore was acceptable, and joined with what Ford Madox (Hueffer) Ford had been arguing, and practicing, in his "impressionism", unacceptable to Yeats because of its origin, and which I take it, reached him at second hand (to which hand it has been rather roughly attributed).

বাংলা 'আঁচল' কথাটা পাউণ্ডকে মুগ্ধ করেছিলো। 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনাতেও সে-কথা বলেছেন।

সরোজিনী দেবী

(জন্ম : ১৮৭৯, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, হায়দরাবাদ। মৃত্যু : ১৯৪৯, ২রা মার্চ, লক্ষ্ণৌ)

'Dear Sarojini, you are great. Once I thought that you were as frivolous as I am. I still hope I was not wrong...'

Rabindranath to Sarojini Naidu, 3rd December, 1933.

সরোজিনী দেবীর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গীয়, ব্যক্তিত্ব সর্বভারতীয়, দৃষ্টি বৈশ্বিক, আর মাতৃভাষা ইংরেজি। তাঁর কৈশোর কেটেছে বিন্ধ্য আর সাতপুরা পাহাড়ের দক্ষিণে অনার্যকৃষির মোগল স্থাপত্য, মসজিদ, মিনারেট আর বৌদ্ধ অজন্তা ইলোরার কুবের রাজ্যে ; প্রথম যৌবনে ইংলণ্ডের কলেজে পড়লেন, ফিরে এসে বিয়ে করলেন দ্রাবিড় ভারতের অব্রাহ্মণ চিকিৎসককে ; কবি হ'য়েও কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তুলনাহীন বক্তৃতা করলেন, মোগল মহিমার আভিজাত্য নিয়েও স্বদেশী আন্দোলন করলেন, জেলে গেলেন, কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন ; পরাভূত দেশে প্রাণসঞ্চারের আশায় শিল্পীর অন্তরঙ্গ জীবনের সাধনা ত্যাগ করলেন ; আর হিন্দুস্থানী উত্তর ভারতের মুসলমানপ্রধান সবচেয়ে বড়ো প্রদেশের গবর্নর হয়ে তাঁর জীবনাবসান হোলো। আমরা তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। শান্তিনিকেতনের ছায়ায় তাঁর বক্তৃতার জাদুতে সম্মোহিত হয়েছি। আড়াল আবডাল থেকে কখনো তাঁর আশ্চর্য হাস্যপরিহাসবোধের সৌরভ পেয়েছি। কখনো বা অনতিপরিচিত সাময়িক সংগ্রহে তাঁর এক-আধটা ফারসী কবিতার হীরের টুকরো অনুবাদ পড়ে জেনেছি, সভামঞ্চের উচ্চকণ্ঠ জটিল পরিবেশের ধূসরতায় তাঁর কবিপ্রাণ প্রচ্ছন্ন হলেও পীড়িত হয়নি। কিন্তু খাশ বাঙালি হ'য়েও বাংলা ভাষা তিনি কখনো শিখলেন না, বাংলাদেশ কখনো তাঁর বাড়ি হোলো না। আর তবু সরোজিনী দেবীর মৃত্যুতে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হোলো সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ তার নবযুগের শ্রেষ্ঠ কন্যাকে হারালো। উনিশ-শতকী ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতিঘাতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, আধুনিক সাহিত্য, ব্রাহ্মসমাজ, কংগ্রেস আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাদেশের যে-উন্মীলন হয়েছিল, সেই বসন্তের শেষ পাখির গান আমরা সরোজিনী দেবীর কণ্ঠে শুনেছি।

সরোজিনী দেবীর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অলকেমিস্ট।

সেরোয়ানী, পাজামা, মুসলমানী পাগড়ি আর শ্মশ্রুমণ্ডিত হোমরীয় মুখচ্ছবি নিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের এই ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজাম রাজ্যে প্রথম বিদ্যার আলো জেলেছিলেন। তবু লোহাকে সোনা করার জাদুকর স্বপ্নেই তাঁর জীবন কাটলো। একবার নাকি তিনদিন পরে বদ্ধ লেবরেটরির দরজা ভেঙে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে বাইরে আনা হয়। সেই থেকে তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সোনা তৈরির রহস্য তিনি জেনেছেন, চৈতন্য না-হারালেই ফর্মুলাটা তাঁর মনে থাকতো। সঞ্চয় আর সম্পত্তি বর্জন ক'রে জ্ঞানের, সংস্কৃতির আচারে আর অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করার জন্য 'ভারত আশ্রম' নাম দিয়ে কয়েকটি আদর্শ-পাগল পরিবার নিয়ে কেশবচন্দ্র যে-যৌথ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন, যৌবনে অঘোরনাথ তারও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁর পরবর্তী কর্মজীবন কাটে হায়দরাবাদে, যেখানে তিনি নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর অধ্যক্ষ হন। সরোজিনী দেবী রাসায়নিক বাবার কাছে শিল্পীর অলকেমি, মায়ের কাছে কবিতা, নিজাম রাজ্যে মুস্লিম সংস্কৃতি আর পূর্ব-উনিশ-শতকী ব্রাহ্ম সমাজের কাছে উদার মন পেয়েছিলেন। বাঙালি হয়েও যাঁরা জন্ম-ইংরেজ, বিদেশী হলেও সমুদ্র পার হয়ে যাঁদের গান ইওরোপের শিল্পরসিকদের কানে পৌচেছে, সরোজিনী দেবীকে ছেড়ে দিলেও তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, অরবিন্দকে নিয়ে তাঁদের সংখ্যা কম না। কিন্তু সরোজিনী দেবীর কবিতা তাঁর আশ্চর্য বহুমুখী মুখর ব্যক্তিত্বের একটি উপজাতক মাত্র; সে-ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতই প্রবল যে অতি তরুণ বয়সেই আর্থর সাইমন্স, এডমণ্ড গস, এমনকি ইএটসকে তিনি বন্ধুতালিকায় গণ্য করতে পেরেছিলেন, এবং সতর্ক, উৎসাহবিমুখ অল্ডস হক্সলিকেও মানতে হয়েছিলো যে ভারতভ্রমণের অন্যতম পুরস্কার সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতের স্মৃতি লিপিবদ্ধ আছে 'জেষ্টিং পাইলেটে', আবার 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসের এক চরিত্রের নামও সরোজিনী এদ্বেলস।

কিন্তু এ-সব কথা প্রাসঙ্গিক। আজ যখন ভারতীয় মনের জানালায় আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে, উন্মাদ অন্ধতায় হিন্দু মুসলমান পরস্পরের কাছে বিদেশী আগন্তুক হয়ে গেল, তখন এটাই প্রধান কথা যে বাংলার এই কবি মায়ের স্নেহ দিয়ে হিন্দু মুস্লিম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির উদার সেতুরচনা করেছিলেন। হিন্দু মুস্লিম বিরোধ দেশকে খণ্ডিত করবে, দুর্বল করবে, ভারতীয় মনের

উদার বিকাশের পথ রুদ্ধ ক'রে দেবে—অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই এ-কথা তিনি জানতেন। লাহোরে লীগের অধিবেশনে একদিকে তাঁর বন্ধু মহম্মদ আলি জিন্না, আর-একদিকে আলিভাইদের নিয়ে সরোজিনী দেবী ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে বক্তৃতা করছেন—এ-দৃশ্য আমরা দেখিনি। কিন্তু জানি তাঁর এ-বিশ্বাস কৌশলী রাজনীতিকের পুঁথিগত বিশ্বাস নয়। রাষ্ট্রনীতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকের পাণ্ডু দৃষ্টিতে উগ্র হিন্দুয়ানিকেই ভারতের সংস্কৃতি বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু শিল্পীর আলোকিত মনে বৈচিত্র্যের বিভীষিকা নেই বলেই দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পান কত সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্মের প্রাণরসে সেই সভ্যতা, সংস্কৃতির ধারা গভীর হয়েছে, পরিপুষ্ট হয়েছে। এতকাল এ-দেশে থেকেও কোনো মৌল পার্থক্যের জন্য মুসলমানরা ভারতীয় হলেন না এ-কথাই যদি মানতে হয়, তাহলে তো সরোজিনী নাইডুকে অস্বীকার করাই সংগত। কেননা হায়দরাবাদকে না-জানলে, মুস্লিম সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করলে, সরোজিনী দেবীর শিল্পীজনোচিত মহাভারতীয় মনের যথার্থ পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যাবে না। তাঁর কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন মসজিদ, মিনারেট, গম্বুজে সন্ধ্যার নিঃশব্দ অবতরণ, আর গোলকুণ্ডার সমাধিক্ষেত্রের শান্তি নিয়ে হায়দরাবাদ কতো নিবিড়ভাবে তাঁর রচনায় উপস্থিত। অব্যবহিত কৈশোর পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাব বলে একে উপেক্ষা করলে অন্যায় হবে। এ-কথা সত্য যে 'ইসলামের প্রার্থনা' বলে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি তাঁর রচনায় কালীর বন্দনাও উপস্থিত। কিন্তু অলকেমিস্টের চোখে লোহায় সোনায় ভেদ নেই, শিল্পীর দৃষ্টিতে সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের গবাক্ষেই সুন্দর বৃত্তবন্ধ থাকে না। এই বৃদ্ধ বয়সেও উজ্জ্বল লাল রেশমের শাড়িতে তাঁর বর্ণপিপাসী অভিজাত রূপ যাঁরা দেখেছেন; কবিতায়, কথায়, বক্তৃতায় শব্দের সূক্ষ্ম শৌখিন ঝংকার শুনেছেন, এ-কথা তাঁরা অনুভব না করে পারেন না যে সরোজিনী দেবীর মধ্যে হিন্দু-মুস্লিম মিলিত মহিমার স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছিল। কতো না-বলা কথা বলা হয়ে যেতো তাঁর হাতের সামান্য একটু ভঙ্গিতেই। আর অতিমার্জিত দরবারি পরিহাস-রসিকতায় তাঁর যে-অসাধারণ বোধ ছিল—তার তো তুলনা নেই। আমেরিকায় সাংবাদিকরা বাগে পেয়ে একবার তাঁকে কোণঠাসা করার জন্য ভারতীয় মেয়েদের নিয়ে মিস মেয়োর ক্লেদাক্ত উক্তির উল্লেখ ক'রে প্রশ্ন করে—

'আপনি কী বলেন' ?—'মিস্ মেয়ো ?—কে সে ?—' সরোজিনী দেবীর এই উত্তর শুনে সাংবাদিকদের মুখে তিনপোঁচ কালি পড়লো। একবার রবীন্দ্রনাথের চোখের কথা বলতে গিয়ে কোনো কবি মোগল বাদশার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মর্মভেদী তীক্ষ্ণ চোখের তুলনা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় হিন্দু হয়েও মনে-প্রাণে মুস্লিম সংস্কৃতিকে শুষে নিয়ে গর্বোন্নত মোগল সম্রাজ্ঞীর চরিত্র এ-যুগে যদি সত্যি কেউ পেয়ে থাকেন তবে তিনি সরোজিনী নাইডু।

তবু উগ্রতন্ত্রীদের সাম্প্রদায়িক মত্ততার ফলে ভারতে, বাংলাদেশেও, রক্তের ঢেউ তাঁকে দেখে যেতে হোলো। আর যে-হায়দরাবাদকে তিনি আটশেশব এত ভালোবেসেছেন সেখানেও যুদ্ধপন্থীদের বর্বরতা সহ্য করতে হোলো তাঁকে। আবার যখন দেশব্যাপী রক্তারক্তির আশঙ্কায় সবাই স্তব্ধ, তখন তাঁর মতো উদ্বেগ খুব কম লোকই বোধ করেছেন। আর তারপরে অল্পেই যখন ভারতের সঙ্গে নিজাম রাজ্যের রেষারেষির শেষ হোলো তখনও তাঁর মতো অকৃত্রিম সুখী আর কেউ হয়নি। হয়তো তিনি জানতেন, একদিকে অজন্তা ইলোরার আশ্চর্য বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন, আর-একদিকে মধ্যযুগীয় মসজিদ মিনারেটের সৌন্দর্য নিয়ে, আর্য অহমিকায় আচ্ছন্ন উত্তরভারত থেকে দূরে, পাহাড়ের আশ্রয়ে এই নিজাম রাজ্যেই স্বাভাবিকভাবে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব—যদি না আচারের সংকীর্ণতা আর ক্ষমতালোভীর মূঢ়তা বিচ্ছেদের দেয়াল তোলে।

আশা, আশ্বাস, প্রেম আর সাহসের বরাভয় নিয়ে গান্ধীজি যখন নোয়াখালির গ্রামে-গ্রামে ঘুরছেন, তখন শান্তিনিকেতনে সরোজিনী দেবীর বক্তৃতা শুনলাম। যেন কানাড়ার মর্মভেদী গান। অপটু দেহের অক্ষমতায় তিনি তখন বন্দী। কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে বাপুর পাশে—নোয়াখালির ধানক্ষেতের ধারে আগুনে পোড়া সবুজ সংসারের শূন্য ভিটেয়। রবীন্দ্রনাথের দেশেও যুবকরা নিম্নরকের এই বিকারে সম্বিৎ হারালো—এই তাঁর ক্ষোভ। স্মৃতির ধূসর পথ দিয়ে বার-বার ফিরে গেলেন তাঁর সুদূর শৈশবে—মুসলমান দাই ঘুমপাড়ানি উর্দু গান গেয়েছে, ভোর রাত্রিতে মিনারেট থেকে ভেসে এসেছে আজানের ডাক। সুরে ছন্দে ছবিতে,

ভালোবাসায়, সৃষ্টির আনন্দে—কতো সহজ সেই জীবন। হিন্দুকে হিন্দু আর মুসলমানকে বিধর্মী বলে জানেন নি, মানুষ বলেই জেনেছেন। সেদিনও তাঁর পরনে ছিল আগুন-রঙা রেশমি শাড়ি, বয়সের ভার যৌবনের তেজকে স্তিমিত করেনি। গৌরবময়ী নারীর বেদনামাখা সেই তিরস্কারে বাঙালি যুবকের মাথা নত হল।

জীবনে একান্তভাবে তিনি কাব্যসাধনা করেন নি, তাই শুধু কবিতায় তাঁকে চেনা যাবে না। আর রাজনীতির আবর্তেই যদিও তাঁর জীবন কাটলো, তবু রাজনীতির আবিলতা তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করলো না বলে শুধু দেশনেত্রী বলে তাঁকে দেখাও ভুল। বিশ শতকের ভারতে সরোজিনী দেবী উনিশ-শতকী উদার বাঙালি মনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার। বাঙালির সংকীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি, ঈর্ষা, অহমিকার জন্য যতই লজ্জিত হই, এই বাঙালি ব্রাহ্মণকন্যার মধ্যে দেখলাম হিন্দু-মুস্লিমের মিলিত ভারতের বাস্তব রূপ।

নরেশ গুহ

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র ষড়বিংশ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে বিশ্বভারতী একটি মহৎ কর্মের প্রথম পর্ব সমাধা করলেন; কবির জীবিতকালে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থ এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা' 'রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেলো। এর পরে দ্বিতীয় পর্ব: প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, সাময়িক পত্রাদিতে অবলুপ্ত বিবিধ রচনা এবং অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ রচনাবলী। এই পর্বটি সম্পাদনার পক্ষে জটিলতর, পাঠকের পক্ষে অধিকতর আগ্রহের উদ্দীপক। আমরা প্রতীক্ষা করবো।

রাইনহার্ট এডিশন্স

মার্কিন প্রকাশক রাইনহার্ট এণ্ড কোম্পানির (Rinehart & Co., Inc.) নব-প্রবর্তিত গ্রন্থমালা পাশ্চাত্ত্য ধ্রুবসাহিত্যের বহুবিধ সুলভ সংস্করণে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই গ্রন্থমালায় এ-যাবৎ প্রকাশিত লেখকদের মধ্যে আছেন, ইবসেন, ফ্লোবেঅর, গ্যয়টে, গোগোল, স্যামুয়েল বটলর, সুইফট, হার্ডি, মেলভিল; আবার ফীল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, হথর্ন থোরো, মার্ক টোয়েনও আছেন; ওয়র্ডস্বর্থ-এর প্রিলিউডসও আছে। অতএব এঁদের নির্বাচনপদ্ধতিতে উদারতার অভাব নেই, এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত—কোনো-কোনোটি অধুনা স্বল্পপঠিত—গ্রন্থের সঙ্গে সমসাময়িক সাধারণ পাঠকের পরিচয় এঁরা আশা করি ঘটাবেন। প্রত্যেকটি বই সুপাঠ্য ভূমিকা-সংবলিত, ভালো কাগজে পরিষ্কার ছাপা, কাগজের মলাটে সুদৃশ্য। দাম আকার অনুযায়ী ৫০, ৬৫, ৭৫ সেন্ট।

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা থেকে
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতা

চতুর্দশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা] আষাঢ়, ১৩৫৬ [ক্রমিক সংখ্যা ৬২

WILLIAM BUTLER YEATS

"REPRISALS"

Some nineteen German planes, they say,
You had brought down before you died.
We called it a good death. Today
Can ghost or man be satisfied?
Although your last exciting year
Outweighed all other years, you said,
Though battle joy may be so dear
A memory, even to the dead,
It chases other thoughts away,
Yet rise from your Italian tomb,
Flit to Kiltartan cross and stay
Till certain second thoughts have come
Upon the cause you served, that we
Imagined such a fine affair:
Half-drunk or whole-mad soldiery
Are murdering your tenants there.
Men that revere your father yet
Are shot at on the open plain.
Where may new-married women sit
And suckle children now? Armed men
May murder them in passing by
Nor law nor parliament take heed.
Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.

(Reprinted by the kind permission of Mrs. W. B. Yeats and the Editor of RANN.*)*

[লেডি গ্রেগরির পুত্র রবার্ট গ্রেগরি প্রথম ভূযুদ্ধে বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ; ১৯১৮-র জানুয়ারি মাসে ইটালিতে পাডুয়ার কাছে যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবার্ট গ্রেগরির উদ্দেশ্যে ইএটস চারটি কবিতা লেখেন : 'Shepherd and Goatherd,' 'In Memory of Major Robert Gregory,' 'An Irish Airman Foresees His Death' এবং 'Reprisals'। প্রথম তিনটি ১৯১৯-এ প্রকাশিত THE WILD SWANS AT COOLE গ্রন্থের অন্তর্গত, কিন্তু শেষেরটি এতদিন অজ্ঞাতই ছিলো ; সম্প্রতি Ulsterএর কবিতা-ত্রৈমাসিক RANN-এ প্রথম প্রকাশিত হ'লো। কবিতাটির শেষের অংশে কথিত নারীহত্যাতেও একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ আছে ; এলেন কুইন (Ellen Quinn) নামে এক পল্লী-রমণী সৈনিকের হাতে নিহত হয়েছিলো কুল পার্কে গ্রেগরি-বাড়িরই অনতিদূরে। ১৯১৯-এ রচিত এবং ১৯২৮-এর THE TOWER গ্রন্থের অন্তর্গত 'Nineteen Hundred and Nineteen' কবিতার চতুর্থ স্তবকের

'.....a drunken soldiery
Can leave the mother, murdered at her door,
To crawl in her own blood, and go scot-free ;

—এই অংশের উল্লেখও এলেন কুইন-এর প্রতি।

উপরের তথ্য এবং 'Reprisals' কবিতা, RANN-সম্পাদকের সৌজন্যক্রমে 'কবিতা'য় উদ্ধৃত হ'লো। কবিতাটির পুনর্মুদ্রণের অনুমতির জন্য ইএটস-পত্নীর কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক]

বৎসরের গান

বাণী রায়

১

পুরাতন বৎসরের ক্লান্ত পদধ্বনি
শুনি নাই, শুনি নাই আমি।
শুষ্কপত্র-মর্মরসভায়
চলে যায়, চলে যায়
রৌদ্রদগ্ধ বৎসরের জীর্ণ শ্রান্তকায়।
বাতায়নে রেখে কান, শুনেছ কি গান ?
নীল পাখী, আশা-পাখী, পাখা ঝাপটায় ;
নূতন দিনেরে ডাকে গানের সীমায়।
রৌদ্রের রক্তিম বর্ণে আপেল ফলায়।
কত ফুল ফুটে যায় ! মৌশুমী ফুল !
সবুজ লনেরে ঘেরে ডেইজি-গোলাপ।
বিদেশীর উচ্চ কণ্ঠে বর্ষ-আবাহন
সহসা ডাকিয়া নেয় এই দেশী মন।
কত ডেইজি ঝরে গেছে পরাগ ঝরায়ে ;
সোনালী বক্ষের আভা মিশেছে মাটিতে,
ক্ষণস্থায়ী ডেইজি শুধু ফুটেছে ঝরিতে ;
বিশীর্ণ পরাগ-শয্যা বিস্মৃতির ছায়ে !
চলে এস বাতায়নে, ঝরে যাক ফুল ;
চেও না ফুলের পানে ;—দেখ চোখ তুলে,
আশা পাখী, নীল পাখী, করে কলগান।
গানে গানে জেগে ওঠে বৎসরের প্রাণ।

২

সে পাখীর চক্ষে কভু ঝরে অশ্রুবারি,
যে পাখী গেয়েছে গান মম বাতায়নে ?
('অসামান্য আজও তুমি আমার অন্তরে,
বাহিরে ভুবন জানে তুমি সাধারণ ;
ভাবরাজ্যে পরদেশী, তুমি নাগরিক।
কী কাজ মস্তিষ্কে, যার রূপের ভূষণ' ?)
পাখীর চোখেও কভু দেখা দেয় জল
ক্রিসমাস-কার্ড-রঙে পড়েনি তো ধরা,
আমার পাখীর চোখে জলের ইশারা,
আমার আশার পাখী একডানা ভাঙা।
প্রেমের বিদায়ে গাঁথা বর্ষশেষ-গান,
নিবন্ত আলোর মত কম্পিত ব্যথায়।
তবু ডানাভাঙা পাখী পাখা ঝাপটায় ;
তবু তারি গানে গানে শিহরে পরান !

৩

ক্রোকাসের ঝোপে-ঝোপে বিদেশী বন্দনা
শোনো বন্ধু, কান পেতে ;
আসিছে জীবন,
নূতন জীবন লয়ে নব বর্ষাগম।
আমেন, আমেন !
সুমহান্ বাজে দূর গির্জার শিখরে।
খৃষ্টীয় প্রণয়ে কর বৎসরে প্রবেশ।
জাপানী ফানুষ প্রেম ছিঁড়েছে আমার,
নিভেছে মোমের বাতি।
ছোট-ছোট মোম,

লাল-নীল-পীত-শাদা,
জ্বেলেছিনু আমি
তোমারি বেদীর তলে, দেবতা আমার।
যে-দেউল আলো করে চন্দ্র-সূর্য-ভাতি ;
বিশাল যজ্ঞের শিখা দীপ্ত বহ্নিমান
যে-দেউলে নভোগামী,
সেই দেবালয়ে
ছোট-ছোট, নানা রঙা মোমবাতি-সাজে
উজ্জ্বল করিতে আমি চেয়েছি, ঈশ্বর !
যে-প্রেম অনন্তকাল নিজের শোণিতে
পতিতের মুক্তিকামী,
সেই প্রেমশিখা
জাপানী ফানুষে আমি
চেয়েছি ধরিতে
ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার মাঝে।
হে প্রেমের দেব,
আজি বৎসরের শেষে,—খৃষ্টীয় বৎসর—
সারা চিত্ত ব্যগ্র হয়, চাহে অবতার,—
প্রেমের প্রতীক চায় !
মুগ্ধ চিত্ত ধায়
ভুলি জাতি-বর্ণ-দেশ ধরিতে তোমায়।

৪

('পাখীরে দিয়েছ তুমি সীমাহীন স্থান,
আমারে দিয়েছ তুমি সীমাহীন প্রাণ।
কতবার ম'রে-ম'রে আসিলাম ফিরে ;
শঙ্কিত কম্পিত পায়ে তমসার তীরে।

মরেছি হাজার বার প্রেমের মরণে,
নূপুর বেজেছে কত চরণে চরণে !')
পরিশ্রান্ত আজো যারা,
ধরণী-সীমায়
বিষাদের ঘন মেঘে জীবনের দায়
টেনে চলে অশ্রুচোখে ;
নিদ্রার লাগিয়া
পাখীর ডানার সুপ্তি নিয়ত মাগিয়া
আকাশে পাঠায় তারা কণ্ঠ প্রার্থনায় ;
তাদের পুরানো বর্ষ দিতেছে বিদায়
ডেইজির ঝরানো দলে।
যে-নারীর বুক
আজো ভরে নাই কোনো আকাঙ্ক্ষার সুখ ;
যার চোখে নামে নাই মধুর স্বপন
প্রণয়সম্ভোগ-শেষে ;
যে-নারীর দেশ
দুইটি আঁখির জ্যোতি করে নাই আলো ;
তাহারে বিদায় দাও, হে বর্ষ প্রাচীন।
আনো নব দিন,
নবীনা ধরার বক্ষে নূতন বরষ,
নবীন মানুষ লাগি।
প্রেম-অবতার
তোমার শোণিতে জন্ম লভিবে আবার।

৫

('আমার প্রেমের গীতি আজও চিরঞ্জীব,
তারায়-তারায় গাঁথা বিরহ-বিলাপ

ধরাতে ফিরিয়া আসে, ডুবে যায় সুর।
বৎসরের শোভাযাত্রা, বিরহে আমার।
পরায়ে দিয়েছি বন্ধু, যেই কণ্ঠহার,
আরক্ত গোলাপ-গাঁথা বাসনা রঙীন,
সে-ফুল ঝরেছে আজ ম্লান ধূলিলীন,
কেকের কামড়ে ফেরে স্মৃতি-পিপীলিকা।
বৈদেশিক ভাবে মুগ্ধ বিদেশীর প্রেমে,
বৎসরে বন্দনা করি অন্তর-বাহির,
একজনে ভালোবেসে করেছি জাহির ;
সে-প্রেম মিলালো আজ,—হায় মরীচিকা !')
আমার আশার পাখী একডানা-ভাঙা।
কেন তুমি ফিরে এলে, হে বর্ষ আবার ?
নিয়ে এলে নীলাকাশ, স্মৃতিরাগে রাঙা ;
নিয়ে এলে সেই ফুল, প্রেমে জন্ম যার !

৬

শীতের হিমানীসিক্ত পাহাড়ে-পাহাড়ে
বাজে আজি মেঘমন্দ্রে—শোনো কী যে বলে—
'নূতন দেবতা এসো নবছন্দোসুরে,
প্রাচীন, বিদায় নাও, নবশ্রীষ্ট এসো।'
তোমার দেবতা আজ আমারও দেবতা,
হে বিদেশী ;
প্রাণ মোর খুলেছে মৈত্রীতে,
সমগ্র জগৎ আমি চাহি বক্ষে নিতে,
আমার প্রেমের শিখা আজ সর্বগামী।
ফুল যদি ঝরে যায়,
বিদায়-সভায় যদি মোর গীতি গায়

প্রেমের বিদায়,
যায় যাক তুচ্ছ প্রেম, জানি নব প্রেম,
আমারে চাহিয়া আছে দিগন্ত সীমায়।
বৎসরের জীর্ণ ভস্মে জাগো, জাগো আশা,
ভালোবাসা তুচ্ছ—গাও জীবনের ভাষা ॥

এইখানে এই নদীতীরে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এইখানে এই নদীতীরে
সেই থেকে সময় ঘুমোয়
সেই থেকে প্রেম জেগে রয়—
হাওয়া দেয়, হৃদয় ঝিমোয়।

প'ড়ে থাকে পোড়া কাঠ, ভাঙা ঘট, ছাই-হওয়া হাড়,
স্তব্ধতায় পলি-পড়া পাড়
গড়িয়েছে এই নদীতীরে,
স্মৃতি ডাকে বুক চিরে-চিরে—নিঝুম···নিঝুম!
গাছের ছায়ায়
দ্বিতীয় প্রহর স'রে যায়.
ফেলে যায় ধ্যান-ভরা ঘুম।
উদাস অলস ব'সে থাকি
এইখানে এই নদীতীরে,
ভাববার কথা ঢের বাকি।
এ-সবুজ ছায়ার নেশায়
শিস দেওয়া ভুলে গেছে পাখি;
পরিশ্রান্ত চিন্তা এসে শুয়েছে একাকী
ঝুরি-নামা বটের ছায়ায়।
মন ঢোলে; সম্বিৎ স্রোতে ব'য়ে যায়।
ভাবি ব'সে-ব'সে
কোথা থেকে যেন কার নিশ্বাস ওঠে,
এ-আকাশ ভবিষ্যে ভরায়!

গাছের পাতার থেকে ছায়ার আঁচল পড়ে খ'সে—
তাই নিয়ে সারা গায়ে মাখি
ভেবে দেখি এ-দেহপ্রাকার গেলে ধ্ব'সে
আমাদের কী-বা থাকে বাকি।
কী-বা থাকে বাকি।
উড়ে আসে কবেকার চিঠি
পাখা তুলে এ-বিজন শ্মশানঘাটায়
কথা-হাসি-প্রেমে-কান্নায়
মেশা কতো মোহময় চিঠি,
কতো ছোঁয়া-নেয়া-দেয়া চিঠি।
এইখানে এই নদীতীরে
শ্মশানঘাটের এই ঝুরি-নামা বটের ছায়ায়
ঘুরে-ঘুরে সারাদিন স্মৃতিরা হাঁপায়
ভাবনারা শোয়।
মৃত্যু এসে চিতাভস্ম দুই হাতে ধোয়,
নিত্য হয় স্মৃতির সেহায়
নব অঙ্কপাত।
মনে পড়ে দেহ তার হ'লো ভস্মসাৎ
এইখানে এই নদীতীরে।
কতো দিন আগেকার মুছে-নেওয়া যেটুকু সিঁদুর
তারই ছাপে হাত আজো হ'য়ে আছে ব্যথিত বিধুর,
হৃদয়ের জ্বর তবু হ'লো না তো দূর।
হৃত এ-হৃদয়ে ফেরে কথারা কাতর,
সেই থেকে পৃথিবী পাথর।

এইখানে এই নদীতীরে
অপলক প্রেম জেগে রয়;
তবু কেন স্মৃতির চুমোয়
সেই থেকে সময় ঘুমোয়?

পাঁচটি কবিতা

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পিয়াল

হৃদয়-গহনে ফুটেছিল ছোট চারা—
বেড়ে ওঠে সে-যে অবুঝ, আত্মহারা।
ক্রমে-ক্রমে, আহা, হৃদয়ে যায় না রাখা,
কণ্ঠ জড়ালো চিকন পিয়াল-শাখা ;
সে-যে তুমি সে-যে তুমি !

তুমি সে-পিয়াল, তোমার এলানো চুল
হাওয়ায় ছড়ানো একমুঠো ঝরা ফুল।
এত ভালো তুমি ছুঁতে ভয় করে, সারা
পৃথিবীর চোখে তবু এ-নিছক ভুল।

পায়রা

সূর্য এখন তীক্ষ্ণ বর্শা ছোড়ে—
দুপুরে সোনার ঝড়ে !
পায়রার ঝাঁক দিশাহারা উড়ে যায়।

তাদের দুজন কখন-যে নীড় খুঁজি,
তোমার বুকেই আশ্রয় পেল বুঝি—
আঁচলছায়ায় কূজন করুক তারা।

যৌবন যদি

যৌবন যদি আগুনের আঙরাখা
জীবনের পাখা, সে তো আহা, পোড়াবেই ;
দুটি হৃদয়ের কামরাঙা ফুল ছাড়া
আয়োজন তার কিছু নেই, কিছু নেই।

অনিঃশেষ

ভালোবাসা, যেন কার থরোথরো হৃদয়ের পাখি,
আমার রক্তের নীড়ে রেখে গেলো নিঃসঙ্গ একাকী
নির্জন তারার মতো একটি হৃদয় ; পার হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস-কণ্টকিত
কতো রাত্রি ভয়—
সেদিনও তো চ'লে গেল শবাকীর্ণ সময়ের গাড়ি।
রেল-লাইনের ধারে ছোট যার একতলা বাড়ি
সেও এসেছিল তার বুড়ী দিদিমাকে তুলে দিতে।
আরো দূরে পাড়ি নিতে-নিতে
দেখেনি তো ব্যস্ত ট্রেন, দেখিনি যে এ-অবাক মেয়েটির চোখে
আরো কিছু আছে যেন।—তার মানে বোঝেনি কি লোকে ?

নতুন ঠিকানা

এ-তো কিছু নয়, শুধু জীবনের মুঠো-মুঠো রাঙা মেঘ
ভোরের আকাশে ছুড়ে-ছুড়ে দিয়ে ঘুম-ভাঙা পৃথিবীর
নিজের হৃদয় ভ'রে নেওয়া তার দু'চোখের বিস্ময়ে।

* * *

তাই চলি আজ খেয়ালের নানা পশরা সাজিয়ে,
সবাকার দোরে সূর্য-ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে,
গ্রামপথে ভয়ে-চোখ-তুলে-চাওয়া শিশুর গলায়
গলাগলি ক'রে, সুখী বৃদ্ধের নিরুদ্বিগ্ন হাসির হাওয়ায়
পাখি হ'য়ে ভেসে—

তোমার জন্য রেখে যাই ব্যথাতুর
নতুন দিনের ঠিকানা আমার—শরতের রোদ্দুর।

দেহের আড়ালে আছে যে-অমরা
তার তো অনেক দাবি,
যৌবন নাকি পায় নাকো সেই
স্বর্গলোকের চাবি।

মন যদি হয় অবুঝ, অবশ হৃদয় কাঙাল,
কম বয়সের উদ্ধত সেনা তার তো নাগাল
না পায়, না পাক ; সে-অতলান্ত বিদ্যুৎবতী কন্যা
থাকুক না-হয় প্রৌঢ় কবির জন্য ;
সার্থক তার নত চক্ষুর বিনয়বরণ
চাঁদে-পাওয়া রাতে কঙ্কাবতীকে করুক হরণ !
ব'য়ে যায় যদি যাক না বাণীর আকাশ-গঙ্গা,
বাজুক তারার কনক-কাঁকন, হারাক সংজ্ঞা
বিশ্বভুবন উদয়াস্তের উচ্ছ্বাস হেনে স্বপ্নে !
ভাঙা ঘরে এনে তুলবো কোথায় এত দুর্লভ রত্নে ?
যারে খুঁজে আমি রোদে হাঁটি পথ, ধুলো মাখি গায়,
যার কথা ভেবে বৃষ্টির জল গায়েই শুকায়,
মিছিলে, মেলায় চোখে তার যদি পড়েই পলক,
চুলে তার গুঁজে দেব একগোছা টিয়ার পালক ;
এতদিনে জানি ভাঙবে ঘরের শক্ত দেয়াল,
বিশ্বের যতো প্রতিবেশী সেথা জড়ো হবে কাল,—
আজ চলি তাই খেয়ালের নানা পশরা সাজিয়ে,
সবাকার দোরে সূর্য-ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে।

ব্যঙ্গকবিতা

অপর্ণা চক্রবর্ত্তী

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে পুষ্ট শিক্ষিত পাঠক ইংরেজি কাব্য বলতে সাধারণত বোঝে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ বিদ্রোহী রোমান্টিকদের। হ্যাজলিট আর্নল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে জোলো উচ্ছ্বাসকে হৃদয়াবেগ বলে ভুল করে, যদি কোনো দুঃসাহসী লেখক গম্ভীর বিষয়বস্তুর মধ্যে হাসির এক ঝিলিক দেখিয়ে দেন তাঁর দিকে সরোষে চোখ রাঙায়। উচ্চ স্তরের কবিতা আর নিম্ন স্তরের কবিতার প্রভেদ তার কাছে খুব স্পষ্ট। উচ্চ স্তরের কবিতার বিষয়বস্তু কী হবে, লেখার ভঙ্গী কেমন হবে—সে বিষয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। যে প্রকৃত কবি, সে সদাসর্বদা অমরাবতীর সুধায় স্নান করে, মানবহৃদয়ের যা-কিছু রম্য, যা-কিছু সুন্দর তার চূড়ায় অবস্থান করে। প্রকৃত কবি যে, তার দেবদূতের পাখা মর্ত্যকে শুধু স্পর্শ করে যাবে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তবু সে পৃথিবীর সুখ দুঃখ, মানুষের মনের সূক্ষ্মতম কামনার সুনিবিড় পরিচয় দেবে। সে নিজে কোনোদিন জানবে না সুদীর্ঘ পথের ক্লান্তি, কিন্তু পথশ্রান্ত পথিকের ব্যথায় তার হৃদয় ভরে উঠবে। সে অনাগত দিনের পথপ্রদর্শক হবে, মশাল হাতে এগিয়ে যাবে জ্ঞানের আলো দেখাতে।

যে-মহান্ আদর্শে কবিতা প্রতিষ্ঠিত সে-উচ্চাসনে ব্যঙ্গকবিতা অপাংক্তেয়। ব্যঙ্গকবিতা সম্বন্ধে এ-ধারণা বদ্ধমূল যে সে-কবিতা ঠিক কবিতা নয়। কারণ দেখাতে হ'লে সাধারণ পাঠক জোর দিয়ে বলবেন সেটা "আসল কবিতা" নয়। সমালোচকেরা বলে থাকেন সে-কবিতা হৃদয়ের সম্পর্কশূন্য—ভাবলেশহীন, নীরস যুক্তিতর্কের মধ্যে তার খেই হারিয়ে যায়। অমরাবতীর সন্ধান পাওয়া দূরের কথা, তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবার ক্ষমতাও নেই তার। পোপ এবং ড্রাইডেনের কাব্যপ্রসঙ্গে আর্নল্ড বলেছেন "Their poetry is conceived in their wits, while all great poetry is conceived in the soul." আবার হ্যাজলিট সম্পূর্ণ নিজের মরজিমত চসার স্পেনসার, শেকসপীয়র, মিলটনকে

সারবন্দী করে রায় দিলেন—তাঁরা সবাই স্বভাবকবি, আর ড্রাইডেন ও পোপ একসঙ্গে হলেন কৃত্রিম ভঙ্গীর কবি। এও সেই soul আর wit-এর ভাষান্তর। এ-সব সমালোচনার পিছনে আছে সেই আদিম ধারণা যে কবিতার বিষয়বস্তু হবে উন্মুক্ত প্রান্তর, নিঃসীম আকাশ ছাড়িয়ে না-গেলেই সে-কবিতা কৃত্রিমতার পর্যায়ে পড়বে, আর প্রকৃত কবি হবে আপন-ভোলা দার্শনিক। পৃথিবীতে বাস করেও সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যে নিজের স্বার্থের জন্য বহুরূপীর মত ভোল বদলায়, আজ রাজার গুণকীর্তন করে, কাল রাজদ্রোহীদের সঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করে,—সে যা লেখে তা কি আর অকৃত্রিম? যে তার অসুস্থ, অসুন্দর পঙ্গু দেহের কদর্যতায় পীড়িত, যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কৃপাদৃষ্টির প্রত্যাশী হয়েও তাদের বিদ্রূপে কশাহত করছে, যে নিজের প্রিয়জনকেও আঘাত দিতে পেছপা হয় না—সে আর যা-ই হোক, সে কি কবি? কাব্য কবিজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হলেও কাব্য যে বিষয়বস্তু বা কবিজীবননিরপেক্ষ—এ-সত্য আবিষ্কার করতে হলে আমাদের অভিপঠিত লাইফ অ্যাণ্ড লেটার্স সিরিজের প্রায় অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ ভুলতে হবে। এলিয়ট সমালোচক হাজলিটকে উড়িয়ে দিলেন, আর্নল্ডের 'আত্মা'ও যে 'mid-Victorian Oxford graduate'-এর আত্মা সে-কথা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন। দিয়ে ভালোই করেছেন, না-হলে কতদিন যে বিংশ শতাব্দীকে পূর্বগামী শতাব্দীর জাবর কাটতে হ'ত, এবং কতদিনে যে প্রাক্‌রোমান্টিক যুগের কবিরা সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতেন বলা কঠিন। উনিশ শতকে ড্রাইডেন পোপ প্রভৃতির খ্যাতির সাময়িক অবলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করলে মনে হয় যে সমসাময়িক ফ্রান্সে যে ntellectualism-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল এ তারই প্রতিক্রিয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে reason-এর প্রতি ভক্তির চেয়ে তার লোক-দেখানো ঘোড়শোপচার পূজা ছিল বেশী। এ-ঘণ্টাবাদন পরবর্তী শতাব্দীর সয় হলো না। তার ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তাকে anti-intellectual-ism বলা যেতে পারে। ক্রমশ reason এবং intellect-কে এক করে ফেলে সাহিত্যে intellect পরিহার করা শুরু হলো। ব্যঙ্গকে intellect-প্রধান বলে ধরা হয়, এমন কি intellect-সর্বস্বও মনে করা হয়, তাই ব্যঙ্গ

কাব্যের কদর গেল কমে। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখি জনসাধারণ যে-নিষ্ঠার সঙ্গে সব মতবাদ গ্রহণ করত সেই একাগ্রতা নিয়ে অনায়াসে উপদেশ শোনবার ধৈর্য ছিল তাদের। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ঝুড়ি-ঝুড়ি উপদেশ দিয়েছেন নিঃসংকোচে—এটাও বলা যেতে পারে সোজাসুজি নীতিশিক্ষা দেওয়া তাঁদের কাছে আশা করাও হত। ব্যঙ্গকবিদের এই নির্ভেজাল উপদেশের অভাবও তাঁদের স্থানচ্যুত করায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল।

ব্যঙ্গ সাধারণত কঠোর—মানুষের অনুভূতির উপর কোমল আঙুল বুলোয় না, একেবারে মোচড় দিয়ে যায়। ট্র্যাজেডি কমেডির মূর্তি অনেক কবির কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গের স্বরূপ চিন্তা করলে আমরা হয়ত বিকৃত মুখভঙ্গীর উপরেই জোর দেব। সাধারণ পাঠকের ধারণা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের দুর্বলতার উপর সজোরে কশাঘাত করা। তাই দেখা যায় ব্যঙ্গকবির ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছতম বিচ্যুতিও টেনে বার করে উল্লসিত পাঠক প্রমাণ করতে চান যে অপরকে যিনি শিক্ষা দেন তিনি নিজেও কোনো দলছাড়া পরমহংস নন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সোজাসুজি নীরস উপদেশ শুনতে কারুর অপ্রবৃত্তি হয় না। বাংলা সমালোচনায় যেমন কিছুদিন আগেও বাঙালি কবিদের শেলি, মিল্টন প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা অপরিহার্য ছিল, তেমনি প্রচলিত প্রথানুসারী ইংরেজি সমালোচকরাও গ্রীক আর ল্যাটিন, বিশেষ করে ল্যাটিন সাহিত্যিকদের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যিকদের তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। ব্যঙ্গকবিতার জন্মস্থান রোম বলেই ধরা হয়েছে। ইংরেজি ব্যঙ্গকাব্যে অ্যারিস্টোফেনীজের বিশেষ প্রভাব পড়েনি। রোমেরই দুজন বিখ্যাত কবি হরেস (Horace) আর জুভেনালের (Juvenal) নামে ইংরেজি ব্যঙ্গকবিতাকে অভিহিত করে বলা হয় Horatian এবং Juvenalian। হরেস ছিলেন খোসমেজাজী, দিলদরিয়া লোক, হাল্কা হাসিঠাট্টায় ভরা তাঁর কাব্য। আর জুভেনাল যেন ওল্ড টেস্টামেন্টের নবী, মানুষের ক্ষুদ্রতা, মলিনতা, হীনতা দেখে তাঁর সহানুভূতি তো হয়ই না, চোখ রাঙিয়ে সংস্কার দাবী করেন। পেটার পর্যন্ত কোনো সমালোচকই এ-লোভনীয় দ্বিভাগ এড়াতে পারেননি। চশার পড়লেন হরেসের দলে, ল্যাংল্যাণ্ড জুভেনালের,

জন বার্কলে হরেসের দলে, ড্রাইডেন হরেসের, পোপ আর সুইফট আবার জুভেনালের। ইংরেজি অনেক কবিই ল্যাটিন কবিদের অনুকরণে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট অনুকরণ না-করলেও ল্যাটিন কবিদের প্রভাবমুক্ত তাঁরা হতে পারেননি। কিন্তু ল্যাটিন কাব্যের সূত্র অনুসারে তার বর্ণনির্ণয়ই ব্যঙ্গকাব্যের সব চেয়ে বড় কথা নয়।

ব্যঙ্গকবিতার উদ্দেশ্য কী, এ-কথা এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে সত্যিই তার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কিনা এটাই বিবেচ্য। আরো কয়েকটি বহুশ্রুত প্রশ্ন আছে: ব্যঙ্গকাব্য কি রচনার কালে সীমাবদ্ধ? পরবর্তী যুগে তার সার্থকতা কি শুধু ঐতিহাসিক তথ্যে? ব্যঙ্গকাব্যের উৎস কি? ব্যঙ্গ কি সমাজসংস্কারকের আর-একটি অস্ত্র মাত্র, বক্তৃতার চেয়ে সহজপাচ্য? মনে হয় এ-সব প্রশ্নের উত্তর হলো এই যে ব্যঙ্গকবিতার কোনো আলাদা মানদণ্ড নেই। সব কাব্যই চিরস্থায়ী নয়, অধিকাংশই উত্তম নয়। আবার ব্যঙ্গকাব্যকে যদি উদ্দেশ্যমূলক বলে বাতিল করতে চাওয়া হয় তবে মিল্টন থেকে আরম্ভ করে জনসন, পোপ, টেনিসন প্রভৃতি বহু উপদেষ্টার কী বিচার হবে?

তবে এ-কথা বলা চলে যে ব্যঙ্গকাব্য রচনার জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ প্রয়োজন। ব্যঙ্গকাব্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলে মনে হয় ব্যঙ্গকবিতা লেখার জন্য যে-মানসিক উৎকর্ষ, গভীর জ্ঞান এবং প্রচুর অবসরের প্রয়োজন তা অতিকর্মচঞ্চল যুগে দুর্লভ। মনে রাখতে হবে যে শুধু পণ্ডিতম্মন্যতা অথবা সিনিসিজমই ব্যঙ্গ নয়, যদিও এ-ভুল অনেকেই করে থাকেন। ব্যঙ্গকবির চিত্তে উত্তাপ প্রয়োজন, কিন্তু সে-উত্তাপ এত বেশি নয় যে তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ-কাব্যে নতুন বর্শার ধার থাকা দরকার, বুদ্ধির আলোয় উদ্দীপ্ত, তবেই সে-কবিতা পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে। আরো দরকার কঠিন সংযম। ভাবোচ্ছ্বাস অসংযত হলে ব্যঙ্গকবিতা কবিতা হয় না, আর ব্যঙ্গ হয় গালিগালাজ, নয় অশ্লীলতা। মিল্টন যখন গভীরভাবে বিচলিত হলেন তখন তাঁর লেখনী থেকে যে-রচনা নিঃসৃত হল তা তাঁর কবিত্বের আদর্শ থেকে বহু দূরে, অধিকন্তু তাঁর কবিজীবনের কুড়ি বছরের অপব্যয়। কাব্যও ভুললেন, ব্যঙ্গও হলো অশ্লীল বাক্‌বিতণ্ডা। অ্যাণ্ড্রু

মার্ভেলের প্রথম দিকের রচনা পড়লে তাঁকে ডনের সমকক্ষ বলা চলে। অথচ যখন দেখি তিনি সমসাময়িক ধর্মবিষয়ক তর্কের ঘূর্ণিপাকে ডুবে ব্যঙ্গের অবতারণা করেছেন, তখন তাঁর কাব্যলক্ষ্মীও বিদায় নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত যখনই কোনো সাময়িক সমস্যায় বিশেষ উত্তেজিত, তখনই তিনি অশ্লীল।

অত্যন্ত কর্মচঞ্চল যুগে আত্মনিরীক্ষার অবকাশ নেই। সে-যুগ যে ব্যঙ্গসাহিত্যের অনুকূল নয় সেটা বোঝা যায় যখন দেখি এলিজাবেথীয় অথবা ভিক্টোরীয় সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গের স্থান নেই। এলিজাবেথের যুগে অনেকেই ছিলেন একাধারে কবি, যোদ্ধা, ভূপর্যটক এবং সভাসদ। সে-যুগে মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নিত্য নতুন পৃথিবীর রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। অচেনা পৃথিবীর কুমারী বক্ষে ইংরেজ রাজত্বের জয়ের নিশান উড়ছে, স্পেনের লুণ্ঠিত রত্নে বহু আমির ওমরাহের কোষাগার পূর্ণ। এমন সময়ের প্রাণপ্রাচুর্য ব্যঙ্গরচনার অনুকূল আবহাওয়া নয়। উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্যের জন্য আরো এক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হল।

যেমন ড্রাইডেনের আগে উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্যের দর্শন মেলে না, তেমনি ড্রাইডেনোত্তর সব ব্যঙ্গকবিরই তাঁর কাছে ঋণ অনস্বীকার্য। এলিয়ট আর ভ্যান ডরেন উভয়ের মতেই বাইরন পর্যন্ত ড্রাইডেনের ধারা সুস্পষ্ট। ভ্যান ডরেন তো পো পর্যন্ত সে-রেখা টেনেছেন। ড্রাইডেনের কাব্যে শত্রুর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকা সত্ত্বেও কোথাও তিনি তাঁর মনের জ্বালা অনাবৃত করে ধরেন নি। তিনি নিজে পিছনে থেকে তাঁর প্রতিপক্ষকেই এত বড় করে তুলেছেন যে সে-হাস্যকর উচ্চতায় শ্যাডওয়েল, শ্যাফটসবেরি ছটফট করে মরছে। আমরা জানতে পারি যে শ্যাডওয়েল ড্রাইডেনের বন্ধু ছিলেন, তারপরে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু 'ম্যাকফ্লেকনো' পড়ে ড্রাইডেনের বন্ধু হওয়াও যে বিপজ্জনক এ-কথা মনে করে কে তাঁকে দোষ দেবে? উৎকৃষ্ট কাব্য এবং উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গের দিক থেকে ডানসিয়াডের স্থান অনেক নিচে। পোপের ব্যঙ্গরচনার পদ্ধতিও আলাদা। ড্রাইডেন যেমন তাঁর শত্রুপক্ষকে ক্রমাগত বড় করতে থাকেন—হাস্যকররকম উঁচু, পোপ তেমনি তাকে কত ছোট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করে তোলেন। চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা

করলে বলতে হয় ড্রাইডেন হলেন ট্যাপেস্ট্রির চিত্রকর আর পোপ মিনিয়েচারের। এঁদের সমসাময়িক এবং সম্প্রীতিভাজন সুইফটের পদ্ধতি হলো প্রথমে একটা অসম্ভব কল্পনা করে ধাপে-ধাপে ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে প্রকাণ্ড ইমারৎ গড়ে তোলা। তাঁর রচনা পড়ে কার মনে থাকে তাঁর বিকৃত ক্ষতবিক্ষত মনের কথা? যে-কদর্যতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন সেটাই পাঠকের চোখে প্রধান হয়ে ওঠে। বাইরনের ব্যঙ্গ এর কাছে ছেলেমানুষি।

আধুনিক কালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্যঙ্গসাহিত্য আবার পুষ্ট হয়েছে। গতানুগতিকতাকে মানুষ সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে পারছে না। তারই বিক্ষোভের এক প্রকাশ হলো ব্যঙ্গ। তবে আধুনিক যুগের ব্যঙ্গ গদ্যই বেশি। অবশ্য এ-কথা শুধু ব্যঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রেই খাটে না, আজকাল কবিতার চেয়ে গদ্যরচনার পরিমাণই অনেক বেশি। সম্প্রতি অনবদ্য ব্যঙ্গ রচনা করেছেন 'Screwtape Letters'-এর রচয়িতা C. S. Lewis। আধুনিক যুগের শান্তি-বাদ, দেশপ্রেম ইত্যাদি বড়-বড় বুলি-কপচানো দ্বিধাগ্রস্ত পঙ্গু মনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ইস্পাতের মত শান্ত কঠিন ভাষায়। আবার ইস্পাতের মতই উজ্জ্বল নির্দয় ব্যঙ্গে C. S. Lewis সুইফটের কথাই বার-বার মনে করিয়ে দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি কাব্যে দুটি কথা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে—wit এবং sense। সে-যুগের সমাজে, কাব্যে, ড্রয়িংরুমে, কফি-হাউসে উৎসাহী লোকের কাম্য ছিল wit নাম অর্জন। কথাটি বহু ব্যবহারদোষে দুষ্ট, আজ তার তার কোনো বিশেষ অর্থ অথবা মূল্য নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে wit আর sense অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পোপের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে sense কথাটি প্রয়োগ করার বাতিক ছিল। আবার wit কথাটি ব্যঙ্গের সমার্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। খ্যাকারে ও-কথাটির সেই অর্থই করেছেন। এলিয়টের wit সম্বন্ধে মন্তব্য বোধ হয় ও-দুরূহ কথার সব চেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। Wit শুধু বাইরের চাকচিক্য বা বাক্-চাতুরী নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। তার উৎস হলো ভারসাম্যে, মূল্যবোধে। কোনো গম্ভীর বিষয়ে খুব বেশি গাম্ভীর্য প্রদর্শন, আবার হাল্কা আলোচনায় ইয়ার্কি বা ভাঁড়ামির পর্যায়ে নামা—

উভয়ই wit-এর সুরুচিবিরুদ্ধ। গম্ভীরকে অতি গম্ভীর করবার অপরাধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বোধ হয় সব চেয়ে অপরাধী। অতিলঘুতা, অতিচপলতার দোষে দোষী হয়েছেন আরো অনেকে। তরল হাস্যের সঙ্গে গাম্ভীর্যের অপূর্ব সমন্বয় পাই পাউণ্ডের ব্যঙ্গরচনায়। সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে তিনি গুরুগম্ভীর বিষয়ে স্বচ্ছন্দে pun-এর অবতারণা করতে সাহসী হয়েছেন কাব্যের গাম্ভীর্য, এমনকি ট্র্যাজেডির রস অক্ষুন্ন রেখে। Mr. Nixon-এ ব্যঙ্গের সঙ্গে ট্র্যাজেডি একই সঙ্গে বর্তমান। সপ্তদশ শতাব্দীর পরে ইংরেজি কাব্যে শ্রেষ্ঠ wit-এর নিদর্শন এই প্রথম। এই wit যদি ব্যঙ্গের ভাষান্তর নাও হয়, তবে ব্যঙ্গের একটি প্রধান অংশ তো নিঃসন্দেহ, আর ব্যঙ্গকাব্যে অপরিহার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় দেবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'তাঁহার মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাহার কাছে গাল খাইতেন। মিশনারিদের ধর্মের মেকির উপর রাগ, মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।' বস্তুত দেখা যায় সব কবির ব্যঙ্গই বর্ষিত হয় মেকির উপর। কপটতা আর কৃত্রিমতা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সব চেয়ে সহজ শিকার। প্রাচীন ও আধুনিক ইংরেজি ও বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্য থেকে যথেচ্ছ চয়ন করলে কয়েক রকম মেকির বিদ্রূপ সহজেই চোখে পড়ে। মেকি পলিটিক্সের বিরুদ্ধে বেন জনসনের 'The New Cry'

> Ere cherries ripe and strawberries be gone
> Unto the cries of London, I'll add one.
> Ripe statesman, ripe, they grow in every street
> At six-and-twenty—ripe you shall them meet.
>
> * * * * *
>
> At naming the French king their heads they shake,
> And at the Pope and Spain slight faces make.

মেকি ধর্মের বিরুদ্ধে বাটলারের হুডিব্রাসে পাই

> And made them fight like mad or drunk
> For Dame Religion as for punk:
> Whose honesty they all durst swear for
> Though, not a man of them know wherefore.

ছদ্ম মিশনারির বিরুদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত :

> মিশনারি কালনাগ দংশে ভাই যারে
> একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে।

আধুনিক ব্যঙ্গকাব্যেও 'মেকি'র ঠাট্টা একই ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ভণ্ড দেশভক্তি, মানবপ্রেমের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার :—
সরে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই—চাষার ব্যারিষ্টার।

বিষ্ণু দের ছত্তিশগড়ী গানের অনুবাদে এ-ব্যঙ্গ আরো সূক্ষ্ম—

দারোগা সাহেব
এ কি সুখবর, বদলি হলেন
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কে বা
এক পয়সায় বাজারে কিনত কাপড় ?

ডে লুইস সংবাদপত্রের মেকি সংবাদ সম্বন্ধে বলছেন :

Foreman and farmer, father and flapper
I'm speaking to you, sir, please drop that paper !
* * * * *
They tell you all's well with our lovely England
And God's in our Capital. Isn't it grand
Where the offal of action, the rinsings of thought
From a stunted peer for a penny can be bought ?

আধা ধর্ম আধা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে

God is a statistician
Offer him all the data, tell him your dreams
* * * *
Get yourself taped, put soul upon the table.

প্রাগাধুনিক ব্যঙ্গের সঙ্গে বিশ-শতকী ব্যঙ্গসাহিত্যের সব চেয়ে বড় প্রভেদ হলো এই যে যেন জনসন, পোপ, ড্রাইডেন, সুইফট প্রভৃতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বল্পপরিসর, পরিধি ছিল ছোট। জগৎব্যাপী তাঁদের দৃষ্টি নয়, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁরা মাথা ঘামান নি। তার পরেকার দেড়শ বছরে পৃথিবীর পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। আগেকার সংকীর্ণ গণ্ডিতে ব্যঙ্গের প্রধান আশ্রয় ছিল ব্যষ্টি। কিন্তু বর্তমান কবির সমস্যা অনেক

ব্যাপ্ত। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের বিরতির পর যে-ব্যঙ্গকাব্যের জন্ম হলো 'Waste Land'-এ, সে-কবিতা কোনো বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তার নৈরাশ্য এত গভীর যে তাতে রোমান্টিক পরিবর্তনস্পৃহাও লোপ পেয়েছে ; তার ব্যঙ্গ যেন উন্মাদিনী হেকুবার ধ্বংসোন্মত্ততা। আর এ-কাব্যের জাতও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য থেকে স্বতন্ত্র। টি. এস. এলিয়ট, ইডিথ সিটওয়েল প্রমুখ বহু কবি আধুনিক সভ্যতার শবযাত্রা দেখেছিলেন। এলিয়টের কল্পনায় ছিল ফণিমনসায় আকীর্ণ মরুভূমি, আর শ্রীমতী সিটওয়েল দেখেছিলেন আগ্নেয়গিরির উপরে মানুষের বাসা। যে-কোনো মুহূর্তের অগ্নি-উদ্গীরণে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নানা সমস্যা গভীর-ভাবে নাড়া দিল আরেকজন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিকে। এলিয়ট তাঁকে পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেছেন। ১৯২০ সনে প্রকাশিত পাউণ্ডের Hugh Selwyn Mauberleyতে সে-অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। বাস্তবতার ঢেউ এসে লেগেছে তাঁর তৎকালীন জীবনের নিভৃত সৌন্দর্য-উপাসনায়। রূঢ় আঘাত পেয়ে 'Circeর চুলে'র মায়াপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি। তাঁর প্রাক্তন কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল 'to resuscitate the dead art of poetry'। এলিয়ট পাউণ্ডের কাছে নিজের কাব্যের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পাউণ্ড কী বলছেন তার চেয়ে তিনি কী-ভাবে বলছেন তাতেই আমার উৎসাহ বেশি'। কিন্তু মবার্লিতে বক্তব্য আর বলার ভঙ্গি সহজে এক হয়ে গিয়েছে। যে-বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে তিনি অত কাল ছন্দে শব্দে সূক্ষ্ম অঙ্গুলিচালন করছিলেন, সে-আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি পৃথিবীব্যাপী দুর্ঘটনার রূপনির্ণয় করলেন দুঃখক্রোধবহির্ভূত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। মবার্লি যেমন পাউণ্ডের আত্মবিশ্লেষণ, তেমনি রণক্ষান্ত mass production-এর পৃথিবীতে শিল্পীর স্থান কোথায় সে-চিন্তারও অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে Sassoon, Owen, Read প্রভৃতি যুদ্ধের কঠোর ব্যঙ্গ লিখলেন। বীরত্ব, গৌরব, দেশপ্রেম—এ-সব প্রচলিত ফাঁকা বুলির পিছনে সহস্র কিশোরের, যুবার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁদের ব্যঙ্গে হাসির

আভাসও থাকল না, তাঁদের কণ্ঠ হল বাষ্পরুদ্ধ।

কিন্তু এর পরের যুগের ব্যঙ্গকবিতায় তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্য নেই। ইডিথ সিটওয়েল ব্যঙ্গ ছেড়ে তাঁর কাব্যকে প্রতিভার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এলিয়ট ক্যাথলিক ধর্মের সুকঠিন নির্দেশের সামনে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের দ্বিধা সমর্পণ করে শান্তি পেয়েছেন। অডেন, ডে লুইস, স্পেণ্ডর অনেকদিন থেকেই জোর গলায় আশাবাদী বামপন্থী। তাঁরা মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন এবং তাঁদের কাব্যে রুগ্ন সভ্যতার রোগমুক্তির পথও নির্দেশ করেছেন (অবশ্য তাঁদের বিশেষ রাজনৈতিক মতানুসারে), আর ব্যঙ্গকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন কাব্যের শস্ত্র হিসেবে, ইতস্তত লঘু নিক্ষেপে।

ডে লুইস, স্পেণ্ডর, অডেনের আজকের দিনে আর তৃতীয় দশকের মত প্রভাব না-থাকলেও এঁদের ত্রয়ী গোষ্ঠী নগণ্য নয়। কয়েক বছরের বাংলা-সাহিত্যেও এঁদের প্রভাব স্পষ্ট। বাংলায় বামপন্থী কবি বলে যাঁদের অভিহিত করা হয় তাঁদের সকলের বিষয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় এবং এটা তার উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। যাঁদের কাব্যে রাজনীতি প্রধান, কাব্যের স্থান গৌণ, তাঁদের কথা ছেড়ে দিলে, যাঁদের কাব্য আংশিক ভাবে সার্থক (যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়) বা যাঁদের মধ্যে ব্যঙ্গের সম্ভাবনা ছিল (যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য), তাঁরা ব্যঙ্গকে কাব্যের আঙ্গিক হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যঙ্গে কাঠিন্য আসেনি, লক্ষ্যভেদী নির্ভুলতাও না। ক্ষুব্ধতা, ক্রোধ, জ্বালা, সবই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বলতেই হয় ভারসাম্য রক্ষা হয়নি। ষ্টিভন স্পেণ্ডরের "My parents kept me from children who were rough" কত কম কথায় কত বেশি সার্থক, কাব্য হিসেবেও, আবার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও। সমর সেন তাঁর স্বল্পায়তন কাব্যসৃষ্টির মধ্যে ব্যঙ্গের অনেক সার্থক ব্যবহার করেছেন, যদিও তাঁর কাব্যের জাত প্রচলিত বামপন্থী কাব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

লুপ্ত পৌরুষ বুঝি ফিরে এলো
ধাতরদের মনে-মনে ধন্যবাদ জানাই

* * * *

উপরন্তু হাতে শক্ত লাঠি
ছত্রভঙ্গ, ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি ফিরে আসি।

সমাজতন্ত্রে গভীর আস্থাবতী অতএব প্রচলিত অর্থে বামপন্থী হলেও স্যাজিটেরিয়াসকে (Sagittarius) কোনো বিশেষ দলভুক্ত করা যায় না। তাঁর ব্যঙ্গরচনার অনায়াসভঙ্গি, নানা সমসাময়িক সমস্যার সংগত অথচ সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা আধুনিক অন্যান্য কবিদের রচনায় দুর্লভ। নিউ স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড নেশন পত্রিকার মারফত বহু পাঠক লেখিকার ছড়া, সনেট এবং প্যারডির সঙ্গে পরিচিত। কিছুদিন আগে প্রকাশিত 'Let Cowards Flinch' গ্রন্থটিতে তাঁর প্রতিভার ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট। বইটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ব্যঙ্গকাব্য হওয়ায় বিশুদ্ধ ব্যঙ্গকাব্যবর্জিত এ-যুগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৯৪৫-৪৭ এই দুই বছরে বিলেতে শ্রমিক গভর্মেণ্টের প্রতিশ্রুতি, প্রচেষ্টা এবং তার সফলতা এ-পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। এখানে এ-বইয়ের বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। ইনি যে এ-ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছেন সেজন্যে তাঁর সাহস প্রশংসনীয়। ছাইডেনোত্তর রাজনৈতিক ব্যঙ্গকাব্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে কাব্যবর্জিত তরল ব্যঙ্গে পর্যবসিত হয়েছিল, তাঁর কাব্যেরও সে-সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তিনি প্রধানত কবি—তাই ব্যঙ্গ তাঁর কাব্যই হয়েছে। তবে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের এ-বিশিষ্ট শাখাটি আবার পুষ্ট হয়ে উঠবে কিনা সে-আলোচনা এখনো শুধু পাঠকের অনুমানের বিষয়।

আজকাল মানুষের জীবন গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এ-প্রসার, এই ঐকত্রিক চেতনাকে কবিকে স্বীকার করতেই হয়েছে, যদিও কাব্যের তাতে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে সে-আলোচনা এখানে অবান্তর। আধুনিক কবি আর-সব আধুনিক মানুষের মতই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেন না। সাধারণ মানুষের এ-সাদৃশ্য লিরিক্যাল ব্যালাডসের বিদ্রোহী লেখকের স্পর্ধিত কল্পনাকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে। তবু এত বেশি মাত্রায় সমাজচেতন হয়েও অনেক আধুনিক কবি এ-যুগের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, জড়বাদের মোড়ে এসে বারে-বারে থমকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের প্রতিক্রিয়া তথাকথিত বামপন্থী কবিদের প্রতিক্রিয়া থেকে আলাদা। আত্মচেতন কবি আধুনিক গড্ডালিকা মনোবৃত্তিতে শান্তি পাননি। বস্তুতান্ত্রিক তাঁরা হতে পারেন না।

মাটির প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনি আছে আকাশের দিকে চোখ মেলবার। পুরোনো কাব্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে বলেই যদি চাঁদের দিকে মুখ না ফেরাই তো আমরাই ঠকব। 'অচন্দ্রচেতন যুবা'র প্রতি কবির অসীম অনুকম্পা। এ-যান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রের যে-প্রতিবাদ এঁদের কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছে সেটা আর্তনাদের মতই শোনায়। সুদক্ষ সমালোচক চার্লস উইলিয়ামস ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন, ডরথি সেয়ার্সের Just Vengeance বাইবেলের কথারই পুনরাবৃত্তি। কবিদের মধ্যে স্পেণ্ডর, অডেন রোমান্টিসিজমের দিকে ঝুঁকেছেন, চর্চের কবিতার বেদনাও রোমান্টিকদের তীব্র বেদনার প্রতিধ্বনি। এ-গোষ্ঠীর কবিরা কাব্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী—কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে পাছে তরলতা প্রবেশ করে সে-ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাই তাঁদের কাব্য অনেক ক্ষেত্রেই তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে ব্যঙ্গের আবরণে। অজিত দত্তের নষ্ট চাঁদের অভিব্যক্তি

চাঁদের ভেল্কি সবই জানা আছে মেকি,
মিথ্যে শরৎ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ-ছড়ানো তারা—

রোমান্টিক হাহাকারই।

ব্যঙ্গকাব্যের রচনাপদ্ধতি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুরাতন প্রচলিত পদ্ধতিকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। ব্যঙ্গরচনার রীতির এতটা পরিবর্তন হয়েছে যে ব্যঙ্গকাব্য সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা থেকে ক্রমশ সাধারণ কাব্যের একটি আঙ্গিকে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক যুগে ব্যঙ্গকবিতা এবং গম্ভীর কবিতার ব্যবধান লুপ্ত হয়েছে। "High seriousness", "Sweetness and light" এ-ধরনের বায়ুরুদ্ধ বিভাগ সাহিত্যসমালোচনায় আজ অচল। একই কাব্যে পাশাপাশি গাম্ভীর্য এবং তারল্য, তিক্ত ব্যঙ্গের সঙ্গে ভাবালুতা, অতি হাল্কা হাস্যরসের সঙ্গে গভীর মননশীলতা পাওয়া যায়। পাউণ্ডের কাব্যে দেখি এর অপূর্ব মিশ্রণ। কিন্তু বৃহত্তর কাব্যের মত ব্যঙ্গকাব্যের ক্ষেত্রেও পাউণ্ডের কাছে এলিয়ট নিজ স্বীকারোক্তিতে ঋণী হলেও অসংখ্য শিক্ষানবিশের এবং ততোধিক পাঠকের কাছে ব্যঙ্গসাহিত্যে অথবা সমগ্র কাব্যসাহিত্যে এলিয়টই নবযুগের বার্তাবাহী। ফলত The Waste Land-এর অন্ধ অনুকরণ হয়েছে রাশি-রাশি, কিন্তু Cantos-এর একক মহিমা ("isolated superiority") আজো অক্ষুণ্ণ।

ব্যঙ্গকাব্যে এই গম্ভীর এবং হাল্কা রসের সংমিশ্রণ একেবারে নতুন নয়। সতেরো এবং আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিদের রচনায় এ-সমন্বয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আধুনিক ব্যঙ্গকবিদের প্রভেদ হল এই যে গম্ভীর ও হাল্কার ব্যবধান অনেক সময়ে ভুলে গেলেও তাঁরা গম্ভীর কবিতা এবং ব্যঙ্গকবিতার বিভাগ মেনে নিতেন। পোপ 'Rape of the Lock'ই লিখতে পেরেছিলেন; 'Paradise Lost'-এর মধ্যে বেলিণ্ডার অঙ্গরাগের বিবরণ, যত অপরূপই হোক না, তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। কিন্তু আধুনিক ব্যঙ্গকবির পক্ষে গম্ভীর কবিতার সীমান্তলঙ্ঘন আকস্মিক নয়। যেমন ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু আজ সীমাবদ্ধ নয়, তার আঙ্গিকের ব্যাপ্তি আরো বিস্ময়কর। সাহিত্যে ব্যঙ্গের ধারা পরিবর্তনের এটাই নূতনতম অভিব্যক্তি।

অলৌকিক

নরেশ গুহ

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে।
ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির
দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানি শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ। কী আশ্চর্য, প্রহরে-প্রহরে
পাড়ার বস্তির কোণে রাত্রি ছিঁড়ে দস্যুতার স্বরে
কুঁকড়োর ঘোষণা ওঠে। ক্লান্তিহীন কী-অধ্যবসায়,
একফোঁটা কালো মাছি দুপুরে বিরক্ত ক'রে যায়
ভনভন উড়ে-উড়ে। চায়ের উদ্বৃত্ত কিছু চিনি
খুঁটে তুলে নিয়ে যায় একসার পিঁপড়ে প্রতিদিনই
নিপুণ নিষ্ঠায়। আর জানালায় দু-গজ আকাশ
কখনো বেগনি নীল কমলা কি ফ্যাকাশে পাঙাশ
বারোমাস উপস্থিত। অন্ধকারে ফশ ক'রে জ্বালো
সরু দেশলাই কাঠি, ঘর ভরা মৃদুনীল আলো।
বিলিতি অ্যান্টিকে ছাপা সদ্য-কিনে-আনা কোনো বই
বুক ভ'রে গন্ধ দেয়, তাড়াতাড়ি সযত্নে লুকোই
যেন কোনো প্রেমপত্র বন্ধুদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে ;
দিনে থাক, আলো জ্বেলে রাত্রে পড়া যাবে চেখে-চেখে।
আর কী আশ্চর্য কাণ্ড, ছয়রাত্রি যেই হয় পার
হাসিতে আটখানা মুখ, ফিরে আসে লাল রবিবার,
ভাসমান লাল বয়া, ছয় দিন সমুদ্র সাঁৎরিয়ে,
জাহাজডুবির পর। এ-অলস রবিবার নিয়ে
বোঝা যায় জীবিকার পশুটার লোমশ থাবায়

বিদীর্ণ হ'য়েও তবু শনিবার ঘরে ফেরা যায়
শিষ দিয়ে। আর তাই চিঠির বাক্সটা যেই খুলি
রোজ কিছু চিঠি থাকে : অলৌকিক কে ডাকপিওন,
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি।

সমুদ্রতীরে

দেবদাস পাঠক

এখানে সমুদ্রতীর জনাকীর্ণ সন্ধ্যা ও সকালে ;
বাতে পঙ্গু বৃদ্ধ আর যক্ষ্মাগ্রস্ত পাণ্ডুর যুবক
ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুস নিয়ে পাশাপাশি ব'সে হাওয়া খায় ;
কোনখানে ফেনা রেখে ঢেউ স'রে গেলে তারপরে
শঙ্খমালা মেয়ে এক ত্রস্ত পায়ে ঝিনুক কুড়ায়।
এদিকে-ওদিকে বহু যুবকের হাতের ক্যামেরা
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে একে-একে ক্লিক্ ক'রে ওঠে ;
নির্ভুল নিরিখে কোনো স্নানবিলাসিনী তরুণীর
ছবি তুলে নিতে পেরে পরম তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে।

এই সমুদ্রের তীরে আরো এক হিসেবি যুবক
যুবতী পত্নীর হাতে হাত রেখে প্রত্যহ বিকেলে
হাওয়া খায়। তারপরে অন্ধকার ঘন হয়ে এলে
নিষ্প্রদীপ ছোটো ঘরে ফিরে আসে নিভৃত হোটেলে।
সমুদ্রবিলাসী সেই মূঢ়মতি যুবকের মন
অশ্লীল আশ্লেষে তৃপ্তি খুঁজে পায় সেই যুবতীর।
হাওয়ায় লবণগন্ধ ; ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সমুদ্র অস্থির।

সৈকত নির্জন হ'লে, নির্জনতা গাঢ়তর হ'লে অবশেষে
ধীর পায়ে কেউ এসে বালির উপরে পা ছড়ায় ;
অন্ধকারে তারা গোণে ; কালো ঢেউ রূপালি ফেনায়
ভেঙে পড়ে। ভিজে হাওয়া দুর্লভতম অবকাশে
চুল নাড়ে। কেন জানি তবুও হঠাৎ দেখি তার
সমুদ্রকে ভালোবেসে মৃত্যুর কথাই মনে আসে।

একটি সন্ধ্যা

দেবদাস পাঠক

হেমন্তের শেষবেলা পশ্চিমের নগণ্য শহরে ;
শীতের আমেজ রেখে চ'লে গেল অনাত্মীয় দিন।
বিশীর্ণ পাহাড়ি নদী, লাল বালি, স্তিমিত সূর্যের
করুণ বিদায়স্পর্শ ম্লান হ'লো ঝাউয়ের শাখায়।
শিরশির হাওয়া দিল। সাঁওতাল একটি মিথুন
ঠাণ্ডা জলে পা ভিজিয়ে সোনালি বালিতে ছাপ এঁকে
দূরের গ্রামের দিকে চ'লে গেল আলপথ বেয়ে।
হালকা কুয়াশা এসে ঢেকে দিল ঘন শালবন ;
ঈথরের ঘন স্তরে মৃদু আন্দোলিত
দূরগামী মানুষের অর্ধস্ফুট স্বর গেল শোনা,
মন্থর ঘণ্টার ধ্বনি গৃহমুখী মহিষপালের।
শব্দহীন, মুহ্যমান দীর্ঘ য়ুক্যালিপ্টাসের সারি
পৃথিবীর কবরের পাশে।

প্রহরখানেক পরে মহুয়াবীথির পরপারে
কুয়াশায় পথ কেটে চাঁদ এলো বিষণ্ণ বিধুর।
আর জানো, সুচরিতা, হঠাৎ কী ক'রে সে-সময়
তোমার আবছা মুখ ফিরে এলো আঘাতের মতো।
কুয়াশার ভিড় ঠেলে তবু সেই পরিচিত মুখ
সুচরিতা, ক্ষমা করো, মনে আনা গেল না কিছুতে।

অবুঝ দুঃখ আছে, স্মৃতি নেই এতটুকু আর।
এখন অনেক রাত ; হিংস্র শ্বাপদের ডাকে
সচকিত দূরের পাহাড়।

মৃত্যু

রণেন্দ্রনাথ দেব

বহুদূরে আছে এক অন্ধকার ছায়া অন্তহীন,
সেই ভেবে দিনে-দিনে আমাদের আলো হয় ম্লান ;
সে-ছায়ার পরপারে কী-যে আছে করেছি সন্ধান,
তবু সে তো দূরে আজো, বহুদূরে—দিগন্তবিলীন।
এখানে প্রান্তরে ফোটে যত ফুল অজস্র রঙিন—
সহসা এদেরে দেখি ছায়াঢাকা বিষণ্ণবিতান,
গন্ধ ঝরে, রূপ মরে, শেষ হয় সূর্যালোক-পান,
মৌন মাঠে শুনি শুধু স্মরণের পদধ্বনি ক্ষীণ।

তোমারে কি বিদ্ধ করে সেই মহাছায়ার ভাবনা ?
তবে শোনো : সে-ছায়ারে পার হয়ে গেলে কতবার
অন্যমনে, হে পথিক ! ছোটো-ছোটো শোক-অন্ধকার,
ক্ষণবিচ্ছেদের মতো মর্মঘাতী অনেক বেদনা,
আসেনি কি ঘুরে-ফিরে ? তারাও তো ধূসরবসনা
সে-ছায়ারি মতো, হায়, মোরা যার অমোঘ শিকার।

অমিয় চক্রবর্তীর মন

অরুণকুমার সরকার

সহযাত্রীদের মধ্যে এক বুদ্ধদেব বসু ছাড়া অমিয় চক্রবর্তীর খাঁটি পক্ষপাতী আদৌ আছেন কিনা জানি না ; আর সাধারণের মধ্যে যদি বা থাকে, আমার অনুমান, তাঁদের হাতের আঙুলেই গোনা যায়। এই দুর্ঘটনার তাৎক্ষণিক কারণ, অবশ্য, আমাদের অতিখ্যাত উচ্ছ্বাসলুব্ধতা। অস্বীকার করা যায় না আমাদের কবিতাপাঠ একান্তভাবেই কর্ণনির্ভর ; আর অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা অনেকে-যে বলেন উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করা দুঃসাধ্য প্রস্তাব, তা কিয়দংশে সত্য বৈকি। 'কিয়দংশে' এইজন্য যে যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' অথবা নজরুলের 'বল বীর' আবৃত্তির উপযোগী, অমিয় চক্রবর্তীর স্বল্প কবিতাই সে-অর্থে উচ্চপাঠনের যোগ্য। কিন্তু কয়েকজনের ঘনিষ্ঠ মজলিসে ঈষদুচ্চস্বরে অনায়াসেই পাঠ করা যায় এবং রসোপভোগের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না এমন কবিতাই অমিয়বাবু বেশি লিখেছেন। তাছাড়া সাবেকি ছন্দমিলেও তাঁর আশ্চর্য অধিকার এবং পুরোনো ঢঙে লেখা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর কবিতাগুলি পাঠ করলে, জোর ক'রেই বলতে পারি, আধুনিকতায় অনভ্যস্ত পাঠকেরও রীতিমতো ভালো লাগবে।

আমার মনে হয় সাধারণের কাছে আবৃত্তিঘটিত অসুবিধাও প্রতিবন্ধ হ'য়ে দাঁড়াত না, অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় যদি উগ্রতা থাকত, থাকত ঝাঁজালো উত্তাপ, অর্থাৎ, আরো অনেকের মতো তাঁর বক্তব্যটা যদি জঙ্গী এবং জোরালো হত। কিন্তু অমিয়বাবুর মধ্যে, আনুবীক্ষণিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করলেও, উত্তেজনার চিহ্নমাত্র আবিষ্কার করা যায় না। তাঁর রচনায়, সমকালীন অন্যান্য কবির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এটা খুব আশ্চর্য বলেই মনে হয়, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই ; কদাচিৎ সমাজসংস্কারের ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু তাও কোনো বামমার্গীয় প্রস্তাবনা নয়।

এই পরিতৃপ্ত প্রতিষ্ঠাসের কারণ খুঁজতে পারি অমিয় চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রসন্ন পরিবেশে। কিন্তু সে-পরিমণ্ডল তো আর অনন্য-নির্ভর নয়, তাই তার চাইতেও বড় কথা বোধ হয় এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা ইতিবাচক চেতনা নিয়েই একটু পরিণত বয়সে (বয়সের কথাটা স্মরণ করছি এইজন্য যে তাঁর কাব্যে আদিরসের নিশ্চিহ্ন অনুপস্থিতির আর-কোনো কারণ হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না) অমিয়বাবু সাহিত্যসৃষ্টি সুরু করেছেন। তাঁর এই চেতনা নিগূঢ়ার্থে রবীন্দ্রনাথেরই ; জীবনের মৌল প্রত্যয়গুলির জন্য নিঃসন্দেহেই তিনি শেষোক্তের অধমর্ণ। তবু রবীন্দ্রনাথের তীব্র আবেগ অমিয় চক্রবর্তীর স্পর্শাতুর অনুভূতিতে বৈশাখী আনল না কেন ? আনল না, আমার মনে হয় এইজন্য যে, বাল্যকালে-পরাধীন রবীন্দ্রনাথ উত্তরজীবনে নিরন্তর অভিব্যক্তির মধ্যে দিশাহারার মতো নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছেন, প্রোল্লাসে ঘোষণা করেছেন নিত্যনবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দ, আর পক্ষান্তরে, অমিয় চক্রবর্তী শান্তি পেয়েছেন বিনীতভাবে গুরুদেবের অনুসরণ করে, গান্ধীজিকে মেনে নিয়ে, পূর্বসূরীদের উপর শ্রদ্ধা এবং সমসাময়িক সহযাত্রীদের উপর আস্থা রেখে। অত্যন্ত সচেতন এবং সপ্রতিভ হয়েও আশ্চর্য নির্বিরোধ তাঁর প্রকৃতি।

এবং এই নির্বিরোধ প্রকৃতির জন্যই তিনি খুব স্বচ্ছ এবং ঋজু, সাহস করে 'স্বাভাবিক' বলতে পারলেই খুশি হতাম, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের সামে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। যে-গুরুগাম্ভীর্যের ভাণ আধুনিক কবিতার প্রথিত প্রদাহ, অমিয় চক্রবর্তী তার সহায় অস্বীকার। তাই তাঁর কলাকৌশল-অভিনব হয়েও ভারমুক্ত এবং কোনো সময়েই অভিধান-আশ্রয়ী অথবা গ্রন্থপ্রবাহিণী নয়। এই নিয়ে উটকো সমালোচকের পক্ষে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই ষোলো আনা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদৃঢ় বিশ্বাসভূমির উপরেই-যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর অতুলনীয় সজীবতার উৎসমুখ-যে সেইখানেই, তন্নিষ্ঠ পাঠকের কাছে এ-সত্য স্বল্পায়াসেই পরিস্ফুট হয়। অবশ্য তিনি কদাচ আঁকাড়া বিশ্বাসকেই কবিতার উপজীব্য করে তোলেন নি, উঠতে-বসতে দাখিল করেন নি তাঁর আস্থা অনাস্থার লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি। তাঁর রচনা তাঁর দৃঢ়মূল আত্মপ্রত্যয়ের ফলিত রূপ।

সান্নিধ্যের সূত্রপাতেই বোঝা যায়, অমিয় চক্রবর্তীর মনের অনুনাদের

তার শুধু সূক্ষ্মই নয়, টান করে বাঁধা ; বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর অনুসন্ধিৎসার অন্তর্ভুক্ত। অথচ তাঁর রচনায় অসংখ্য জিজ্ঞাসার ভিড় আমাদের বিব্রত করে না। শুধু আশ্চর্য মনে হয়, সীমানাহীন প্রশ্নের সমুদ্রে একান্ত অবলীলায় কেমন করে তিনি ভাসমান রয়েছেন ? এর উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় তাঁর জীবনদর্শনেই : তিনি দেখতে ভালবাসেন, ভাবতেও মজা পান এবং বলতে গেলে তন্ময়তার গভীরেই বাস করেন, কিন্তু খানা-তল্লাশিতে তাঁর আগ্রহ নেই, গরজ নেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার :

আশ্চর্য এই পৃথিবী, স্বীকার করি।
—কিছুই চেনা নেই, গেল না জানা—
বলতে বলতে ট্রামে উঠে পড়ি,
কোথায় আছি তার কী দেব ঠিকানা ?
যদি কেউ (ধরো) জানতে চাইত প্রাণের কাণ্ডখানা
দুপাশে দোকান দেখি, দূরে একটা গাছ,
ও-বাড়ির ছাতের আকাশে ঘুড়ির ঘুরন্ত নাচ,
কেন ? কোথায় ? তবু তো নেই মানা
না জেনেই থাকব সবার মধ্যে, বাঁচব—যতক্ষণ না মরি।
ভাবি, এবং তারই সঙ্গে, সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়ি॥

মনে হয় তিনি অত্যন্ত সহজভাবেই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে গ্রহণ করেছেন, হাল্কাভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাতিভাসিক জীবনকে এবং এত সহজ আর হাল্কাভাবে যে আজকের দিনের অনবস্থচিত্ত আধুনিক তাঁকে ব্যঙ্গ করতেই প্রলুব্ধ হবেন। 'সহজভাবে' কথাটির অপব্যাখ্যা হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা, তাই তাড়াতাড়ি বলে রাখি এর অর্থ নির্বোধের অমরাবতীতে বাস করা নয়। অমিয় চক্রবর্তী মানুষের সঙ্গে জড়িত প্রায় কোনো প্রসঙ্গকেই এড়িয়েযেতে চাননি ; জীবনব্যাপারে অদম্য তাঁর আগ্রহ, জীবন্ত তাঁর কৌতূহল, অশেষ তাঁর জিজ্ঞাসা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, কোনো প্রশ্নই তাঁর জীবনেই ভারস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়নি, আবির্ভূত হয়নি আনন্দঘাতক সমস্যারূপে। একে আমি বলছি 'সহজভাব', বর্তমানের উত্তেজিত জীবনযাত্রায় যা অর্জন করা সহজ নয়, কেননা তা মানসিক ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। চোখে খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর থাকলে নিছক বেঁচে থাকার আনন্দেই বেঁচে থাকা যায়—এই কথাটাই তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা কবিতায় ব্যক্ত

করেছেন। তাই মীমাংসা-সন্ধানে তাঁর ক্লান্তি আসে :

কোথায় থাকে কান্না, বিশ্ববিনিদ্র ক্ষুধা,
ঘাসের স্পর্শে তুরীয় হর্ষের বসুধা ?
যা ধরল, যাতে ধরল, দুই
শেষ পর্যন্ত না জেনেই, ওরে মন,
—সারাদিনের তৃপ্ত ক্লান্ত—চলু তবে এখন
ফিরে শুই ॥

বস্তুত, আনন্দই অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসঙ্গের ফল ; হ্লাদৈকময়ী তাঁর শিল্পকলা। ভরতি বুকের খুসিতে সদাপ্রসন্ন তাঁর বায়ুমণ্ডল, নিরুদ্বিগ্ন দিন, তৃপ্ত পরিবেশ। কিন্তু এ-আনন্দের উৎস উপকরণের বাহুল্যে নয়, এর উদ্ভব মনে হয় এক ঐশ্বর্য্যময় আদিম বিস্ময়বোধে। 'আদিম' কথাটি সামান্য বিস্তারের অপেক্ষা রাখে। বিভিন্ন নিসর্গলীলা, ইতিহাসপাঠে অবগত হই, তাদের ব্যবহারিকতার গুণেই একদিন পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। অমিয় চক্রবর্তীর বিস্ময়বোধও মূলত জড়বাদী এবং সেইজন্যই বলছি— আদিম। তাঁর কবিতায় দেখি হাওয়া, জল, অগ্নি ইত্যাদির বিবিধ এবং বিচিত্র কার্যকারিতার তালিকা :

হাওয়ার জোর। বড়ো বড়ো হাওয়া
গাছ ওপড়ায়, সমুদ্র ঝাঁকায়, যাতায়াত
করে দৈত্য তবু দেখা যায় না। আশ্চর্য।
কম বহুদূর হাঁটে না শূন্যে। আবার ছোটো হাওয়া
নিশ্বাসে ; জুঁইফুলের চার ধারে,
কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে,
প্রাণ দিয়ে প্রাণের বাহিরে যায় ; রাঙা তরঙ্গ,
দাবানলে তার নৃত্য। শুনি বাঁশিতে। আশ্চর্য।

আর যে-প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর বিস্ময় এবং বিস্ময়কে আশ্রয় করে শুভ্র আনন্দ, তা, লক্ষ্য করবার বিষয়, সর্বদাই আমাদের পুরোপুরি খাশদখলে। অবশ্য, স্বীকার করতেই হয়, এই চক্রবর্তী-চক্ষু বর্তমানে আমাদের অনেকেরই দুঃসাধ্য স্বপ্নপ্রয়াস, তাঁর মন আমাদের কৈশোরস্মৃতি। অতিপরিচিত উপেক্ষিত দৃশ্যপটের সঙ্গে 'আশ্চর্য' আর 'অবাক' শব্দ দুটির সংযোজনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। উল্লিখিত শব্দদ্বয় তাঁর বিভিন্ন কবিতায় এত অধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে যে তা অনায়াসেই সংখ্যাতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

আরো লক্ষণীয় এই যে শব্দ দুটির উপস্থিতি কখনোই বাহুল্য নয়, তারা কবির মন আর রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় ওতপ্রোত :

সদ্য তুলি সবুজে ডুবিয়ে
কে আঁকছে মাটি ভরে ছোটো ছোটো ঘাস ;
কে ঐ তো নীল ওড়নায়
আশ্চর্য আলোর চুমকি বসিয়েছে নয়ন-ভরনা :
অত্যন্ত হঠাৎ স্পষ্ট কবিতার অক্ষরের মতো
সমস্ত দুপুর কথা কয়
গানের পাখায় আর মৃদু গন্ধে খ্যাপামি লাগানো।

বস্তুত, সমগ্র বহির্বিশ্বই তাঁর চোখে জলন্ত আনন্দলোকরূপে প্রতিভাত। তার পৃথিবীতে খুশি হয়ে না-থাকাটাই যেন অস্বাভাবিক। তাই রবীন্দ্রনাথের মতোই এই কথার পুনরাবৃত্তিতে তাঁর শ্রান্তি আসে না যে যা দেখেছি, যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। তাই তো তাঁর বিস্ময় পৃথিবীর লম্বা বারান্দায় শিশুর খেলা দেখায়,—বাড়ি, কুয়োতলা, ক্ষেত, নদী, গাঁয়ের চাঁদ-কপালি গোরু, চেনা গাছ—সব কিছু নিয়ে সংসারের প্রাণরঙ্গে। কখনো বা তাঁর বিস্ময়দৃষ্টির উপলক্ষ্য মাছ, ল্যাংড়া আম, নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি, আধুনিক কৃষ্ণ, জাপানী খদ্দর, স্বদেশী বোমারু, স্বাধীন মেয়ে, ধর্মঘট, চাপা-পড়া কুলিকে গুলি ইত্যাদি আপাততুচ্ছ প্রাত্যহিকতা। আবার কখনো বা মাছি-মৌমাছির ভিড়ে, পাখীপল্লবের ব্যস্তশ্লোকে, পতঙ্গ মশার উচ্চারণে, আদিম আরণ্যকতার পুলকিত ঘনচ্ছায়াতেই তাঁর প্রাণের স্ফূর্তি। সৃষ্টির সব-কিছুকে জড়িয়ে—বাদ নয়, সাধ নয়, সব নিয়ে, সব দিয়ে ফেলে—নিঃসীম ব্যাপ্তিতেই তাঁর জীবনানন্দ। নিজেদের দিকে তাকালে দেখতে পাই সাধারণত আমাদের আগ্রহ আত্যন্তিকভাবে কোনো এক বা একাধিক বিশেষ ব্যাপারেই কেন্দ্রীভূত ; সেই বিশেষের বাইরে পৃথিবীর আর সব ঘটনা, আর সব দৃশ্য, আর সব শ্রুতি, আর কিছুই নয়, নির্জীব সংবাদ। অমিয় চক্রবর্তীর সমগ্রতাবোধ, তাঁর মুক্তপক্ষ দিগন্তবিহার তাই আমাদের আশ্চর্য না-লেগেই পারে না। আশ্চর্য না হয়েই পারি না যখন দেখি তাঁর সেই বিরাট ক্যানভাসে একটি ছোট পিঁপড়েরও স্থান আছে :

আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—

স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভ'রে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ধুলোয় রেণু মাখুক ॥

'খসড়াকে বাদ দিলে অমিয় চক্রবর্তীর সব কটি কাব্যগ্রন্থই—'এক মুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞানবসন্ত' এবং 'দূরযানী'—বিগত বিশ্বসমরের অন্তঃপাতী নিদারুণ দুঃসময়ের অন্ধকারেই প্রকাশিত। অথচ সেই স্বপ্নহর হিংসামত্ত পৃথিবীর ক্রূরতা তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলে প্রমাণ নেই, গ্রাস করা তো দূরের কথা। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য; কেননা, মহাযুদ্ধের সুরুতেই, বিশেষত বিখ্যাত ২২শে জুনের পর থেকে, বাংলার কাব্য-সাহিত্যে স্পষ্টত দিকপরিবর্তন ঘটেছে। সেই-যে এদেশের একদল কবি কবিতা লেখার কারুকর্মে ইস্তফা দিয়ে লেখনী-যুদ্ধে ব্যস্ত হলেন, প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক দলে-উপদলে যোগ দিলেন, ঘর ভাঙলেন, মিছিলে নামলেন, ধুয়ো তুললেন অনন্য বামপন্থার—তার জের এখনো চলছে। তাই সমসাময়িক অন্য অনেকের তুলনায় অমিয় চক্রবর্তীর বৈসাদৃশ্যই চোখে পড়বার। যাঁর কাব্যে রেডিয়ম থেকে সুরু করে হ্যুটনী আপেল, আইনস্টাইনি শূন্য, পাস্তুর, পাভলভ, শুশ্রুত-সংহিতাচার্য, মায় ডাঁটা-সুদ্ধ রাঙা পালং শাক স্থান পেয়েছে, তিনি কেন বামপন্থী সংকলনে যথার্থভাবে স্থান পাবার উপযুক্ত একটিও রৌদ্ররসের কবিতা লিখতে পারলেন না, তার কারণ অনুসন্ধান করবার আগেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুর মতো, যথাসময়ে ঠিক রাস্তাই বেছে নিয়েছিলেন, কেননা ১৯৪১-৪২-এ বাংলাভাষায় যতগুলি কবিতা লেখবার চেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা সত্তরটি পদ্যই, যদি না আরো বেশি, আজ ধূলিমলিন সংবাদপত্রের তুল্যমূল্য। অমিয়বাবু কেন ঐকতানে আওয়াজ জুড়লেন না, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় 'একমুঠো'র শেষ কবিতাটিতে। এখানে দেখতে পাই, যুদ্ধের রাজনৈতিক স্বরূপ নিয়ে কবি মাথা ঘামাননি; তাঁর কাছে যুদ্ধমাত্রই হিংস্র এবং অন্যায়, তাঁর কাছে যুদ্ধমাত্রই ঘৃণ্য এবং অসমর্থনীয়; তাঁর কাছে কুরুপাণ্ডবের ব্যবধান মিথ্যা আত্মতোষণ, তাঁর কাছে নররক্তক্রীত জয়পরাজয় উভয়ই সমান অর্থহীন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর মনোভাবকে স্পষ্টতর করা যায়: 'কবি বা শিল্পীর পক্ষে যে-কোনো কারণেই অমানুষিক ব্যবহারের মধ্য

দিয়ে জয়ের কীর্তি ঘোষণা করা আত্মাবমাননা, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অপমান। যেখান নিকৃষ্ট পথই সামনে খোলা রয়েছে, অন্য পথ দেখা যায় না, সেখানে অর্জুনের মত স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া দৃষ্টিতেই মানুষের পরিচয়। সেখানে ব্যথিত সংশয়ের তলে-তলে মানবিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাই শিল্পীজনোচিত।' ('চতুরঙ্গ'—আষাঢ়, ১৩৫৪) এই প্রতিহাস, বলাই বাহুল্য, আক্ষরিকভাবে গান্ধীজির এবং এই প্রস্থান শুধু কবি বা শিল্পীর জন্যই নির্দিষ্ট নয়, সমস্ত মানুষের কাছেই অদ্বিতীয় এই পথ। তাই আপৎকালে অমিয় চক্রবর্তী চিরন্তন মানবসম্বন্ধসূত্রের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিলেন, চেষ্টা করছিলেন আমাদের আচ্ছন্ন শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে। মানুষ-যে স্বভাবতই নীতিবাদী, গান্ধীজির এই প্রত্যয়কে—মানুষ-যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একই পরিবারভুক্ত, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসকে—নূতন ক'রে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এমন-এক সময় যখন হত্যাচারের সপক্ষে, বিরোধ-বিদ্বেষের আনুকূল্যে অকাট্য যুক্তিতর্কের অনটন ছিল না। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষে মানুষে গরমিলটাই প্রকট, আর, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় বৈসাদৃশ্যগুলি প্রকটতর হয়ে ওঠে, তাই অমিয় চক্রবর্তী নোঙর ফেললেন মানুষের মনোলোকে, প্রবেশ করলেন সেই অক্ষয় দীপসভায় যেখানে দিব্য-কামনায় ধৌত প্রত্যেকটি নরনারী মানবগৌরবে ঈর্ষাহীন, কুণ্ঠাহীন।

সুতরাং তাঁর মনকে খুঁজতে বিদেশী কবির ভাবজগৎ হাতড়ে বেড়াব না; দর্শন-প্রস্থানের দিক থেকে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির শিল্পিক সমন্বয়। প্রকরণের অভিনবত্ব তাঁর ধ্যানীমূর্তিকে প্রায়ই অবশ্য সুস্পষ্ট হতে দেয়নি, কিন্তু 'খসড়া'থেকে বরাবর 'দূরযানী' পর্যন্ত একটা অন্তর্লীন চিন্ময়সূত্রকে অনায়াসেই আবিষ্কার করা যায়। দেখা যায়: পথ-চলাতেই-যে আত্মা ফলগ্রহী হয়ে ওঠে আর ভূমাতেই-যে বোধের অতলতা—রবীন্দ্রনাথের এই জীবনবেদ তাঁর সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত; আবার মাটির শ্যামলেই-যে জীবনের পরিপূর্ণ সম্পদ—গান্ধীজির এই সরল অভিজ্ঞানই তাঁর সুদৃঢ় অবলম্বন:

তারই কাছে থাকব, বাঁচব, নিঃশ্বাস মেলে রাখব
পুকুর-ধারে হোক হাটের পাশে
পাড়ার জামতলায়, বাড়ির পিছনের ঘাসে
যেখানে কারখানাঘরে কাঠ কাটচে করাত,

তুষ জমেচে, আস্তিনগুটানো কারিগর, চকচকে
লোহা নাড়ছে শক্ত হাত।
জিইয়ে তুলবে বর্ষার নতুন কল্মিশাক
লাউডগা, কচি শশা, কাঁচা আমড়া, তাজা লঙ্কা ;
সিঁদুরে মেঘের দূর মৃদু ডঙ্কা,
গাছে কিচিরমিচির পাখির ডাক।
মেয়ে দুটি পুতুল নিয়ে ব্যস্ত, ছোটো ছেলে দৌড়চ্চে দুরন্ত
—বাড়ন্ত, প্রাণবন্ত।—

মাটির কাছাকাছি বিকেন্দ্রীভূত ঋজু অনাড়ম্বর এই জীবন প্রায় গান্ধীজিরই রামরাজ্য। হয়ত রামরাজ্যই ; হয়ত শহরের এই ছিন্নশির ব্যক্তিসত্তাহীন কিম্ভূত যূথবদ্ধতা আর এই নিষ্প্রাণ কৃত্রিমতা, 'জ্যান্ত ধানের জায়গায় ধ্যানে নিমীলিত মিথ্যে'ই আমাদের নিরুপায় নিয়তি ; কিন্তু মৃন্ময়ী ধরিত্রীর সঙ্গেও আমাদের অন্তরঙ্গতা-যে জন্মজন্মান্তরের, মাটির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা-যে পিতৃপুরুষের পবিত্র রক্তের, আর এতটুকু নীল আর সবুজের জন্য, সমস্ত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও, এখনো তো লোলুপ ক্ষুধাতুর আমাদের দেহমন, তাই বর্তমানের তুলনায় স-রামরাজ্য, যদি তা স্বপ্নের সান্ত্বনা হয়ে থাকে, তবুও, শ্রেয়,- এবং লোভনীয়-যে তাতে আর সন্দেহ কী। আর মাটি তো শুধু অন্নদাত্রীই নয়, শান্তি এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি কল্যাণী শক্তিরও। বিরোধ, বিদ্বেষ, হিংসা, উন্মত্ততা, সমস্তই তো মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীনতারই দুর্লক্ষণ। মাটিতে তাই শান্তি, মাটিতেই :

মাটি লেপো, মাটি লেপে দাও।
সঞ্চিত আগুনে ফেটে, ধিকিধিকি অঙ্গারের বাসা
তপ্ত শোকে, ভস্ম দুঃখে, বিমর্ষ এ বুকের উনোন
আপনাকে ব্যর্থ করে আজ।
মাটি লেপে দাও।

মাটির সঙ্গে অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতাই বোধ হয় বিশ্বভ্রাম্যমাণ অমিয় চক্রবর্তীর মনকে চিরদিন বাংলার গৃহকোণে বেঁধে রেখেছে। শ্যামলী বাংলাকে ভালোবাসেনি কোন্ বাঙালি কবি ? কিন্তু অমিয়বাবুর মতো এমন গৃহপীড়িত মন আর-কোনো আধুনিক কবির মধ্যে আমি অন্তত লক্ষ্য করিনি। পথে-প্রবাসে বহুদিন অতিবাহিত করার ফিরেই বোধহয় তাঁর

গৃহপ্রেম এমন গভীর ; আর এই গৃহ, আর গৃহগত পারিবারিক জীবনের সামাজিক ও মানবিক মূল্যে তাঁর দার্শনিক আস্থা-যে অক্ষুণ্ণ, বোধ হয় সেই কারণেই বাংলার জীবিত কবিদের মধ্যে তিনি সুস্থতম, আধুনিক কালের রুগ্নতা তাঁকে শিকার করতে পারেনি, যদিও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন আধুনিক জীবনকে।

সমালোচনা

সেতুবন্ধের গান : মণীন্দ্র রায়। দি বুক এম্পোরিয়াম। এক টাকা আট আনা

রাত্রিশেষে : আহসান হাবীব। কমরেড পাবলিশার্স, কলকাতা। দু টাকা বারো আনা।

কয়েকটি কবিতা : দিলীপ রায়। অভিযান পাবলিশিং হাউস। দু টাকা।

সমাজে জীবনে দেশে-দেশে এমন দারুণ বিশৃঙ্খলার দিনে পরিচিত পৃথিবীর এত রূপান্তর ঘটেছে যে কবিদের মুখ খুলতেই দশবার দ্বিধা, শতবার সংকোচ। অনেকেরই তাই মুখ বন্ধ, অনেকেই স্বল্পবাক। আর বাণী-বিস্তারে অসাধ থাকায় এই শেষোক্তদের অনেকে আবার বিরস ভাষায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই সব কথাই বলেন, রোজ সকালে খসখসে খবরের কাগজের মুখে যে-কথা শুনে-শুনে কান ঝালাপালা। কেউ-কেউ পূর্ব-এলিয়টী পোড়া প্রান্তরে জাবর কাটেন, কেউ আবার অপেক্ষাকৃত কালানুক্রমী সমাজবিপ্লব আর অদূরে চমৎকার চাষবাসে ভরা সোনার সংসারের গল্প করেন। এ-সমস্ত কবিতাই মন্তব্যমুখর। ভণিতা দেখেই ধরা যায় শেষ পর্যন্ত এ-কবিতা কোথায় নিয়ে কী কথা শোনাবে। সংসারে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে, যে-সব সমস্যা ভেবে আসমুদ্র-পর্বত সকলেই বিব্রত, বিরক্ত, অস্থির, যার সুরাহা না-হ'লে মানুষের মন ভারমুক্ত হবে না, এবং আপাতদৃষ্টিতে কঠিন হলেও লাল-নীল-বাম-দক্ষিণ এক-পথে-না-এক-পথে যে-সব দুষ্কৃতির প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী সে-সব বিষয়ে কবিকেও যেন কিছু কবুল করতেই হবে। তুখোড় বক্তা কিংবা অভিনব পতাকাপ্রসারীরা বাংলায় ফ্রি ভর্সের প্রয়োগ অথবা তিন মাত্রার ছন্দে

গম্ভীর প্রসঙ্গের অবতারণা সম্ভব বলে মনে করেন কিনা, তা কিন্তু আমরা ভুল করেও জিজ্ঞাসা করার কথা ভাবি না। তবে কি কবিও যা, চতুর রাজনৈতিক কিংবা খরবুদ্ধি দার্শনিকও তা-ই? কবি হৃদয়বান, অনুকম্পায়ী, ভালোমন্দ, সদসৎ বিষয়ে তাঁর নিশ্চয়ই স্বাভাবিক, হয়তো অসামান্য, বোধ আছে। ভাষার মরচে-পড়া তারে তিনি সুরের মীড় দিতে পারেন; বিমুখ সজ্জনদের মতে তেপান্তরে বা মিনারে যেখানেই তাঁদের নির্বাসনের ব্যবস্থা হোক-না কেন, সমাজসংসর্গ ত্যাগ করায় সাধারণত তাঁর স্পৃহা নেই।

কিন্তু আজকালকার অনেক কবিতা পড়ে মনে হয়, বিশ্ববিষয়ে এই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া কবিদের মন থেকে কখনোই নড়ে না। দুশ্চিন্তার কারণ সবই মানি এবং জানি, তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যে এই কবিরা কি কখনোই পুঁথিপত্র থেকে জানালার দিকে চোখ তোলেন না? রাস্তায় যেতে-যেতে তাঁদের কি কখনো বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেয় না? স্বপ্নে সাপে তাড়া করে না? ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় না? তাঁরা কি কখনো মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যান নি? গভীর বৃষ্টির রাত্রিতে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে তাঁদের কি কখনো মনে হয় নি দরজার কোণে আরো কালো একটা ছায়া দাঁড়িয়ে ঠোঁট চাটছে? তাঁরা কি কখনো প্রাণ খুলে হাসেন না, ঠাট্টা করেন না কিংবা অন্যে করলেও বিচলিত হন না? কবির কাছে কী চাই আমরা? দুর্গতি-মোচনের মিটিং-এ মিছিলে তিনিও আছেন কিনা, তিনি 'প্রগতি'র পক্ষে না বিপক্ষে, এই ঘোর কলিকাল রুবে কেমন ক'রে কাটবে—এই-সব কথার উত্তর চাই? না তাঁর প্রদীপ্ত মনের কিঞ্চিৎ আলো প্রার্থনা করি?

যদি এমন হোতো যে এক-একজন কবি মনের বিশেষ প্রবণতার বশে এই-সব সমস্যা বিষয়েই মগ্ন থেকে কবিতা লিখে যাচ্ছেন, যেমন নাকি ভিন্ন প্রবণতার বশে তিনিই আবার শুধু ঠাট্টার কবিতা লিখতে পারতেন—তাহলে এই আক্ষেপ করতে হোতো না। পদ্যবন্ধ জর্নালিজমের স্বতন্ত্র মর্যাদা চির কালই তো স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু যাঁদের মনে একবিন্দুও কবিতা নেই, তাঁরাও যখন দুরাশার তাড়নায় নানাপ্রকার সাধু প্রস্তাব নিয়ে, কখনো ক্রোধ নিয়ে, কখনো ভ্রান্তদের প্রতি উন্নাসিক করুণা নিয়ে খোঁড়া ভাষার লাঠি ভর ক'রে কবিতার রাজ্যে এসে ঢোকেন; কিংবা যাঁদের ভাষায় ছন্দে স্পষ্ট

অধিকার, তারা যখন 'কর্তব্য'বোধে সম্ভব অসম্ভব বিবিধ দায়িত্বহীন প্রতিজ্ঞা পদ্য লিখে সদর্পে ঘোষণা করেন; এমন কি শক্তিশালী কবিরাও যখন সলজ্জ দ্বিধায় পড়ে উন্মনা হন, তখন—দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় বইকি। সংখ্যা দিয়ে কোনো এক সময়কার কাব্যচর্চার স্বরূপনির্ণয় গ্রাহ্য হলে বাংলা কবিতা পড়ে আমার সেই নিষ্ঠাবতী বিধবা বিধুর নীরক্ত বিদূষী কন্যার কথা মনে পড়ে, চোখে যার পুরু কাচের চশমা, ষোলো বছর বয়সে জীবনে যার আনন্দের মুকুল ঝরে গেছে বলে নিজেকে নিজে কথা দিয়েছে আর কোনোদিন সে ফুল ফোটাবে না।

এখানে এই সব কথা বলায় এ-কথা কেউ যেন না ভাবেন যে আলোচ্য কবিদের রচনাই বিশেষভাবে আমার এই খেদোক্তির উপলক্ষ্য। বাংলা কবিতার একটা বড়ো অংশের এই দিকে ঝোঁক থাকায় এ-প্রসঙ্গেই এ-সব বলতে হোলো। কেননা বিভিন্ন কারণে এর মধ্যে অন্তত দুজনের কবিতার প্রতি আমার আন্তরক অনুরাগ থাকলেও বেদনার সঙ্গেই বলতে হয় যে রচনার কুশলতা অনুসারে এঁদের সকলের কবিতার মধ্যেই অল্পবিস্তর সেই সব লক্ষণ আছে, অন্য বহুবিধ কবির বিরস ব্যর্থতার জন্য যাকে আমি দায়ী বলে মনে করি।

'সেতুবন্ধের গান' মণীন্দ্র রায়ের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। এ-যুগে যাকে স্বকাল-চেতনা বলা হয়, মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় প্রথম থেকেই তার লক্ষণ উপস্থিত। সমাজ, সংসার সভ্যতার সর্বত্র জীর্ণদশা, মানুষের মূঢ় আত্মরতি, মধ্যবিত্তের পলায়ন, ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস, পৃথিবীতে পরম মূল্যবোধের শোচনীয় পতন—এই সব চিন্তার ভারে তিনি কখনো বিদ্রূপ, কখনো আত্ম-করুণার যন্ত্রণা প্রকাশ করে এসেছেন, কখনো সুখী জীবনের আশায় অস্থির হয়েছেন। মোটের উপর, তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই এক সুর প্রবাহিত। 'সেতুবন্ধের গানে' উপরন্তু এই পরিবর্তন দেখা গেল যে কালান্তক দুর্যোগের দিনেও কবিতা লেখার যুক্তি আছে কিনা, থাকলে কবি কোন কর্মের সাধন করবেন, এই বিষয়ে তিনি আত্মজিজ্ঞাসা এবং প্রত্যয়ের অবতারণা করেছেন। অদৃশ্য আদালতে কবিতা লেখার সপক্ষে যখন যুক্তি দেখাতে হয় তখন আর সন্দেহ থাকে না যে স্বকীয় বৃত্তি নিয়ে কবির নিজের মনেই লজ্জা। আলোচ্য কবির মনে এই দ্বন্দ্বের পীড়া তীব্র হওয়া, অন্তত আমার কাছে, এই কারণে অনিবার্য বলে মনে হয় যে রচনার প্রাসঙ্গিক কারুকর্মে, চিত্তের স্বাভাবিক

উন্মুখতায় তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যতম শক্তিশালী কবি। অথচ সামাজিক কর্তব্যবোধ তাঁকে ভিন্ন মন্ত্রণা দেয়।

মণীন্দ্র রায়ের কবিতা আমি ভালোবেসে পড়ি এজন্য নয় যে তিনি আমাকে কোনো বাণী দিতে পেরেছেন, কিংবা জীবনের কোনো জটিলতার সমাধানে আলো দিতে পেরেছেন। ছন্দে তাঁর ঈর্ষাযোগ্য দক্ষতা এবং ভাষাব্যবহারে সাধারণত তাঁর জাগ্রত বুদ্ধির ফলে তাঁর আপাতউদ্দেশ্যহীন অনেক কবিতাও রীতিমতো উৎরে যায়।

বাদশার মসনদ টলে, জেনো শুধু একাগ্র মানুষ
লাখে লাখে জেগে থাকে
হাটের বৈঠায় আর লাঙলের পাকে,
পুঁই-মাচার আঙিনায়, শালিখের সোনার কাজলে,
হঠাৎ হাওয়ার শিসে, দিশেহারা ঘোমটার আঁচলে।
ভুইটাপার ঊর্দ্ধশির মন্থিত হাওয়ায়
পঙ্গের আলপনা আঁকা নিকানো দাওয়ায়
সে জীবন ক্ষান্তিহীন। ...

যদিও আবার এ-কবিতাতেই

...আজো প্রতিধ্বনি হানে শান্তির সেনানী
লাখো ছাত্র মুক্তির আওয়াজ।
দাঙ্গার গোছানো ধ্বংসে অংশীদারী থেমেছে যাদের...

পড়ে হোঁচট খেতে হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে হয়তো স্বীকার করা চলে যে শব্দের প্রেমেই কবিতার উন্মেষ। মণীন্দ্র রায়ের কবিতার ছত্রে-ছত্রে এই ভালোবাসার অভিজ্ঞান আছে। বেহারী মুচির ছেলের কাছে থেকেতিনি 'নেহাইয়ের কুঁজে কাঁটা, লাশে ঝাঁটা জুতো'র কথা, 'কোনো দূর পরগনার তশিলে হারানো এক' গ্রামের নাম ধার করে আনেন; প্রেমের কাছে 'ভবিষ্যতের পাহাড়িয়া পাকদণ্ডী পথে নতুন বসতি গড়ার সাহস' প্রার্থনা করেন। তাঁর চোখে 'কিশোর শালের কঠিন পেশীতে স্তম্ভিত কথাকলি' ধরা পড়ে। তবু, কবিতা লেখেন বলে লজ্জার ভাবটা এ-বইতেই যেন বেশী; এবং—তার চেয়ে আশ্চর্য—এর কোনো-কোনো অংশ একেবারেই বিষ্ণু দে-র প্রতিধ্বনি, যে-রকম প্রতিধ্বনি এর আগে মণীন্দ্র রায়ের কোনো রচনায় লক্ষ্য করিনি।

অথচ—মূল বক্তব্য না হোক—ছন্দে এবং ভাষার ভঙ্গিতে তাঁর স্বকীয়তা আছে। কবিতাই কবিতা লেখার যথেষ্ট কারণ, এ-কথায় সন্দিহান হয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে এখনো তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না—তাঁর রচনায় উৎসাহী পাঠকের পক্ষ থেকে এ-কথা পুনরায় উপস্থিত করি।

শেষে একটু বলতে হোলো যে মণীন্দ্র রায়ের সুসংবদ্ধ পয়ারের যদিও আমি ভক্ত, এবং তাঁর তিন মাত্রার পারিপাট্যের জন্যই অনেক কবিতা বার-বার পড়তে হয়, তবু আলোচ্য গ্রন্থে এমন-কিছু পংক্তি পেলাম, ধ্বনির দিক থেকে যা নিখুঁত নয়:

(১) কোটরে কোটরে বেজী, কাঠবিড়ালী, গোধিকা ও সাপ...
(২) লড়াইয়ে, আজো তো দেশে গোষ্ঠীর চাঁদ
(৩) করুণার হ্রদে গতি নেই। হাওয়াহীন বিকেলে...

'কাঠবিড়ালী'তে দুটো কড়া ব্যঞ্জনের সংশ্লেষণ সুখের হয়নি; 'গোধিকা ও সাপ'—এখানে 'ও'র জন্য লাইনটাই এলিয়ে গেছে। (২) আর (৩)-এ অসংগত যতিপাতের ফলে ছন্দের কোমর ভেঙে গেছে, বলা যায়।

আহ্সান হাবীবের এই প্রথম কবিতার বই। 'কবিতা'য় কয়েক বছর আগে 'কাশ্মিরী মেয়েটি' নামে তাঁর একটি কবিতা পড়ে ভালো লেগেছিলো। বই পড়ে মনে হোলো সে-ধরনের কবিতা আর তিনি লেখেন না, লিখলেও এ-বইয়ে স্থান দেন নি। এ-বইয়ে তাঁর কবিতার সুরটি মৃদু এবং বিষণ্ণ। বাস্তব ব্যাঘাতে কৈশোরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভালোবাসায় ভরা পৃথিবীর স্বপ্ন ভেঙে গেলে যে-পরিতাপ জাগে, অভিমান হয়, সরল ভাষায় অনায়াস ছন্দে সেই চিত্তবৃত্তির প্রকাশ তিনি করেছেন। সরল আবেগের এই প্রকাশ নানা কারণে আধুনিক কবিতা থেকে লুপ্ত, আহ্সান হাবীবের সরলতাও সতর্কতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তরলতায় পর্যবসিত হয়ে এ-পথের বিপদ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সুখ নেই, সুখের স্মৃতি আছে, আক্ষেপ আছে। আক্ষেপ ক্রমে হতাশা ও তিক্ততায় প্রবেশ করেছে, যার মধ্যে অভিমানের সুর প্রচ্ছন্ন।

নিরাতঙ্ক পদতলে এ মৃত্তিকা বিশ্বাসঘাতক।
উড়ন্ত পাখায় আজ নেমে এল অবাঞ্ছিত যতি,
অরণ্য স্বপনহীন, বন্ধু আকাশ পলাতক।

মৃত্তিকা, পৃথিবী প্রভৃতি কথার বার-বার ব্যবহার, মিলের গতানুগতিকতায় অক্লেশ সম্মতি, আর নীড়, পাখী, ব্যাধ, ঝড়, আগুন ইত্যাদি পুরোনো প্রতীকের শরণ নেওয়ার ফলে তাঁর কবিতার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো ক্ষতি স্বেচ্ছায় তিনি বরণ করতে যাচ্ছেন দেখে দুঃখ হোলো। 'পদক্ষেপ' নামে গ্রন্থের শেষ অংশের এক কবিতায় পৃথিবীর দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করার ইচ্ছায় তিনি বলেছেন :

অতএব হে বাঁশরী
অসি হও তুমি
অসি হও এ মোর প্রার্থনা।

আর-এক কবিতায় লিখেছেন,

সংগ্রামের রাজপথে হাতে হাত রেখে
সমান পায়ের চিহ্ন যাবো এঁকে এঁকে

গত দশ বছরের মধ্যে এ-রকম লাইন বাংলা (এবং ইংরিজি) কবিতায় কত-যে পড়েছি যে কোনটা কার লেখা তাও মনে রাখা সম্ভব না। আর কেন ?

লেখকের নাম এবং বইয়ের নাম দুয়েরই প্রসিদ্ধ পূর্ববর্তী থাকা সত্ত্বেও দিলীপ রায়ের 'কয়েকটি কবিতা'র বাইরের চেহারাটা মনোরম বলে হাতে নিলেই পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে করে। আর ভিতরে যে-সব রচনা আছে তাও তুচ্ছ নয়, অন্তত চমকপ্রদ, কেননা পদ্যে, গদ্যে, মিলে-এবং অমিলে, আকস্মিক শব্দযোজনায়, কাটা-কাটা কথায়, তির্যক ভঙ্গিতে, ক্রিয়াপদের বর্জনে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম পর্যায়ের কথাই এই বইটি বার-বার মনে করিয়ে দেয়।

বাইরে বর্ষা,
জুলাই, কাঁদায়
পিচ্ছিল পথ
মোটরের হর্ন,
রিক্সা একাকী
আমাদের রথ।

আবার অমিয় চক্রবর্তীর মতোই চেতনার নানা অপরিচিত মহলে কবিতার সন্ধানে তিনি সচেষ্ট। কিন্তু দুর্বল শব্দ কিংবা অপটু ছন্দের

বিরুদ্ধে সতর্ক হননি, এবং অভিনব বিষয়কে কবিতার অন্তর্বর্তী করার জন্য যে-পরিমাণ প্রয়াস প্রয়োজন তাও এড়িয়ে গেছেন। কবিতা তাই ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়। একই কবিতায়

দূর পাড়ি দিয়ে ঝম্ ঝম্ করে এসে
সিগন্যালহীন স্টেশনে গিয়েছি থেমে

এবং

এখানে মনের ছুটন্ত রথ
থামিয়ে দি
অনেক সড়কে মিছিল মিটিংএ
ঘামিয়েছি, (অর্থাৎ, ঘেমেছি)

এ-রকম আশাপ্রদ এবং অক্ষম পংক্তি পাশাপাশি পাওয়া যায়। পদ্য ও গদ্যের মধ্যে যে-ট্রেনে তিনি যাতায়াত করতে চান তার জন্য উপযুক্ত মাপের লাইন বসাতে পারেননি। কোথাও-কোথাও উপভোগ্য ছবি আছে, কোথাও-কোথাও পদ্য রচনা প্রশংসনীয়। কিন্তু মোটের উপর মনে হয়, কবিতার বিষয় নিয়ে এখনো তিনি সন্দিহান, কী লিখবেন, কেমন ক'রে লিখবেন, আদৌ লিখবেন কিনা সে-বিষয়েও এখনো মনস্থির করতে পারছেন না। নিজের মনেই অবিশ্বাস নিয়ে দিবালোকের স্পষ্ট ভাষায় ডাকলে কবিতা কি সাড়া দেবে ?

নরেশ গুহ

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই আষাঢ় সংখ্যায় 'কবিতা'র চতুর্দশ বর্ষ শেষ হ'লো। আগামী ১লা আশ্বিনের পূর্বে পঞ্চদশ বর্ষের চাঁদা (চার টাকা); কিংবা নিষেধাজ্ঞা দয়া ক'রে পাঠাবেন; অন্যথা আশ্বিন সংখ্যা বাৎসরিক মূল্যের ভি. পি.তে পাঠানো হবে। ভি. পি. ফেরৎ না-দিতে আপনারা যথাসাধ্য সচেষ্ট হ'লে বিশেষ বাধিত হবো, কেননা 'কবিতা' খুব কষ্টে চলছে।

চাঁদা কিংবা নিষেধাজ্ঞা পাঠাবার সময় গ্রাহক নং উল্লেখ্য। আগামী আশ্বিন থেকে প্রথম যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা 'নতুন গ্রাহক' ব'লে উল্লেখ করবেন।

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

বুদ্ধদেব বসু,
সম্পাদক, 'কবিতা'

বিজ্ঞপ্তি

কবিতাভবন-প্রকাশিত সমস্ত বই কলকাতায় প্রধানত নিম্নলিখিত দোকানে পাওয়া যায়:

উত্তর কলকাতা

ডি. এম. লাইব্রেরি ৪২ কর্নওআলিস ষ্ট্রিট

কলেজ স্কোয়ার

ইউ. এন. ধর এণ্ড সন্স ১৫ কলেজ স্কোয়ার
বুক ষ্টোর "
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ ১৪ কলেজ স্কোয়ার

মধ্য কলকাতা

কমলালয় ষ্টোর্স
থ্যাকার স্পিংক অ্যাণ্ড কোং লিঃ

পার্ক ষ্ট্রিট

অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড ষ্টেশনারি লিঃ

ভবানীপুর

ভট্টাচার্য গুপ্ত অ্যাণ্ড কোং ১ বি রসা রোড

সম্পাদক ও প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯
ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ থেকে
বিমলেন্দুভূষণ সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।